রকিব হাসান
তিন গোয়েন্দা
ভলিউম
৪/২
সেবা
প্রকাশনী

ভলিউম ৪

দ্বিতীয় খণ্ড

তিন গোয়েন্দা

২২, ২৩, ২৪

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী

ড্রাগন: ৫—৮৭
হারানো উপত্যকা: ৮৮—১৫১
গুহামানব: ১৫২—২২২

ড্রাগন

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ১৯৮৮

এমন চমকে উঠল তার দুই সহকারী, যে রবিনের হাত থেকে কার্ডের বাণ্ডিল পড়ে খুলে ছড়িয়ে গেল, বেকায়দা ভঙ্গিতে ঝাঁকুনি দিয়ে ওপরে উঠে গেল মুসার হাতে ধরা স্ক্রু-ড্রাইভারটা। এতদিন পুরানো ছাপার মেশিনটা মুসা একাই ব্যবহার করেছে, কিন্তু কিশোরের নির্দেশে রবিন এখন শিখে নিচ্ছে কাজটা। মুসাকে শিখে নিতে বলা হয়েছে ইলেকট্রনিকের কাজ, এতদিন এই কাজটা কিশোর করত। তার মতে, সব কাজ মোটামুটি জানা থাকলে গোয়েন্দাগিরিতে অনেক সুবিধে।

'কি বললে?' স্ক্রু-ড্রাইভারের খোঁচা লেগে রেডিওর বাক্সের পেছনে হার্ডবোর্ডের কভারে বিশ্রী একটা আঁচড় পড়েছে, সেটা মোছার চেষ্টা করল মুসা।

'বলছিলাম কি,' আবার বলল কিশোর, 'এই অঞ্চলে আগে কখনও হয়নি, এমন একটা ডাকাতি করলে কেমন হয়? ধরা যাক, অনেক বড় অপরাধী আমরা, মাস্টার ক্রিমিন্যাল...'

'তাহলে আগে ভাবো, ধরা পড়লে কি হবে? শুনেছি, অপরাধ করে শেষ পর্যন্ত কোন অপরাধীই পার পায় না।'

কার্ডগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছে রবিন। 'মাস্টার ক্রিমিন্যাল হয়ে সুবিধে করতে পারব না। প্রেসে কার্ড ছাপাটাই শিখতে পারলাম না ঠিকমত, এত সহজ একটা কাজ।'

'কথার কথা বললাম আর কি,' কিশোর বলল। 'আমরা গোয়েন্দা তো, মনে হলো বড় ডাকাতি কিভাবে কিভাবে হতে পারে, সেটা আগেই যদি ভেবে রাখি, অপরাধীদের চেয়ে এগিয়ে থাকতে পারব। মাস্টার-মাইণ্ড ক্রিমিন্যালদের অপরাধী মনে কি কি ভাবনা চলে, বুঝতে পারব।' অনেক সময় দুর্বোধ্য করে কথা বলা কিংবা কঠিন শব্দ ব্যবহার করা কিশোরের স্বভাব।

মাথা ঝাঁকাল মুসা, 'তা ঠিক। এই যেমন, তোমার ফর্মুলায় ফেললে, রেডিওর মালিকদের কুৎসিত মনে কি কি ভাবনা চলে সেটা জানা থাকলেও আমার জন্যে অনেক সুবিধে হবে। দেখেছ, রেডিওটার কি অবস্থা করেছে? কতখানি বাজে লোক হলে এমন সুন্দর একটা জিনিসকে এভাবে নষ্ট করতে পারে? খারাপ করে আবার নিজে নিজেই কারিগরি ফলাতে গেছে। একটা তারও জায়গামত নেই...দাঁড়াও, আগে ঠিক করে নিই। তারপর ডাকাতির আলোচনায় যোগ দেব।'

কাজ শেষ, শুধু একটা স্ক্রু লাগানো বাকি। শক্ত করে লাগাল সেটা মুসা। তারপর হাসিমুখে রেডিওটা তুলে কিশোরকে দেখিয়ে বলল, 'এটা বেচতে পারলে কম করেও তিন ডলার লাভ হবে তোমার চাচার। বাতিল জিনিস ছিল, একেবারে

নতুন করে দিলাম।'

হাসল কিশোর। 'দেখতে তো ভালই লাগছে। দেখো, কাজ করে কিনা।'

ছোট্ট একটা নব টিপে দিয়ে ডায়াল ঘোরাতে শুরু করল মুসা। 'করছে!...এই যে লাইট জ্বলে।'

খরখর আওয়াজ বেরোল স্পীকার থেকে, ফিসফাস, ঝনঝন আর নানারকম বিচিত্র শব্দ করল কয়েক মুহূর্ত, তারপর শোনা গেল কথা। স্পষ্ট ভারি গলায় খবর হচ্ছে: *...সী-সাইডের অদ্ভুত ঘটনার কোন সমাধান করতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। গত এক হপ্তায় পাঁচটা কুকুর নিখোঁজ হওয়ার খবর এসেছে। কুকুরের মালিকেরা উদ্বিগ্ন।...কুকুর মালিক সমিতির সভাপতি মিস্টার ক্যাঙরুনিয়ান আজ...*

'দূর, দাও বন্ধ করে,' হাত নাড়ল কিশোর।

'হাহ, শেষমেষ কুত্তা চোর,' নব ঘুরিয়ে রেডিও অফ করে দিল মুসা। 'পাঁচটা কুকুর নিয়ে গেছে। করবে কি?'

'মাস্টার ক্রিমিন্যাল কিশোর পাশাকে সমাধান দিতে অনুরোধ করছি,' হেসে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল রবিন। 'তবে সেই সঙ্গে আমার অনুমানটাও বলে দেই। কুকুর চুরি করে লুকিয়ে রাখবে চোর। এ-এলাকার সব কুকুর যখন শেষ হয়ে যাবে, বাজারে কুকুরের চাহিদা বাড়তে বাড়তে অসম্ভব দাম হয়ে যাবে, তখন একদিন ঝপাৎ করে এনে অনেক কুকুর বাজারে ফেলবে। বিক্রি করে রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাবে।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর, তারমানে গভীর ভাবনা চলছে তার মনে। 'অদ্ভুত!' আনমনে বিড়বিড় করল।

'কি অদ্ভুত?' জানতে চাইল রবিন। 'পাঁচটা কুকুর? পাঁচ আমার কাছেও অদ্ভুত লাগে...'

মাথা নাড়ল কিশোর? 'পাঁচ সংখ্যাটা অদ্ভুত লাগছে না, লাগছে পাঁচটা কুকুর। এক হপ্তায় পাঁচটা হারাল, বেশি হয়ে গেল না?'

'ওই যা বলছিলাম, কুত্তা চোরের কাজ, কুকুরের বাজার দর ওঠাতে চাইছে। কিংবা মাংসের কারখানার মালিকের সঙ্গে শত্রুতা হয়েছে চোরের। কুকুর না থাকলে কুকুরের জন্যে মাংস কিনবে না কেউ, ফলে মার খাবে কোম্পানি। বিচিত্র প্রতিশোধ বলতে পারো।'

আলতো হাসি ফুটল কিশোরের ঠোঁটে। 'অনেক ঘুরিয়ে ভাবছ। এভাবে ভাবলে হবে না। আমি জানতে চাই, এ হপ্তায় পাঁচটা কেন? আর এই রহস্যের সমাধান করার জন্যে এখনও ডাকা হলো না কেন আমাদের?'

'হয়তো রহস্যটা তেমন জটিল মনে করছে না,' মুসা বলল। 'মাঝেমধ্যেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় কুকুর, ক'দিন পর আবার ফিরেও আসে। এটা কোন ব্যাপারই না।'

'আমারও তাই মনে হয়,' মাথা দোলাল রবিন। 'খবরে কিন্তু বলেনি কুকুরগুলো দামী। শুধু বলেছে, নিখোঁজ।'

'হয়তো তোমাদের অনুমানই ঠিক,' মেনে নিতে পারছে না কিশোর। 'ভাবছি

কেউ তো এখনও ডাকল না, রহস্যটায় নাক গলাই কিভাবে? যেচে খোঁজ নিতে গেলে যদি মালিকেরা বিরক্ত হয়, কিংবা আমাদেরকেই চোর ভেবে বসে?'

'যাচ্ছে কে?' বলল মুসা।

'বা-রে, এমন একটা জটিল রহস্য···'

'জটিল রহস্য?' রবিনের দিকে একবার তাকিয়ে আবার কিশোরের দিকে ফিরল মুসা, 'কুকুর হারানোটা একটা অতি সাধারণ ঘটনা, দু-চারটা সব সময়ই হারায়। এর মধ্যে রহস্য দেখলে কোথায়?'

'কর্তৃপক্ষ যখন সমাধান করতে পারছে না, নিশ্চয় রহস্য। আচ্ছা নাক গলানো বলছি কেন?' নিজেকেই যেন বোঝাল কিশোর। 'আমরা গোয়েন্দা, যে কোন রহস্যের সমাধান করার জন্যে এগিয়ে যেতে পারি। সী-সাইড এখান থেকে বেশি দূরে না, ইচ্ছে করলেই চলে যেতে পারি। যাচ্ছি না কেন?'

কার্ড ছাপানো শেষ, মেশিন বন্ধ করে দিল রবিন। ঘটারং-ঘট্, ঘট্-ঘট্-ঘটাং করে অন্তিম আর্তনাদ তুলে চুপ হয়ে গেল আদিম যন্ত্রটা। একটা কার্ড হাতে নিয়ে ছাপাটা দেখে নিজেই নিজের প্রশংসা করল সে, 'চমৎকার ছেপেছি।'

'হুঁ, ভালই,' দেখে বলল কিশোর। 'চলো, হেডকোয়ার্টারে গিয়ে আলোচনা করি।' জবাবের অপেক্ষা না করেই উঠে পড়ল সে।

পরস্পরের দিকে তাকাল অন্য দু-জন। তারপর গোয়েন্দা-প্রধানকে অনুসরণ করল। বলে কোন লাভ হবে না যে জানে, তবু হেসে বলল মুসা, 'গণতান্ত্রিক দেশে বাস করছি আমরা কিশোর, আমাদের তিনজনের মধ্যেও গণতান্ত্রিক চেতনা থাকা উচিত। যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে ভোটাভোটি আবার চালু করলে কেমন হয়?'

কিন্তু কিশোর শুনল বলে মনে হলো না। ছাপার মেশিনটার খানিক দূরে মোটা একটা পাইপের মুখ থেকে একটা লোহার পাত সরাচ্ছে। হামাগুড়ি দিয়ে পাইপের ভেতর ঢুকে গেল সে। কি আর করবে, মুসাও ঢুকল তার পেছনে। সব শেষে ঢুকল রবিন, ভেতরে থেকেই হাত বাড়িয়ে পাতটা আবার দাঁড় করিয়ে দিল পাইপের মুখে, ঢেকে দিল কৃত্রিম সুড়ঙ্গমুখ। হেডকোয়ার্টারে ঢোকার এটা একটা গোপন পথ, ওরা নাম রেখেছে 'দুই সুড়ঙ্গ'।

পাইপের মেঝেতে নরম কার্পেট বিছানো রয়েছে, কাজেই হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে কোন কষ্ট হচ্ছে না। প্রায় চল্লিশ ফুট মত জঞ্জালের ভেতর দিয়ে এগিয়ে একটা ট্রেলারের তলায় এসে শেষ হয়েছে পাইপ। মাথায় আলগা ঢাকনা, ওপর দিকে খোলে। ঠেলে তুলে ট্রেলারের ভেতরে ঢুকল কিশোর।

এক সময় এটা একটা মোবাইল হোম ছিল, দুর্ঘটনায় পড়ে না কিভাবে যেন ভেঙে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, বাতিল অবস্থায় কিনে এনেছিলেন রাশেদ পাশা। কোনভাবেই আর বিক্রি করতে না পেরে দিয়ে দিয়েছেন ছেলেদের। জঞ্জালের তলায় এখন পুরোপুরি চাপা পড়েছে ট্রেলারটা, বাইরে থেকে দেখা যায় না।

ওটাকেই সারিয়ে নিয়ে ভেতরে হেডকোয়ার্টার করেছে তিন গোয়েন্দা। সাজানো-গোছানো ছোট্ট অফিস, খুদে ল্যাবরেটরি, ছবি প্রসেস করার ডার্ক-রুম, টেলিফোন, টাইপরাইটার, আর নানারকম আধুনিক প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আছে

তাতে।

ডেস্কের ওপাশে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল কিশোর। পুরানো নষ্ট রিভলভিং চেয়ারটা অল্প পয়সায় কিনে এনে সারিয়ে নিয়েছে সে নিজেই। ডেস্কটাও পুরানো। কিন্তু ঘষেমেজে বার্নিশ করে চকচকে করে তোলা হয়েছে, নতুনই মনে হয় এখন। রবিন আর মুসা বসল তাদের চেয়ারে।

ঠিক এই সময় বাজল টেলিফোন।

তিনজনেই তাকাল একে অন্যের দিকে। কোন রহস্যের তদন্তের সময় না হলে সাধারণত ফোন করে না কেউ তাদেরকে।

দ্বিতীয়বার রিঙ হতেই রিসিভার তুলে নিল কিশোর। কানে ঠেকানোর আগে একটা সুইচ টিপল। স্পীকারের সঙ্গে যোগাযোগ অন হয়ে গেল, সবাই একসঙ্গে শুনতে পাবে এখন ওপাশের কথা।

'কিশোর পাশা?' মহিলা কণ্ঠ, 'মিস্টার ক্রিস্টোফার কথা বলবেন।'

'নতুন কেস!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন। হলিউডের বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফার ফোন করলে বুঝতে হবে, নতুন একটা জটিল কেস পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।

'হাল্লো, কিশোর পাশা,' স্পীকারে গমগম করে উঠল পরিচালকের কণ্ঠ। 'হাতে কোন কাজ আছে তোমাদের? আই মীন, কোন কেস?'

'না, স্যার। তবে মনে হচ্ছে একটা কিছু পাব এবার?'

'কি করে বুঝলে?'

'আপনি ফোন করেছেন।'

মৃদু হাসি শোনা গেল। 'ঠিকই আন্দাজ করেছ। আমার এক পুরানো বন্ধু, এক্স ফিল্ম ডিরেক্টর একটা সমস্যায় পড়েছে।'

'কি সমস্যা, স্যার?' সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল কিশোর।

দ্বিধা করছেন পরিচালক। অল্প কথায় কি ভাবে পরিবেশন করবেন কথাটা, ভাবছেন বোধহয়, সাজিয়ে নিচ্ছেন মনে। অবশেষে বললেন, 'কুকুর। এই খানিক আগে ফোন করে বলল, তার কুকুরটা খুঁজে পাচ্ছে না।'

উজ্জ্বল হলো কিশোরের চোখ। 'আপনার বন্ধু কি সী-সাইডে থাকেন?'

দীর্ঘ এক মুহূর্ত নীরবতা পর যখন কথা বললেন পরিচালক, বোঝা গেল তাজ্জব করে দিয়েছে তাঁকে কিশোর। 'হ্যাঁ। তুমি জানলে কি করে?'

'জানাটা কঠিন কিছু নয়। সাধারণ কয়েকটা ছিন্ন সুতো জোড়া দিয়েছি কেবল, জটিল করে কথা বলার সুযোগ পেলে সেটা ছাড়ে না কিশোর যার সঙ্গেই বলুক।

'হুঁ,' চুপ করে গেলেন পরিচালক।

'শুধু কুকুর নয়, স্যার, মনে হচ্ছে আরও ব্যাপার আছে। বলুন না?'

'আসলে, আমিই বিশ্বাস করছি না তো, তাই...ধরো, একটা জলজ্যান্ত ড্রাগন যদি চোখে পড়ে যায় হঠাৎ, মনের অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে?'

গলা পরিষ্কার করে নিল কিশোর। 'ড্রাগন?'

'হ্যাঁ। আমার বন্ধুর বাড়ি সাগরের তীরে, পাহাড়ের ওপর। নিচে গুহা আছে।

একটা বিশাল ড্রাগনকে সাগর থেকে উঠে এসে সেই গুহায় ঢুকতে দেখেছে সে।'
স্তব্ধ হয়ে রইল তিন গোয়েন্দা।
'এখন কি বলবে, বলো?' আবার বললেন পরিচালক। আমিই বিশ্বাস করতে পারছি না, তোমাদের কি করে করতে বলি? তা গিয়ে একবার দেখবে নাকি?'
এত উত্তেজিত হয়েছে কিশোর, তোতলাতে শুরু করল, 'আ-আপনার ব-বন্ধুর ঠিকানা বলুন স্যার। দারুণ জমবে মনে হয় কেসটা, তিন গোয়েন্দার সব চেয়ে রোমাঞ্চকর কেস!'
কাগজ-কলম নিয়ে তৈরিই আছে রবিন, তিন গোয়েন্দার সমস্ত কেসের রেকর্ড রাখা আর প্রয়োজনীয় লেখাপড়ার দায়িত্ব ওর ওপর। লিখে নিল ঠিকানা।
ছেলেদের 'গুড লাক' জানিয়ে লাইন কেটে দিলেন পরিচালক। দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। 'এই আধুনিক যুগে জ্যান্ত ড্রাগন দেখাটা সৌভাগ্য বলতে হবে, তাই না?'
মাথা ঝাঁকাল রবিন।
কিন্তু মুসা মুখটাকে এমন করে ফেলল যেন নিমের তেতো গিলেছে।
'কি ব্যাপার, সেকেণ্ড, খুশি হওনি মনে হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।
'রোমাঞ্চকর শব্দটার সঙ্গে আরও তিনটে শব্দ যোগ করা উচিত ছিল,' মুখ গোমড়া করে বলল মুসা, 'মিস্টার ক্রিস্টোফারকে বলনি সে কথা।'
ভুরু নাচাল শুধু কিশোর; অর্থাৎ, 'কী?'
'রোমাঞ্চকর এবং শেষ কেস,' বলল মুসা। 'জ্যান্ত ড্রাগনের সামনে গেলে বেঁচে আর ফিরব না কোনদিন!'

দুই

রকি বীচ থেকে প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ে ধরে মাইল বিশেক গেলেই সী-সাইড, প্রশান্ত মহাসাগরের কূলের ছোট্ট একটা শহর। ঠিক হলো, লাঞ্চের পর ওখানে যাবে তিন গোয়েন্দা। নিয়ে যাবে বোরিস, ইয়ার্ডের কর্মচারী, বিশালদেহী দুই ব্যাভারিয়ান ভাইয়ের একজন। ইয়ার্ডের ছোট পুরানো ট্রাকটাতে করে কিছু মাল ডেলিভারি দিতে সে যাবে সী-সাইডের ওদিকে, তিন গোয়েন্দাকে সঙ্গে নিতে কোন অসুবিধে নেই।
মেরিচাচীর রান্না ভরপেটে খেয়ে ট্রাকে এসে উঠল তিন কিশোর, বোরিসের পাশে গাদাগাদি করে বসল। ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এল ট্রাক, উপকূল ধারের মহাসড়ক ধরে ছুটে চলল দক্ষিণে।
'রবিন, রেফারেন্স বই দেখেছিলে?' এতক্ষণে জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেল কিশোর, 'ড্রাগনের কথা কি কি জেনেছ?'
'ড্রাগন হলো পৌরাণিক দানব। ডানাওয়ালা বিশাল সরীসৃপ, উড়তে পারে; বড় বড় বাঁকা নখ আছে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে আগুন বেরোয়।'
'আমি রেফারেন্স বই দেখিনি,' মুসা বলে উঠল। 'কিন্তু বাজি রেখে বলতে পারি, মোটেই শান্ত স্বভাবের নয় ড্রাগন। সাংঘাতিক পাজী জানোয়ার।'

'তা ঠিক,' সায় দিল রবিন। 'পৌরাণিক জীব, তারমানে বাস্তবে নেই। আর নেই যখন পাজী হলেই কি, ভাল হলেই বা কি?'

'ঠিক,' কিশোর বলল। 'রূপকথার গল্পে আছে ড্রাগনের কথা। যখনকার গল্প তখন যদি সত্যি সত্যি এই জীব থেকেও থাকে, তাহলেও এতদিন পর এখনকার পৃথিবীতে থাকার কথা নয়, ইভালুশনের থিওরি তাই বলে। বিশালদেহী ডাইনোসররা যেমন আর বেঁচে নেই আজ।'

'না থাকলেই ভাল,' মুসা বলল। 'কিন্তু ইভালুশনের থিওরি যদি সব প্রাগৈতিহাসিক দৈত্য-দানবকে হাওয়া করে দিয়েই থাকে, এই ড্রাগনটা এল কোত্থেকে?'

মুসার কথায় কান না দিয়ে কিশোর বলল, 'গত হপ্তায় সী-সাইড থেকে পাঁচটা কুকুর হারিয়েছে, তার মধ্যে মিস্টার ক্রিস্টোফারের বন্ধুরটাও থাকতে পারে। বাড়ির কাছে ড্রাগনও দেখেছেন তিনি। কিছু বোঝা যায়?'

'নিশ্চয় যায়,' বলল মুসা, 'ওসব কুকুরকে ধরে ধরে খেয়ে ফেলে ড্রাগনটা। মানুষের মাংসেও নিশ্চয় তার অরুচি হবে না। ড্রাগন ধরতে যাওয়াটা মোটেও উচিত হবে না আমাদের।'

'ধরতে পারলে তো কাজই হত। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যেতাম আমরা।'

'বিখ্যাত হয়ে লাভটা কি হবে?'

'সে সব তুমি বুঝবে না।'

সী-সাইডে ঢুকল ট্রাক। ঠিকানা বলল কিশোর।

গতি কমিয়ে রাস্তাটা খুঁজতে শুরু করল বোরিস। আরও মাইলখানেক এগিয়ে গাড়ি থামাল। 'মনে হয় এটাই।'

পাতাবাহারের উঁচু বেড়া, তারপরে সারি সারি পাম গাছ, বাড়িটা থাকলে লুকিয়ে আছে তার ওপারে।

গাড়ি থেকে নামল ছেলেরা।

'বোরিস,' কিশোর বলল, 'দুই ঘণ্টার বেশি লাগবে না। ফেরার পথে নিয়ে যাবেন।'

বলল 'ও-কে', কিন্তু উচ্চারণের কারণে শব্দটা শোনাল 'হো-কে'। কর্কশ ভারি কণ্ঠস্বর তার। ট্রাকের মুখ ঘুরিয়ে সরু পথটা ধরে চলে গেল আবার শহরের দিকে।

'চলো, আগে আশপাশটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিই,' পরামর্শ দিল কিশোর। 'সুবিধে হবে।'

পাহাড়ী এলাকা, উঁচু ঢালের ওপর বাড়ি। পুরো অঞ্চলটাই কেমন নিঃসঙ্গ, নির্জন। চিত্রপরিচালকের বাড়ির সামান্য দূরে ছোট একটা খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল ছেলেরা, নিচে তাকাল। পাহাড়টা এখানে খাড়া নেমে গেছে অনেক নিচের সৈকতে। তীরে এসে ঢেউ ভাঙছে।

সেদিক তাকিয়ে রবিন বলল, 'খুব সুন্দর। কি শান্তি।'

'শান্তি না ছাই,' গজগজ করল মুসা, 'ঢেউ দেখেছ একেকটা!'

'তেমন আর বড় কই?' কিশোর বলল। 'ফুট তিনেকের বেশি না। তবে রাতে

জোয়ারের সময় নিশ্চয় আরও ফুলে ওঠে। ড্রাগন আসার উপযুক্ত সময় তখন। ঢেউয়ের তলায় লুকিয়ে লুকিয়ে চলে আসতে পারবে।' বকের মত গলা বাড়িয়ে নিচে তাকাল সে। গুহাটা দেখা যায় না। 'এখান থেকে দেখা যাবে না। আগে কথা বলে আসি মিস্টার জোনসের সঙ্গে, তারপর নেমে দেখব।'

সৈকতের দিক থেকে চোখ ফেরাল না রবিন। 'নামবে কি করে?'

পুরানো কয়েকটা তক্তা দেখাল মুসা, ধাপে ধাপে নেমে গেছে। এককালে বোধহয় সাদা ছিল ওগুলো, কিন্তু এখন আর রঙ চেনা যায় না। রোদ, বৃষ্টি এবং সাগরের নোনা হাওয়ায় করেছে এই অবস্থা। 'সিঁড়ির কি ছিরি,' বলল সে. 'নামতে গেলেই খসে পড়ে কোমর ভাঙবে।'

খাড়া পাড়ের কিনারটা দেখিয়ে কিশোর বলল, 'আরও সিঁড়ি নিশ্চয় আছে। এখান থেকে দেখছি না বটে, খুঁজলেই পাওয়া যাবে। চলো এবার, বাড়িটাতে ঢুকি।'

আগে আগে চলল কিশোর। পাতাবাহারের বেড়ার চাপে জড়সড় হয়ে আছে যেন কাঠের গেটটা। ঠেলা দিতেই পাল্লা খুলে গেল। পামের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে চলে গেছে পথ। নারকেলের ঝাড়, ঘন ঝোপ আর বুনো ফুলের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে বিবর্ণ হলদে ইঁটের একটা বাড়ি। অযত্নে হয়েছে এই অবস্থা, বোঝাই যায়। সাগর থেকে হু-হু বাতাস এসে সরসরানি তুলছে নারকেল শাখায়, বুনো ফুল আর লতাকে নড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। বাড়িটা সাগরের একেবারে কিনারে।

সদর দরজায় এসে ঘণ্টা বাজাল কিশোর।

দরজা খুলে দিলেন মিস্টার জোনস। বেঁটে, মোটাসোটা মানুষ। বিষণ্ণ ঘড় বড় বাদামী চোখ, ঘন ভুরু, সাদা চুল, মুখের রোদে পোড়া চামড়ায় বয়েসের ভাঁজ।

'এসো এসো,' হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'ডেভিস পাঠিয়েছে তো? তিন গোয়েন্দা?'

'হ্যাঁ, স্যার,' পকেট থেকে কার্ড বের করে দিল কিশোর। 'আমি কিশোর পাশা···ও মুসা আমান, আর ও রবিন মিলফোর্ড।'

সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকালেন জোনস, কার্ডটা পকেটে রাখলেন। 'এসো। স্টাডিতে গিয়ে কথা বলি।'

রোদ ঝলমলে মস্ত এক খোলামেলা ঘরে ওদের নিয়ে এলেন তিনি।

হাঁ হয়ে গেল ছেলেরা। বিরাট ঘরের দেয়ালে মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত খালি ছবি আর ছবি, এক তিল জায়গা নেই। নানা রকম বিখ্যাত চিত্রকর্ম, বড় বড় অভিনেতা-অভিনেত্রীর সই করা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি, আর সিনেমা জগতের কিছু বিশেষ অনুষ্ঠানের দৃশ্য।

পড়ার টেবিলটায় টেবিল-টেনিস খেলা যাবে, এত বড়; কাগজ, বই আর কাঠের ছোটবড় খোদাইকর্মে বোঝাই। শেলফ ও শো-কেসগুলোতেও ঠাঁই নেই, অদ্ভুত সব মূর্তি, পুতুল, খেলনায় ভর্তি। দুটো জিনিস কিশোরের দৃষ্টি আকর্ষণ করল: দুটোই মূর্তি—একটা ডাইনীর, মধ্যযুগে তৈরি হয়েছিল; আরেকটা আফ্রিকান এক কালো দেবতার, কুৎসিত, নিষ্ঠুর চেহারা।

ছেলেদের চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন বৃদ্ধ। ঘুরে গিয়ে বসলেন ডেস্কের

ওপাশে সিংহাসনের মত এক চেয়ারে। 'আমি কি কাজ করতাম নিশ্চয় বলেছে ডেভিস?'

'হ্যাঁ,' কিশোর জানাল। 'চিত্র পরিচালক।'

'ছিলাম,' হেসে বললেন জোনস। 'অনেক বছর আগেই রিটায়ার করেছি। ডেভিস তখন নতুন পরিচালক হয়েছে। ও-তো এখন বিখ্যাত লোক, আমার সময়ে আমিও ছিলাম। আমাদের দু-জনের কাজের ধারা প্রায় এক। দু-জনেই রহস্য-রোমাঞ্চের ভক্ত, তবে মানসিকতার দিক থেকে কিছুটা আলাদা। ও বাস্তব জিনিস পছন্দ করে, আমি অবাস্তব।'

'বুঝলাম না, স্যার।'

'বাস্তবে যা ঘটে, ঘটতে পারে, সে-সব কাহিনী নিয়ে ছবি তৈরি করে ডেভিস। আমি করতাম অতিকল্পিত কাহিনী নিয়ে, ফ্যান্টাসি। ড্রাগনের কথা পুলিশের কাছে বলতে পারলাম না তো-এ জন্যেই। উদ্ভট, অবাস্তব কাহিনী নিয়ে ছবি করেছি সারা জীবন, ভয়াবহ দুঃস্বপ্নেও যা কল্পনা করা যায় না। আমার ছবিতে থাকত ভয়ানক সব দৈত্য-দানব, মায়ানেকড়ে, ভূত-প্রেত ডাইনী···সোজা কথা, আমার স্পেশালিটি ছিল হরর ফিল্ম।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ, স্যার, আপনার নাম শুনেছি। এবার চলচ্চিত্র উৎসবে আপনার একটা ফিল্মও দেখেছি। রোম খাড়া হয়ে গিয়েছিল।'

'থ্যাংক ইউ,' বললেন বৃদ্ধ। 'তাহলে বুঝতেই পারছ, কেন পুলিশের কাছে যাইনি। দীর্ঘ দিন কোন ছবি বানাই না, নতুন দর্শকেরা অনেকেই আমার নাম জানে না, পুরানোরা ভুলে গেছে। কিছু বোকা লোক ভাববে, ড্রাগনের গল্প ফেঁদে নতুন করে পাবলিসিটি করতে চাইছি আমি, আবার সিনেমায় ঢোকার জন্যে।

'কিন্তু আমি জানি, আমার কাজ শেষ, দিন শেষ। এখন কিছু বানালে চলবে না, ফ্লপ করবে, নেবে না আধুনিক দর্শক। এই বয়েসে নতুন কিছু যে বানাব, তা-ও সম্ভব না। সেই পুরানোই হয়ে যাবে। তার চেয়ে নতুনদের জন্যে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে এসেছি। অনেক কাজ করেছি জীবনে, আর না, বুড়ো বয়েসটা একটু শান্তিতে কাটাতে চাই। টাকার অসুবিধে নেই আমার। শান্তিতেই কাটাচ্ছিলাম এখানে, নিরিবিলি···'

'ড্রাগনটা এসে সব পণ্ড করল, না?' জোনসের বাক্যটা শেষ করল কিশোর।

নাক কুঁচকালেন পরিচালক, 'হ্যাঁ।' এক এক করে তাকালেন ছেলেদের মুখের দিকে, তাঁর কথা বিশ্বাস করছে কিনা বোঝার চেষ্টা করলেন। 'সাগর থেকে উঠেছে। একটা কথা ডেভিসকে বলতেও বেধেছে, বলিনি, যদি হেসে ফেলে। ড্রাগনটা শুধু যে দেখেছি তাই নয়, তার গর্জনও শুনেছি।'

হঠাৎ যেন বড় বেশি নীরব হয়ে গেল ঘরটা।

'শুনেছেন,' শান্ত রয়েছে কিশোর। 'শব্দটা ঠিক কেমন? তখন কোথায় ছিলেন আপনি?'

ছোট তোয়ালের সমান একটা রঙিন রুমাল বের করে ঘন ভুরুর ঘাম মুছলেন জোনস। 'একটা টিলার ওপর। এই তো, কাছেই। ওখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায়

সাগর।···চোখের ভুলও হতে পারে, কি জানি!'

'তা পারে। কিন্তু শোনাটা? শব্দ তো আর চোখের ভুল নয়?'

'তা নয়। তবে কানেও তো ভুল শুনতে পারি? বুড়ো হলে চোখ-কান সবই খারাপ হয়ে যায়।' আবার কপালে রুমাল বুলালেন তিনি। 'তবে, এ-ক্ষেত্রে ভুল হয়েছে এটা বিশ্বাস করতে পারছি না, দেখেছি যে সেটাও মেনে নিতে পারছি না। বাস্তবে ড্রাগন নেই, সেই রূপকথার যুগেও ছিল না, আর এখন তো থাকার প্রশ্নই ওঠে না। ড্রাগন নিয়ে ছবি বানিয়েছি আমি, সবই যান্ত্রিক দানব, খেলনা। ভারি ইঞ্জিনের গর্জনের সঙ্গে তীক্ষ্ণ হুইসেল মিলিয়ে, সেটাকে বিশেষ কায়দায় ভোঁতা করে চালিয়ে দিয়েছি ড্রাগনের গর্জন বলে। সেই সঙ্গে পর্দায় বিশেষ আবহ সৃষ্টির ব্যবস্থা করে ভয় পাইয়েছি হলের দর্শকদের। অন্ধকারে ভীতিকর শোনায় ওই গর্জন।

'কিন্তু গতরাতে যা শুনেছি, আমার সৃষ্টি করা শব্দের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। উঁচু পর্দার তীক্ষ্ণ একধরনের খসখসে শব্দ, যেন শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে জানোয়ারটার, সেই সঙ্গে কাশি। আসলে, বলে ঠিক বোঝানো যাবে না শব্দটা কেমন।'

'শুনলাম, আপনার বাড়ির নিচে একটা গুহা আছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'ছোট, না বড়? ড্রাগনের মত কোন জানোয়ারের জায়গা হবে?'

'তা হবে। একটা না, অনেক গুহা আছে এখানে, মাটির তলায় সুড়ঙ্গের জাল রয়েছে বলা যেতে পারে। উত্তর-দক্ষিণে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। এককালে জলদস্যু, চোরাচালানি আর ডাকাতের আড্ডা ছিল ওসব জায়গায়। বছর কয়েক আগে ভূমিকম্পে একটা পাহাড়ের চূড়া ভেঙে গিয়ে ভূমিধস নামে, বেশ কিছু সুড়ঙ্গ আর গুহা বুঁজে যায়, হ্যাগিটিজ পয়েন্টের কাছে। তবে এখনও অনেক গুহা আর সুড়ঙ্গ আগের মতই আছে।'

'হুঁম!' আনমনে মাথা দোলাল কিশোর। 'অনেক বছর ধরেই তো আছেন এখানে, কিন্তু এই প্রথম ড্রাগন দেখলেন। তাই না?'

মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ, হাসলেন। 'একবারই যথেষ্ট, আর দেখতে চাই না। কুকুরটা না হারালে এটাকেও দেখতাম না। পাইরেটকে খুঁজতে গিয়েই তো চোখে পড়ল।'

'কুকুরটার কথা কিছু বলুন। রবিন, নোটবই আর পেন্সিল নাও,' কিশোর বলল।

ছেলেদের খাঁটি পেশাদারী ভাবভঙ্গি দেখে মুচকি হাসলেন পরিচালক। বললেন, 'গত দু-মাস ছিলাম না এখানে। ছবি বানাই না বটে, কিন্তু সিনেমা-জগৎ থেকে পুরোপুরি বিদায়ও নিতে পারিনি। প্রতি বছর বড় বড় যত চলচ্চিত্র উৎসব হয়, সবগুলোতে যোগ দিই; ইউরোপে যাই, দুনিয়ার বড় বড় অনেক শহরে যাই। এবারও গিয়েছিলাম। রোম, ভেনিস, প্যারিস, লণ্ডন আর বুদাপেস্ট সফর করেছি, উৎসবে যোগ দিয়েছি, পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেছি।

'আমি বাইরে গেলে পাইরেটকে একটা কুকুরের খোঁয়াড়ে রেখে যাই, কাছেই খোঁয়াড়টা। গত হপ্তায় ফিরে এসে ওখান থেকে নিয়ে এসেছিলাম ওকে। খুব সুন্দর কুকুর, আইরিশ সেটার। দিনে বেঁধে রাখি, রাতে ছেড়ে দিই। মাঝে মাঝেই বাড়ির

সীমানার বাইরে চলে যেত পাইরেট, খানিকক্ষণ পরেই ফিরে আসত। কাল রাতে বেরিয়ে আর ফিরল না। তিন বছর ধরে আছে, কোনদিন এ রকম হয়নি। ফোন করলাম খোঁয়াড়ে। ভাবলাম, দু-মাসের অভ্যাস, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গেছে। কিন্তু ওখানে যায়নি কুকুরটা। নিজেই খুঁজতে বেরোলাম তখন। ড্রাগনটাকে দেখলাম।'

'সৈকতে যাননি নিশ্চয়?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ। 'না। কি যে খারাপ লেগেছে না! সারাজীবন লোককে ভয় দেখিয়েছি, আতঙ্কিত করেছি, তাদের ভয় দেখে হেসেছি, মজা পেয়েছি। নিজে ভয় পাওয়ার পর বুঝলাম, ওদের কেমন লেগেছে...ভয়ানক ড্রাগনটা পাইরেটকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে ভাবলেই মনটা খারাপ হয়ে যায়...ওটাকে দেখে ভাবলাম, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে...কি, বিশ্বাস হচ্ছে?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'সকালে আপনার বন্ধুকে ফোন করলেন, তাই না?'

আবার ভুরু আর কপাল মুছলেন বৃদ্ধ। 'ডেভিস আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রহস্যের জগতে অনেক উদ্ভট ঘটনা ঘটে, জানা আছে তার। তাই প্রথমেই তার কথা মনে পড়ল। ভাবলাম, কোন সাহায্য করলে সে-ই করতে পারবে। ভুল করিনি। বিশ্বাস না করলে তোমাদের পাঠাত না। তোমাদের ওপর ভরসা করে সে, বুঝতে পারছি।'

'আপনি করছেন?'

'করছি। ডেভিস আমার চেয়ে অনেক বেশি খুঁতখুঁতে। সে যাদের ওপর আস্থা রাখতে পারে, তাদের ওপর আমিও রাখতে পারি চোখ বুজে।'

'থ্যাংক ইউ, মিস্টার জোনস,' খুশি হলো কিশোর। 'এই শহরে আরও কুকুর হারিয়েছে, জানেন? গত এক হপ্তায় পাঁচটা, আপনারটা ছাড়াই।'

আবার মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। 'শুনেছি, তবে পাইরেট নিখোঁজ হওয়ার পর। আগে জানলে ওকে ছেড়ে রাখতাম না।'

'যাদের হারিয়েছে, তাদের কারও সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'না। ভয়েই যাইনি। মুখ ফসকে যদি ড্রাগনের কথাটা বেরিয়ে যায়!'

'এখানে সবারই কুকুর আছে?'

হাসলেন জোনস। 'সবার নেই। রাস্তার ওপারে মিস্টার হেরিঙের নেই। আমার বাড়ির ডানে আরেক প্রতিবেশী আছে, রোভার মারটিন, তারও নেই। আর তেমন কাউকে চিনি না। নিরিবিলি একা থাকা পছন্দ আমার। বই, ছবি, আর পাইরেটকে নিয়ে কাটাই। এখানে কারও সঙ্গে বিশেষ আলাপ নেই। দেখা হলে, কেমন আছেন, ভাল, ব্যস।'

উঠল কিশোর। 'যাই এখন। কিছু জানতে পারলে জানাব আপনাকে।'

তিন গোয়েন্দার সঙ্গে আবার হাত মেলালেন জোনস। গেটের কাছে এগিয়ে দিয়ে গেলেন ওদেরকে। বাইরে বেরিয়ে পাল্লাটা বন্ধ করে দিল কিশোর। ওপরের হুক লাগিয়ে দিল।

হেসে বলল মুসা, 'ভয় পাচ্ছ? ড্রাগন বেরোবে ভাবছ বাড়ির ভেতর থেকে?'
'যা গেট, ড্রাগনের বাচ্চাকেও ঠেকাতে পারবে কিনা সন্দেহ,' বলল কিশোর। 'এমনি তুলে দিলাম। ভদ্রতা।'
নির্জন পথের দিকে তাকাল মুসা। ঘড়ি দেখল। 'বোরিস আসছে না কেন?' এই এলাকা ছাড়তে পারলে যেন বাঁচে।
'এত তাড়াতাড়ি আসার কথা না। আরও দেরি হবে।'
রাস্তা পেরোতে শুরু করল কিশোর।
'যাচ্ছ কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রবিন।
'মিস্টার হেরিঙের সঙ্গে দেখা করব। তারপর যাব মারটিনের ওখানে। এমন একটা জায়গায় থাকে অথচ কুত্তা পালে না, তারা কেমন লোক, দেখার আগ্রহ নেই তোমাদের?'
'না, নেই,' দু-হাত নাড়ল মুসা। 'এখানে সব পাগলদের বাস। একজন দেখেছে ড্রাগন, আরেকজন হয়তো বলবে আরব্য উপন্যাসের চেরাগওয়ালা দৈত্য দেখেছে। আমার গিয়ে কাজ নেই।'
কিন্তু দেখা গেল, কিশোরের পেছনে মুসাই গেল আগে, তারপর রবিন।
সরু পথ পেরিয়ে গেট খুলে ঢুকল মিস্টার হেরিঙের সীমানায়। জোনসের বাড়িতে যেমন অযত্ন, এখানে তেমনি অতিযত্ন। সব কিছু ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন। পাতাবাহারের একটা পাতাও এদিক-ওদিক হয়ে নেই, সমান করে ছাঁটা, সমান উঁচু প্রতিটি গাছ, ঝকঝকে সবুজ লন, নিয়মিত ঘাস ছাঁটা হয়, একটা মরা ডাল নেই বাগানের কোন গাছে। ফুলের বিছানাগুলো দেখার মত। বাড়ির মালিক পরিষ্কার থাকতে পছন্দ করেন।
বেল টিপল কিশোর।
প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা। মাঝারি উচ্চতার বলিষ্ঠ একজন লোক কড়া চোখে তাকালেন ওদের দিকে। 'কি চাই?' বাজখাই কণ্ঠ।
'মাপ করবেন, স্যার,' বিনয়ে বিগলিত গোয়েন্দাপ্রধান। 'রাস্তার ওপারে আপনার পড়শীর সঙ্গে দেখা করে এলাম, মিস্টার জোনসের কথা বলছি। তাঁর কুকুরটা হারিয়ে গেছে। আপনি কিছু জানেন কিনা জিজ্ঞেস করতে এলাম।'
চোখের পাতা কাছাকাছি হলো ভদ্রলোকের, ঘন ভুরুজোড়া কাছাকাছি হয়ে আবার সরে গেল। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল। 'কুত্তাটা তাহলে হারিয়েছে? খুব ভাল। আর না পাওয়া গেলেই খুশি। যত্তসব পাগল-ছাগল, কুত্তা পালে, হুঁহ্!'
জ্বলে উঠল তাঁর চোখ, মুঠো হলো আঙুল।
বাপরে, ঘুসি মারতে আসবে নাকি! ভয় পেয়ে গেল মুসা।
জোর করে চেহারাটা স্বাভাবিক রাখল কিশোর। বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে তারও। 'আপনি যে কুকুর দেখতে পারেন না, নিশ্চয় যথেষ্ট কারণ আছে। কি করেছে ওরা যদি বলেন...'
'কি করেছে, না; কি করেছে! বলি, কি করেনি? সব সময় যা করে তাই করেছে। সারা রাত হউ হউ করে চেঁচায়, চিৎকারের জ্বালায় ঘুমানো যায় না।

আমার ফুলের বেড মাড়িয়ে শেষ করে, লন নষ্ট করে, ডাস্টবিন উল্টে ফেলে ময়লা-আবর্জনা সব পথের ওপর ছড়িয়ে দেয়। আরও শুনবে?'

'তাই নাকি?' বলল কিশোর। 'মালিকদের আরও সাবধান হওয়া উচিত। আমরা স্যার, এই এলাকায় এই প্রথম এসেছি, মিস্টার জোনস কুকুরটা খুঁজে দিতে ডেকেছেন। তাঁকে বলব আপনার অসুবিধের কথা। তাঁর কুকুর আপনার জিনিস নষ্ট করে থাকলে ক্ষতিপূরণ দিতে তিনি বাধ্য। কুকুরের জন্যে সব কিছুই তিনি করতে রাজি...'

বাধা দিলেন হেরিঙ, 'রাজি, না; রাজি! কুকুরের জন্যে সব কিছুই করবেন! একটু দাঁড়াও, দেখাচ্ছি,' ভেতরে চলে গেলেন তিনি।

দাঁড়িয়ে আছে তিন গোয়েন্দা, ভদ্রলোকের ব্যবহারে অবাক।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল আবার দরজা। ফিরে এসেছেন হেরিঙ। হাতে শটগান।

'ওরা কেউ কিছু করবে না। যা করার এরপর থেকে আমাকেই করতে হবে। জানো কি করব?' ফেটে পড়ল বাজখাঁই কণ্ঠ। 'কুত্তাটা আবার এলে দুটো নলই খালি করব হারামীটার পাছায়। কুত্তার ছায়া আমার বাড়িতে দেখলেই গুলি করব! অনেক সহ্য করেছি, আর না!'

বন্দুকের বাঁট কাঁধে ঠেকালেন তিনি। নিশানা করলেন তিন গোয়েন্দাকে, এমন ভঙ্গি, যেন ওরাই *কুত্তার ছায়া।*

তিন

ট্রিগারে আঙুলের চাপ বাড়ছে। কর্কশ কণ্ঠে ধমকে উঠলেন হেরিঙ, 'নিশানা খুব ভাল আমার, মিস করি না। আর কিছু বলার আছে তোমাদের?'

দুরুদুরু করছে মুসার বুক। তার মনে হলো নলের কালো ফুটো দুটো তার দিকেই চেয়ে আছে।

অস্বস্তিতে মাথা নাড়ল কিশোর। 'না, স্যার, আর কিছু জানার নেই। ডিসটার্ব করেছি, সরি। চলি।'

শক্ত হলো হেরিঙের ঠোঁট। 'হ্যাঁ, যাও, জোনসকে বলে দিও, মিষ্টি কথায় কোন কাজ হবে না। আর যেন খাতির করার জন্যে কাউকে না পাঠায় আমার কাছে।'

'তিনি, স্যার, পাঠাননি। আমরাই...

খোঁচা মারার ভঙ্গিতে সামনের দিকে বন্দুকের নলটা ঠেলে দিলেন হেরিঙ। থুহ্ করে থুতু ফেললেন মাটিতে।

ধীরে ধীরে পিছাতে শুরু করল ছেলেরা।

'আহ, দেখে হাঁটো! কানা নাকি?' *ধমকে* উঠলেন হেরিঙ। 'লন মাড়িয়ে দিচ্ছ তো!'

আড়চোখে দুই বন্ধুর দিকে তাকাল কিশোর। ভয় পাচ্ছে ওরা। পাগলের পাল্লায় পড়েছে ভাবছে। ঘুরতেও যেন ভয় পাচ্ছে, যদি গুলি করে বসেন।

ফিসফিস করে মুসাকে বলল রবিন, 'আস্তে ঘোরো। তাড়াহুড়ো কোরো না।'
মাথা সামান্য একটু কাত করে সায় জানাল মুসা। সাবধানে ঘুরল দু-জনে। ছোটার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে, কিন্তু ছুটছে না।
বোম ফাটল যেন পেছনে।
ভীষণ চমকে গেল মুসা। ধড়াস করে উঠল বুক। পরমুহূর্তে বুঝল, না, বন্দুকের গুলি নয়, দরজার পাল্লা লাগানোর শব্দ।
জোরে নিঃশ্বাস ফেলে ঘুরে তাকাল কিশোর। হেরিঙকে দেখা যাচ্ছে না।
অর্ধেক পথ এসে আরেকবার ফিরল। এখনও দরজা বন্ধ।
দ্রুত গেটের বাইরে বেরিয়ে এল ওরা।
'উফফ!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রবিন, 'বড় বাঁচা বেঁচেছি!'
'ঠিকই বলেছ,' মুসা বলল, 'আমরা একটু এদিক-ওদিক করলেই দিত গুলি মেরে!'
'না, মারত না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'বোল্ট লক করা ছিল, সেফ পজিশন।'
বোকা হয়ে গেল দুই সহকারী-গোয়েন্দা।
'অ, এ জন্যেই,' মাথা দোলাল মুসা, 'এ জন্যেই ভয় পাওনি তুমি! তাই তো বলি···'
'আমাদের গুলি করার জন্যে বন্দুক আনেননি,' কিশোর বলল। 'রাগ দেখাতে, ভয় দেখাতে এনেছিলেন। কুকুরের কথা বলেই ভুল করেছি।'
'গেছি কুকুরের কথা জিজ্ঞেস করতে,' বলল মুসা, 'আর কি করতাম?'
আনমনে ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'আবার গেলে সাবধানে কথা বলতে হবে মিস্টার হেরিঙের সঙ্গে।'
'আবার?' মাথা নাড়ল মুসা। 'না, ভাই, আমি এর মধ্যে নেই। যেতে হলে তুমি যাও। আমি আর যাচ্ছি না ওখানে।'
'আমিও না,' মানা করে দিল রবিন।
সহকারীদের কথায় বিশেষ কান দিল না কিশোর। 'এমনও হতে পারে, রাগ দেখানোটা একটা অভিনয়। কুকুরগুলোর খবর হয়তো তাঁর জানা।'
'কথাটা কিন্তু মন্দ বলনি!' একমত হলো রবিন।
'এভাবে আর হুট করে কোথাও ঢুকব না। বুঝে-শুনে, তারপর।'
'কি বলছে ও?' কিশোরকে দেখিয়ে রবিনকে জিজ্ঞেস করল মুসা।
জবাবটা কিশোরই দিল। হাত তুলে আরেকটা বাড়ি দেখিয়ে বলল, 'মিস্টার জোনসের আরেক প্রতিবেশী। একজনের সঙ্গে তো মোলাকাত করলাম, বাকি আরেকজন। তাঁর মেজাজটা জানাই বা বাকি রাখি কেন? মিস্টার রোভার মারটিনকেও কয়েকটা প্রশ্ন করব।'
বুক সমান উঁচু ধাতব একটা গেট পথরোধ করল ওদের। তার ওপর দিয়ে বিরাট বাড়িটার দিকে তাকাল ওরা।
'ভালই তো মনে হচ্ছে,' রবিন বলল। 'কামান-টামান নেই।'
'শটগান আছে কিনা দেখো!' খুব সাবধানে কয়েক ইঞ্চি পাশে সরল মুসা।

ওপর আর নিচতলার সবগুলো জানালায় নজর বোলাল। 'কই, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মিস্টার মারটিন বাড়ি নেই নাকি?'

আগে বাড়ল কিশোর। 'গেলেই দেখা যাবে...' থেমে গেল সে, হাঁ করে চেয়ে আছে গেটের পাল্লার দিকে। নিঃশব্দে খুলে যাচ্ছে।

'খাইছে!' ককিয়ে উঠল মুসা, 'জাদুকরের বাড়ি...'

'আরে না, বাতাসে খুলেছে,' রবিন বলল।

মাথা নাড়ল কিশোর। ডানার মত করে দু-পাশে দু-হাত ছড়িয়ে দিয়ে রবিন আর মুসাকে আটকাল, পিছিয়ে যেতে বলে নিজেও পিছিয়ে এল। আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে গেল গেট।

আবার সামনে এগোল কিশোর। খুলে গেল গেট।

'ইলেকট্রনিকের জাদু,' বলল সে। 'এয়ারপোর্ট, সুপারমার্কেট, অফিস-পাড়ার বড় বড় বিল্ডিংগুলোতে দেখনি?'

'তা দেখেছি,' মুসা বলল। 'কিন্তু কারও বাড়িতে এই প্রথম...'

'এতেই প্রমাণ হচ্ছে কুসংস্কার কিংবা ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করেন না মিস্টার মারটিন। ড্রাগনের ব্যাপারটা হেসেই উড়িয়ে দেবেন।'

'তাহলে আর গিয়ে লাভ কি?'

'এসেছি যখন দেখেই যাই না, ভেতরে ইলেকট্রনিকের আরও জাদু থাকতে পারে।'

গেটের ভেতরে পা রাখল ওরা। পথের ধারে লন, ঠিক মাঝখানে বড় একটা সূর্যঘড়ি, চমৎকার তার অলঙ্করণ। সামনে মাথার ওপরে একটা ফুলের জাফরি, তাতে অনেকগুলো ফুলগাছ, ফুল ফুটে রয়েছে।

সামনে এগোল ওরা। পেছনে নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল গেট। জাফরির তলা দিয়ে পথ। ওটার নিচ দিয়ে এগোতেই হঠাৎ যেন ভেঙে খসে পড়ল জাফরি। এক সঙ্গে পিছিয়ে আসতে গিয়ে একে অন্যের গায়ে ধাক্কা লাগাল ওরা। পড়ে যাচ্ছিল রবিন, খপ করে তার হাত চেপে ধরল মুসা।

আসলে পুরো জাফরিটা খসে পড়েনি। মস্ত এক মাচার চারধারে ধাতব রেলিঙ দিয়ে ঘেরা, চারপাশের ওই রেলিঙগুলো খসে পড়েছে চারদিক থেকে, মাচাটা আর তাতে লাগানো ফুলগাছগুলো রয়ে গেছে তেমনি। শিকের একটা খাঁচায় বন্দি হলো যেন ছেলেরা, মাথার ওপরে ফুলের কেয়ারি।

'আজব রসিকতা।' শুকনো ঠোঁট চাটল কিশোর। 'পোর্টকালিস দেখে আইডিয়াটা পেয়েছে বোধহয়।'

'সেটা আবার কি জিনিস?' জানতে চাইল মুসা।

'ভারি লোহার শিকের কপাট। পুরানো দুর্গের দরজার ওপরে শেকল দিয়ে ঝোলানো থাকত। শেকল ছেড়ে দিলেই ওপর থেকে ঝমঝম করে নেমে এসে পথ বন্ধ করে দিত।'

'বইয়ে ছবি দেখেছি,' রবিন বলল। 'বেশির ভাগ পুরানো দুর্গেরই সদর দরজায় লাগানো থাকত ওই জিনিস। পাল্লাও থাকত দরজায়। শত্রুরা পাল্লা ভেঙে ফেললে

তাদেরকে ঠেকানোর শেষ চেষ্টা হিসেবে ছেড়ে দেয়া হত পোর্টকালিস, পাল্লার চেয়ে অনেক শক্ত।'

'আমরা কি দুর্গে ঢুকছি নাকি?' হাত ওল্টাল মুসা।

অদ্ভুত একটা হিসহিস শব্দ তুলে আবার উঠে যেতে শুরু করল রেলিঙগুলো। মাচার চারধারে জায়গামত গিয়ে বসে গেল আবার।

পরস্পরের দিকে তাকাল ছেলেরা।

'রসিকতা,' বিড়বিড় করল কিশোর। 'চলো।'

কিশোরের হাত চেপে ধরল মুসা। 'যাওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে? এই দুর্গে আমাদেরকে ঢুকতে দিতে চায় না বোধহয়।'

হাসল কিশোর। 'ভয় পেলে? পাওয়ারই কথা অবশ্য। অটোমেটিক গেট, জাফরির ইলেকট্রনিক কনট্রোলড রেলিঙ। বিজ্ঞানের জাদুকর মিস্টার মারটিন। দেখা না করে যাচ্ছি না আমি।'

এগোল কিশোর। পেছনে ভয়ে ভয়ে পা ফেলতে ফেলতে চলল তার দুই সহকারী।

সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সঙ্গীদের দিকে চেয়ে হাসল গোয়েন্দাপ্রধান। তারমানে, দেখলে তো, আর কিছু হলো না। বেল বাজানোর সুইচে আঙুল রাখল।

'আঁউ!' করে চিৎকার দিয়ে ছিটকে সরে এল কিশোর। হাত ঝাড়ছে। সুইচেও কারিগরি করে রেখেছে। 'কারেন্ট!'

'আগেই বলেছি তোমাকে,' মুখ গোমড়া করে বলল মুসা। 'আমাদের ঢুকতে দিতে চায় না। তা-ও জোরাজুরি করছ। যথেষ্ট হয়েছে, চলো এবার। মিস্টার মারটিনের সঙ্গে দেখা করা আর লাগবে না।'

'আসলে আমাদের পরীক্ষা করছে।' ফেরার কোন ইচ্ছেই নেই কিশোরের। 'ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চাইছে। শেষ পর্যন্ত যদি থাকতে পারি, দেখা করবে এসে।'

কিশোরের কথার জবাবেই যেন মৃদু ক্লিক করে উঠে নিঃশব্দে খুলে যেতে শুরু করল দরজা।

'দারুণ!' রবিন বলল। 'পুরো বাড়িটাকে ইলেকট্রনিকসের জালে ঘিরে রেখেছে।'

সাবধানে ভেতরে পা রাখল ওরা। আবছা অন্ধকার, বড় বেশি নীরব।

কাউকে দেখা গেল না। কেশে গলা পরিষ্কার করে অদৃশ্য কারও উদ্দেশ্যে জোরে জোরে বলল কিশোর, 'গুড ডে, মিস্টার মারটিন। আমরা তিন গোয়েন্দা। আপনার প্রতিবেশী মিস্টার জোনসের হয়ে কথা বলতে এসেছি। আসব, স্যার?'

জবাব নেই।

তারপর, অতি মৃদু একটা খসখস শোনা গেল মাথার ওপরে। ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ। নেমে আসছে।

ঝট করে চোখ তুলে তাকাল তিনজনে।

ছাত দেখা যাচ্ছে না, অনেক উঁচু আর অন্ধকার। সেই অন্ধকার থেকে নেমে আসছে পাখিটা। বিশাল এক কালো বাজ পাখি। ছোঁ মারার জন্যে নামছে, গতি

বাড়ছে দ্রুত। তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল, বাঁকা ভীষণ ঠোঁট ফাঁক, ভেতরে চোখা লাল জিভ, চোখে তীব্র ঘৃণা। ধারাল নখ বাড়িয়ে ওদেরকে ছিঁড়তে আসছে।

চার

'খাইছে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। ঝাঁপ দিয়ে পড়ল মেঝেতে।

তার দেখাদেখি রবিন আর কিশোরও শুয়ে পড়ল।

থামল না পাখিটা। ভীষণ গতিতে নেমে এল। থেমে গেল ওদের মাথার এক ফুট ওপরে এসে। তিন গোয়েন্দাকে অবাক করে দিয়ে ঝুলে রইল ওখানেই। চিৎকারও থেমে গেছে।

আস্তে মাথা কাত করে ওপর দিকে তাকাল কিশোর। উঠে বসল। ভয় দূর হয়ে গেল চেহারা থেকে, সে-জায়গা দখল করল হাসি।

'ওঠো,' ডাকল সে। 'জ্যান্ত পাখি না ওটা।'

'কী?' ভয়ে ভয়ে মাথা তুলল মুসা। চোখে অবিশ্বাস।

রবিনের অবস্থাও তারই মত।

সরু তামার তারে ঝুলছে পাখিটা।

'খেলনা,' ছুঁয়ে দেখে বলল কিশোর। 'বেশির ভাগই প্ল্যাস্টিক।'

'আল্লারে, কোন্ পাগলের পাল্লায় পড়লাম!' মুখ বিকৃত করে ফেলল মুসা।

বিশাল ঘরের অন্ধকার থেকে ভেসে এল খসখসে অট্টহাসি। মাথার ওপর দপ করে জ্বলে উঠল একাধিক উজ্জ্বল আলো।

লম্বা, রোগাটে একজন মানুষ চেয়ে আছেন ওদের দিকে, পরনে কালো ঢোলা আলখেল্লার মত ওভারকোট। খাট করে ছাঁটা চুল, তামাটে লাল।

'রহস্যের দুর্গে স্বাগতম,' ভারি খনখনে গলায় বললেন তিনি, মুসার মনে হলো কবর থেকে উঠে এসেছে জিন্দালাশ।

সামনের দিকে বাঁকা হয়ে গেল তাঁর শরীর, প্রবল হাসিতে দুলছে। হাসতে হাসতে কেশে ফেললেন, তারপরও কাশি চলল কিছুক্ষণ, দমকে দমকে।

'রসিকতা-বোধ না ছাই!' নিচু কণ্ঠে বিড়বিড় করল মুসা। 'বদ্ধ উন্মাদ!'

হাসি আর কাশির জন্যে মুসার কথা কানে গেল না বোধহয় তাঁর। ধীরে ধীরে সোজা হলেন, চোখের কোণে পানি জমেছে। 'রোভার মারটিন বলছি। পাখিটাকে সরিয়ে দিচ্ছি, নইলে যদি ঠোকর মারে।'

উঠে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।

হাসিমুখে তাদের কাছে এগিয়ে এলেন মারটিন। হুক থেকে খুলে নিলেন পাখিটা।

ছাতের দিকে চেয়ে কিশোরও হাসল। সঙ্গীদের বলল, 'সরু লাইন বানিয়ে তার ওপর দিয়ে চালায়। ইলেকট্রিক খেলনা ট্রেনের মত।'

ওপর দিকে চেয়ে মুসা আর রবিনও দেখল বিশেষ কায়দায় তৈরি লাইন। সামান্য ঢালু। ওটার ওপর দিয়ে পাখিটা পিছলে নামে বলে গতি বাড়ে। লাইন শেষ

হলে ছিটকে নেমে আসে, আবছা অন্ধকারে মনে হয় ছোঁ মারতে আসছে।

'ট্রেন অনেক ভাল,' মুসা বলল। 'মানুষকে ভয় দেখায় না।'

হাসছেন মারটিন। 'খুব বোকা বানিয়েছি, না? সরি। বিচিত্র খেলনা বানানো আমার হবি।' হাত তুলে দেখালেন, 'ওই যে আমার কারখানা।'

ঘরের এক ধারে ওঅর্কশপ, নানারকম যন্ত্রপাতি, কাঠ তারের জাল, প্লাস্টিকের টুকরো, তারের বাণ্ডিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

পাখিটা একটা টেবিলে রাখলেন মারটিন। 'তারপর, কি মনে করে?' কণ্ঠস্বর পাল্টে গেছে, একেবারে স্বাভাবিক, তারমানে ইচ্ছে করেই তখন স্বর বিকৃত করে কথা বলছিলেন।

একটা কার্ড বের করে দিল কিশোর। 'এটা দেখলেই বুঝবেন।'

তিন গোয়েন্দার কার্ডটা পড়লেন তিনি, তারপর হাসিমুখে ফিরিয়ে দিলেন। 'হারানো কুকুরের খোঁজ নিতে এসেছ তো?'

'হ্যাঁ,' বলল কিশোর। 'মিস্টার জোনসের আইরিস সেটারটা পাওয়া যাচ্ছে না। ভাবছি, সী-সাইডের অন্যান্য কুকুর নিখোঁজের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে।'

'থাকতে পারে,' বললেন মারটিন। 'রেডিওর খবরে শুনেছি। জোনস তো মাঝে মাঝেই থাকে না, শুনেছি, গত দু-তিন মাসও নাকি ছিল না। গত হপ্তায় ফিরেছে। কুত্তাটা হারিয়েছে তাহলে। খুঁজে বের করতে পারবে তো?'

'চেষ্টা করব। ভাবলাম, মিস্টার জোনসের প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ করলে জরুরী তথ্য পাওয়া যাবে, তাই এসেছি। মিস্টার হেরিঙের ওখানেও গিয়েছিলাম। চেনেন নিশ্চয়?'

হাসলেন মারটিন। 'এখানে কে তাকে না চেনে? যা বদমেজাজ। বন্দুক দেখিয়েছে?'

'দেখিয়েছেন। তবে সেফটি ক্যাচ অন করা ছিল। শাসিয়েছেন, আবার যদি তাঁর বাড়িতে কুকুর ঢোকে, গুলি করে মারবেন। কুকুর দু-চোখে দেখতে পারেন না ভদ্রলোক।'

'শুধু কুকুর কেন, কোন কিছুই দেখতে পারে না। মানুষও না।'

'আপনি পারেন বলেও তো মনে হয় না,' ফস করে বলে বসল মুসা, অযথা ভয় পেয়েছে বলে রাগ লাগছে এখন। 'মানুষকে এভাবে ভয় দেখানোর কোন মানে হয়?'

'ভুল করলে। মানুষকে আমি খুবই পছন্দ করি। কিন্তু যখন তখন অবাঞ্ছিত লোক ঢুকে পড়ে তো, শান্তিতে কাজ করতে দেয় না, তাই এই বিশেষ ব্যবস্থা। ফেরিওলা আর কোম্পানির এজেন্টরা হচ্ছে সবচেয়ে বিরক্তিকর। তোমরা ভয় পেয়েছ, না?'

'দুর্বল হার্ট হলে এতক্ষণে তিনটে কফিনের অর্ডার দিতে হত আপনাকে।'

হেসে উঠলেন মারটিন। 'খুব মজার মজার কথা বলো যা হোক।...হ্যাঁ, আমি জাতে ইঞ্জিনিয়ার। ছোটখাটো আবিষ্কারও করেছি। আগেই বলেছি, খেলনা বানানো আমার হবি, তবে ওগুলো ক্ষতিকর নয়।'

'কুকুরের কথা কিছু বলুন,' আগের কথার খেই ধরল কিশোর। 'কিছু জানেন-টানেন?'

মাথা নাড়লেন মারটিন। 'সরি। রেডিওতেই যা শুনেছি। মালিকদের সঙ্গে গিয়ে আলাপ করে দেখতে পারো।'

'মিস্টার জোনসের সঙ্গে অবশ্য করেছি। কিন্তু তিনি যে কথা বললেন, বিশ্বাস করাই শক্ত।'

'কি কথা?'

ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'বলা কি উচিত হবে?'

'কেন হবে না?'

'হয়তো ব্যাপারটা ভালভাবে নেবেন না মিস্টার জোনস। সরি, মিস্টার মারটিন।'

'একেবারে উকিলের মত কথা বলছ। মক্কেলের গোপন কথা ফাঁস হয়ে যাবে যেন।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'অনেকটা সে রকমই, মিস্টার মারটিন। আপনি তো তাঁর প্রতিবেশী। সাংঘাতিক কোন রহস্যময় ঘটনা এখানে ঘটলে, আর সেটা তিনি জানলে, আপনারও জানার কথা।'

হাসলেন মারটিন। 'বাহ্, বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারো তো। তা খুলেই বলো না কি হয়েছে?'

কিশোরের এই ইনিয়ে-বিনিয়ে বলা সহ্য হলো না মুসার, এমনিতেই কিছুক্ষণ যাবৎ স্নায়ুর ওপর অসম্ভব চাপ গেছে। অধৈর্য হয়ে বলেই ফেলল, 'ড্রাগন দেখেছেন মিস্টার জোনস। গতরাতে সাগর থেকে উঠেছিল ওটা।'

'ড্রাগন! তাই নাকি? দেখেছে?' ভুরু কোঁচকালেন মারটিন।

দ্বিধা করছে কিশোর। এভাবে ফস করে মুসার বলে ফেলাটা পছন্দ হয়নি তার। কিন্তু আর গোপন রেখে লাভ নেই, যা বলার বলেই ফেলেছে। 'দেখেছে,' বলল সে। 'লোক জানাজানি হোক, এটা চান না মিস্টার জোনস, হাসির পাত্র হতে চান না।'

'অসম্ভ!।'

'শুধু দেখেননি,' রবিন বলল, 'ওটার গর্জনও শুনেছেন। তাঁর বাড়ির নিচে গুহায় নাকি গিয়ে ঢুকেছে।'

'মিস্টার জোনস যখন দেখেছেন,' কিশোর বলল, 'আপনিও দেখে থাকতে পারেন, একই এলাকায় থাকেন তো। তাই জিজ্ঞেস করতে এলাম।'

'না, আমি দেখিনি। সৈকতের ধারেকাছে যাই না আমি। সাঁতারও পছন্দ নয়। আর গুহার কাছে যাওয়া বাদ দিয়েছি অনেক দিন আগে। সাঙ্ঘাতিক খারাপ জায়গা।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'কেন? যখন তখন ভূমিধস নেমে মুখ বন্ধ হয়ে যায় বলে। ভেতরে আটকা পড়লে জ্যান্ত কবর হয়ে যাবে।'

'শুনেছি চোর-ছ্যাঁচড়েরও নাকি আড্ডা?' কিশোর বলল।

'আগে ছিল, অনেক আগে। ধসের ভয়ে ওরাও ঢোকে না এখন। কাছে গিয়ে একবার দেখে এসো না, তাহলেই বুঝবে। অনেক সময় পাড় ধসে বাড়িসুদ্ধ পড়ে যায়।' ক্ষণিকের জন্যে আলো ঝিলিক দিল মারটিনের চোখে। 'আহা, তোমাদের বয়েস যদি এখন হত আমার। ড্রাগন দেখার জন্যে গুহায় ঢুকতামই। তোমরাও ঢুকবে বুঝতে পারছি, কিন্তু সাবধান। খুব খারাপ জায়গা। মরো না যেন।'

'থ্যাংকস,' বলল কিশোর। 'তাহলে ড্রাগনের কথা বিশ্বাস করছেন না?'

হাসলেন মারটিন, 'তুমি করছ?'

দ্বিধায় পড়ে গেল কিশোর। 'ইয়ে...'

আরও জোরে হেসে উঠলেন মারটিন।

'আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভাল লাগল, মিস্টার মারটিন,' বলল কিশোর। 'মিস্টার জোনস আসলে কি দেখেছেন, খোঁজ নিয়ে জানার চেষ্টা করব।'

'হ্যাঁ, দেখো। জানি, অনেক হরর ফিল্ম বানিয়েছে জোনস। মাথায় সারাক্ষণ নানা রকম উদ্ভট চিন্তাভাবনা খেলে। ড্রাগন দেখাটা তার কল্পনা হতে পারে। কিংবা এমনও হতে পারে, তার সঙ্গে রসিকতা করেছে তার কোন পুরানো বন্ধু।'

'তা হতে পারে,' স্বীকার করল কিশোর।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন মারটিন, 'কত রকমের পাগল আছে এই দুনিয়ায়।'

তুমিও তো এক পাগল! বলতে ইচ্ছে করল মুসার, কিন্তু বলল না।

'সরি,' আবার বলল মারটিন। 'তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারলাম না। চলো, এগিয়ে দিয়ে আসি।'

দরজা খুলে বেরিয়ে এল ছেলেরা।

দরজার ওপাশ থেকে হাত বাড়িয়ে দিলেন ইঞ্জিনিয়ার। 'গুড লাক, সন।'

বাড়ানো হাতটা শক্ত করে চেপে ধরল কিশোর। 'থ্যাংক ইউ, স্যার,' বলে আলতো ঝাঁকি দিল।

নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। হাতটা ধরাই আছে কিশোরের হাতে। হাঁ হয়ে গেল সে। শিরশির করে মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত।

শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেছে ইঞ্জিনিয়ারের ডান হাতটা।

পাঁচ

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে ছেঁড়া হাতটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। মনে হচ্ছে একেবারে আসল, রক্ত-মাংসের তৈরি। আচমকা অস্ফুট একটা শব্দ করে উঠে ছেড়ে দিল হাতটা।

ফিরে তাকাল অন্য দুই গোয়েন্দা।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

দেখে চমকে গেল রবিনও, 'আরি! এ কি! একটা ছেঁড়া হাত!'

'খাইছে!' আঁতকে গেল মুসা।

বিড়বিড় করে বলল কিশোর, 'এটা···এটা মিস্টার মারটিনের হাত, হ্যাণ্ডশেক করার সময় ছিঁড়ে এসেছে!'

বাড়ির ভেতর থেকে জোর হাসি শোনা গেল। শেষ হলো চাপা কাশির মত শব্দ দিয়ে, আচমকা গলা টিপে ধরা হয়েছে যেন।

কিশোরের মুখে রক্ত জমল। 'গাধা বানিয়েছেন আমাকে মারটিন। রসিক লোক, ভুলেই গিয়েছিলাম।'

হাতটা তুলে দুই সহকারীর দিকে বাড়িয়ে ধরল সে।

মাথা নাড়ল মুসা।

রবিন নিল হাতটা। 'এক্কেবারে আসল মনে হয়। ডান হাত নেই আরকি মিস্টার মারটিনের। আরটিফিশিয়াল হাত লাগানো ছিল। জোরে ঝাঁকুনি দিয়েছ, খুলে চলে এসেছে।'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'মনে হয় না। হাসলেন, শুনলে না। এটাও রসিকতা। মানুষকে ভয় দেখানোর জন্যে উদ্ভট সব কাণ্ডকারখানা করে রেখেছেন।'

'হ্যাঁ,' মুখ বাঁকাল মুসা। 'নেই কাজ তো খই ভাজ. আর কি করবে? চলো, আরও কিছু করে বসার আগেই পালাই।'

হাতটা ছুঁড়ে ফেলে দিল রবিন।

জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করল তিনজনে।

ফুলের জাফরিটার ভেতর দিয়ে না গিয়ে পাশ কাটিয়ে এল। থেমে গেল ধাতব গেটটার সামনে এসে।

নিঃশব্দে খুলে গেল পাল্লা।

পথে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

'বাঁচলাম!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রবিন, 'মানুষকে কামড়ানোর জন্যে যে গেটে কোন ব্যবস্থা রাখেনি, এতেই আমি খুশি।'

'থেমো না, হাঁটো,' হুঁশিয়ার করল মুসা। 'এখনও বিপদ-মুক্ত নই আমরা।'

বেশ খানিকটা দূরে এসে থামল ওরা, হাঁপাচ্ছে।

'এবার কি? রবিনের প্রশ্ন। 'বোরিসের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকব?'

'তারচেয়ে চল বরং বীচের দিকে হাঁটতে থাকি,' প্রস্তাব দিল মুসা। 'এখানে যে কাণ্ড-কারখানা, তাতে বিশ মাইল হাঁটাও কিছু না। কষ্ট হয়তো হবে, কিন্তু নিরাপদ জায়গায় তো গিয়ে পৌছব।'

নিচের ঠোঁটে টান দিয়ে ছেড়ে দিল কিশোর। ঘড়ি দেখল। 'সময় আছে এখনও। নিচে গিয়ে গুহাটা একবার দেখলে কেমন হয়? কি বলো?'

একটা পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকাল মুসা, 'ওই ড্রাগনের গুহায়? আমি বলি কি, কিশোর, এই একটা রহস্য তুমি ভুলে যাও। বাদ দাও কেসটা।'

রবিনের দিকে ফিরল কিশোর, 'তোমার কি বক্তব্য?'

'মুসার সঙ্গে আমি একমত। মারটিন কি বললেন, মনে নেই? খুব বিপজ্জনক জায়গা। ড্রাগনের কথা না হয় বাদই দিলাম, ভূমিধসও কম খারাপ না। মেরে ফেলার জন্যে যথেষ্ট।'

পাড়ের কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। উঁকি দিয়ে নিচে তাকাল একবার। পুরানো কাঠের সিঁড়ির রেলিঙে হাত রেখে বলল, 'না দেখে ফিরে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? দেখে গেলে, বাড়ি গিয়ে ভাবনাচিন্তা করার একটা বিষয় পাব। না দেখে গেলে কি বুঝব?'

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল সে।

রবিনের দিকে তাকাল মুসা। নিচু স্বরে কিশোর যাতে শুনতে না পায় এমন করে বলল, 'আমাদের মতামতের কোন দামই দিল না। তার কথা কেন শুনতে যাব?'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রবিন। 'জানোই তো, ও গোঁয়ার। যা বলে, করে ছাড়ে। ধরে নাও না, আমরা ওর চেয়ে অনেক বেশি ভদ্রলোক,' হাসল সে।

মুসাও হাসল। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। আমরা ভদ্রলোকই। চলো। এখানে দাঁড়িয়ে থাকা মোটেও নিরাপদ নয়। কে জানে, মারটিন না আবার কোন উদ্ভুক্কু ঝামেলা ছুঁড়ে মারে। হেরিঙকেও বিশ্বাস নেই। মানুষের ওপর টার্গেট প্র্যাকটিসের শখ চাপলে মরেছি।'

রেলিঙ ধরে নামতে শুরু করল রবিন।

তারপর মুসা।

খুবই পুরানো সিঁড়ি, সরু ধাপগুলো বেশি কাছাকাছি, নড়বড়ে। ক্যাঁচম্যাচ করে উঠছে। খাড়াও যথেষ্ট।

ভয়ে ভয়ে নামছে দু-জনে। নিচের দিকে তাকাচ্ছে না।

ওপরে তাকাল কিশোর। দুই সহকারী নামতে দেখে মুচকি হাসল। কিন্তু হাসি মুছে গেল শিগগিরই। পনেরো ফুট ওপরে রয়েছে তখনও, এই সময় ঘটল অঘটন।

কোন রকম জানান না দিয়ে মুসার ভারে ভেঙে গেল একটা তক্তা। পিছলে গেল পা। রেলিঙ চেপে ধরে পতন রোধ করার অনেক চেষ্টা করল সে, পারল না। জোরাজুরিতে রেলিঙের জোড়াও গেল ছুটে। নিচে পড়তে শুরু করল সে।

মুসার চিৎকারে চমকে ওপরে তাকাল রবিন। তাড়াতাড়ি নামার চেষ্টা করল। কিন্তু কয় ধাপ আর নামবে? তার গায়ের ওপর এসে পড়ল মুসা।

রবিনের হাতও ছুটে গেল। সে-ও পড়তে লাগল।

ময়দার বস্তার মত এসে কিশোরকে আঘাত করল যেন দুটো শরীর। ঠেকানোর প্রশ্নই ওঠে না। রেলিঙ ভাঙল, পায়ের নিচের তক্তা ভাঙল, ভেঙে সবসুদ্ধ নিচে পড়তে শুরু করল কিশোরের শরীর।

ধুপ ধুপ করে নিচে পড়ল তিনটে দেহ।

কিশোরের ওপর কে পড়ল দেখার সময় পেল না সে, তার আগেই মাথা ঠুকে গেল পাথরে।

আঁধার হয়ে গেল সবকিছু।

ছয়

'কিশোর, তুমি ঠিক আছ?'

মিটমিট করে চোখ মেলল কিশোর। মুসা আর রবিনের চেহারা আবছা দেখতে পেল, কেমন যেন হিজিবিজি দেখাচ্ছে দুটো মুখই, চেয়ে রয়েছে তার দিকে।

চোখ বন্ধ করে মাথা ঝাড়া দিয়ে আবার মেলল সে। উঠে বসল। চোখের পাতায় লেগে থাকা বালি সরাল, মুখের বালি পরিষ্কার করল, তারপর বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই আছি। আমার ওপর কে পড়েছিল?'

'নাকমুখ ভোঁতা করে ফেলেছ। বালিতে দেবে গিয়েছিল তাই রক্ষা।'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল কিশোর। আশপাশে ভাঙা তক্তা পড়ে আছে, তার একটা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। না, এটাতে নেই। ফেলে দিয়ে আরেকটা তুলল। চতুর্থ তক্তাটা এক নজর দেখেই মাথা ঝাঁকাল সে। 'মুসা, তোমার দোষ নয়। তোমার ভারে ভেঙেছে বটে, তবে কারসাজি করে না রাখলে ভাঙত না। এমন ভাবে করে রেখেছে, যাতে পায়ের চাপে ভেঙে যায়।'

দুই সহকারীর দিকে কাঠটা বাড়িয়ে দিল সে। 'ভাল করে দেখলেই বুঝতে পারবে। নিচের দিকে কেটেছে, যাতে দেখা না যায়।'

হাতে নিয়ে রবিন আর মুসাও দেখল।

রবিন বলল, 'ঠিক বোঝা যায় না। ধরলাম, তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু আমরা নামব, এটা কে জানে?'

'ঠিক,' রবিনের কথায় সায় দিয়ে বলল মুসা। 'কিশোর, এটা তোমার অনুমান। দেখে তো বোঝা যায় না, কাটা হয়েছে। আমরা যে আসব, কে কে জানে, বলো? নিশ্চয় মিস্টার জোনস, মারটিন কিংবা হেরিঙ কাটেনি?'

মাথার যেখানটায় বাড়ি খেয়েছে কিশোর, ফুলে উঠেছে সুপারির মত। সেখানে হাত বোলাচ্ছে, দৃষ্টি দূরের আরেক সিঁড়ির দিকে। 'কি জানি,' কণ্ঠে অনিশ্চয়তা। 'ভুলও হতে পারে আমার। তবে করাতে কাটা বলেই মনে হলো।'

পরস্পরের দিকে তাকাল মুসা আর রবিন। সাধারণত কোন ব্যাপারে ভুল করে না কিশোর পাশা, ভুল যে করেনি জোরগলায় বলেও সেটা; সে জন্যেই এত সহজে ভুল স্বীকার করাটা বিস্মিত করেছে দু-জনকে।

ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'যা হবার তো হয়েছে, চলো যাই।'

'কোথায়?' জানতে চাইল মুসা। 'ওই সিঁড়িটা দিয়ে উঠে চলে যাব?' দূরের সিঁড়িটা দেখাল সে।

'না। অঘটন যা ঘটার তো ঘটেই গেছে। এখন আর ফিরে যাব কেন? যে কাজে এসেছি, সে কাজ সারব। সৈকতে, গুহায় ড্রাগনটার চিহ্ন খুঁজব।'

মনে মনে খুশি হলো কিশোর, তবে সেটা প্রকাশ করল না। সাগরের দিকে হাঁটতে শুরু করল। বলল, 'পানির ধার থেকে শুরু করব। কারণ, সাগর থেকে

উঠে ড্রাগনটাকে গুহায় ঢুকতে দেখা গেছে।'
মাটিতে বসল একটা পাখি। সেটা দেখিয়ে মুসা বলল, 'চলো না, ওকে জিজ্ঞেস করি, ড্রাগন দেখেছে কিনা? অনেক কষ্ট বাঁচবে তাহলে আমাদের।'
'ভাল বলেছ,' মুসার রসিকতায় হাসল রবিন। 'ও না বললে ওই টাগবোটের মাঝিদেরকে জিজ্ঞেস করব।'
মাইলখানেক দূরে একটা বার্জকে টেনে নিয়ে চলেছে একটা টাগবোট, স্যালভিজ রিগ—জাহাজ কোন দুর্ঘটনায় পড়লে উদ্ধার করা ওগুলোর কাজ।
'তাড়াহুড়ো আছে বলে তো মনে হচ্ছে না,' মুসা বলল। 'দেখছ না কি রকম ধীরে ধীরে চলছে। ড্রাগন শিকারে বেরিয়েছে কিনা কে জানে। হাহ্ হাহ্।'
টিটকারিতে কান দিল না কিশোর। গুহা আর পানির সঙ্গে একটা কল্পিত সরলরেখা বরাবর দৃষ্টি, একবার এপাশে তাকাচ্ছে, একবার ওপাশে। কি যেন বোঝার চেষ্টা করছে। অবশেষে বলল, 'এই এলাকায়ই কোথাও ড্রাগনের পায়ের ছাপ মিলবে। এক সঙ্গে না থেকে ছড়িয়ে পড়ো।'
আলাদা আলাদা হয়ে তিনদিকে ছড়িয়ে হাঁটতে লাগল ওরা। নিচে বালির দিকে চোখ। ড্রাগনের চিহ্ন খুঁজছে।
'কি আর দেখব?' একসময় বলল রবিন। 'খালি আগাছা।'
'আমিও তাই বলি,' মুসা বলল। 'তবে কিছু শামুক আর ভেসে আসা কাঠ আছে। ড্রাগনের এ সব পছন্দ কিনা বুঝতে পারছি না।'
খানিকক্ষণ পর পর মাথা নাড়ল রবিন। 'কিচ্ছু নেই। কিশোর, জোয়ারের পানিতে মুছে যায়নি তো?'
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। আনমনে বলল, 'হয়তো এখানে, পানির ধারে···না না, ওখানে···শুকনো বালি···গুহামুখ পর্যন্ত রয়েছে। থাকলে ওখানে থাকবে।'
'ধরো,' মুসা বলল, 'ড্রাগনটা গুহায় বসে আছে। কি করব আমরা তাহলে? লড়াই করব ওর সঙ্গে? খালি হাতে? আদ্দিকালের রাজকুমারদের কাছে তো তবু জাদুর তলোয়ার থাকত···'
'কারও সঙ্গে লড়াই করতে আসিনি আমরা, মুসা,' গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর। 'সাবধানে গুহার মুখের কাছে এগিয়ে যাব। ভেতরে বিপদ নেই এটা বুঝলেই কেবল গুহায় ঢুকব।'
ভ্রূকুটি করল মুসা। নিচু হয়ে একটা কাঠ তুলে নিয়ে বলল, 'যত যা-ই বলো, খালি হাতে ঢুকতে আমি রাজি না। মরি আর বাঁচি, একখান বাড়ি তো মারতে পারব।'
হেসে ফেলল কিশোর।
রবিন আরেকটা কাঠ তুলে নিল। নৌকার একটা দাঁড়, আধখানা ভেঙে গেছে। 'ঠিকই বলেছে মুসা। সেইন্ট জর্জ অ্যাণ্ড দা ড্রাগন ছবিটা দেখেছি। তলোয়ার দিয়ে কি ভাবে ড্রাগনকে খোঁচা মেরেছে মনে আছে। আমরা অবশ্য খোঁচা মারতে পারব না, তবে দু-জনে মিলে পেটালে ভড়কে গিয়ে পালিয়েও যেতে পারে। পুরানো

আমলের জন্তু তো, নতুন আমলের মানুষকে ভয় না পেয়েই যায় না।'

কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'তুমি কিছু নিলে না? ভাঙা রেলিঙটা এনে দেব? বড় বড় পেরেক বসানো আছে মাথায়, দেখেছি, চোখা কাঁটা বেরিয়ে আছে। ড্রাগনকে আঁচড়ে দিতে পারবে।'

হেসে বলল কিশোর, 'তা মন্দ বলোনি। হাতে করে একটা লাঠিটাটি নিয়েই নাহয় গেলাম। রেলিঙের দরকার নেই।' লম্বা ভেজা একটা তক্তা তুলে নিয়ে কাঁধে ফেলল সে, যেন তলোয়ার নিয়ে চলেছে গর্বিত রাজকুমার। তারপর হাঁটতে শুরু করল বন্ধুদের পাশে পাশে।

গুহামুখের দিকে এগিয়ে চলেছে তিন ড্রাগন-শিকারী। মুখে যতই বড় বড় কথা বলুক, গুহাটার কাছাকাছি এসে কিশোরের বুকের ধুপপুকানিও বাড়ল।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সে। শুকনো বালির দিকে আঙুল তুলে বলল, 'দেখো দেখো!'

মুসা আর রবিনও দেখল। নরম বালি বসে গেছে এক জায়গায়, গভীর দাগ।

'নতুন প্রজাতির ড্রাগন নাকিরে বাবা?' নিচু কণ্ঠে বলল রবিন। 'পায়ের ছাপ তো নয়, যেন ঘোড়া গাড়ির চাকা।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। তারপর তাকাল পানির দিকে, দু-দিকের সৈকতও দেখল। 'কোন গাড়ি-টাড়ি তো দেখছি না। তবে চাকার দাগ যে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বীচ-বাগি হতে পারে, লাইফ-গার্ডদের। পেট্রলে এসেছিল এদিকে।'

'হয়তো,' মেনে নিতে পারছে না রবিন। 'কিন্তু তাই যদি হবে, তাহলে তো চাকার দাগ পড়বে উত্তর-দক্ষিণে, সৈকতের একদিক থেকে আরেক দিকে। অথচ এটা গেছে গুহার দিকে।'

'কারেক্ট,' আঙুলে চুটকি বাজাল কিশোর। 'বুদ্ধি খুলছে।' হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল দাগ পরীক্ষা করার জন্যে।

পানির দিকে ফিরল রবিন। 'পানির কাছে গিয়ে দেখে এলে কেমন হয়?'

'ওখানে বোধহয় পাবে না,' কিশোর বলল। 'ঢেউয়ের জোর বেশি, জোয়ারের পানিতে মুছে গিয়ে থাকতে পারে।'

মুসা বলল, 'মিস্টার জোনসের বুড়ো চোখের ওপর ভরসা করা যাচ্ছে না আর। কি দেখতে কি দেখেছেন, কে জানে। জীপের সার্চলাইটকেই হয়তো ড্রাগনের চোখ ভেবেছেন, ইঞ্জিনের শব্দকে ড্রাগনের গর্জন।'

'তা-ও হতে পারে। তবে আগে থেকেই এত অনুমান করে লাভ নেই। গুহায় ঢুকে ভালমত দেখা দরকার।'

গুহামুখের গজ দশেক দূরে হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেল দাগ। সামান্যতম চিহ্নও নেই আর।

একে অন্যের দিকে তাকাল ছেলেরা।

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করল মুসা।

গুহামুখে পৌঁছে ভেতরে উঁকি দিল ওরা। শূন্য মনে হচ্ছে।

'ড্রাগন তো ড্রাগন,' আস্ত বাস ঢুকে যেতে পারবে এই মুখ দিয়ে,' ওপর দিকে

চেয়ে বলল রবিন। 'দেখি ভেতরে ঢুকে, কত বড় সুড়ঙ্গ?'

'যাও,' কিশোর বলল। 'তবে কাছাকাছি থেকো, ডাকলে যাতে শুনতে পাও। আমি আর মুসা আশপাশটা ভালমত দেখে আসছি।'

দাঁড়টা বল্লমের মত বাগিয়ে ধরে ভেতরে ঢুকে গেল রবিন।

'হঠাৎ এত সাহসী হয়ে উঠল কিভাবে?' মুসা বলল।

'ওই যে,' হেসে বলল কিশোর, 'মানুষের তৈরি চাকা দেখলাম। তাতেই অনেকখানি দূর হয়ে গেছে ড্রাগনের ভয়।'

কান খাড়া করল সে। 'দেখি তো ডেকে, রবিনের সাড়া আসে কিনা। ওর কথার প্রতিধ্বনি শুনলেই আন্দাজ করতে পারব, গুহাটা কত বড়।' চেঁচিয়ে ডাকল, 'রবিন? কি দেখছ?'

মুসাও কান খাড়া করে ফেলেছে।

শব্দটা শুনতে পেল দু-জনেই। বিচিত্র একটা শব্দ, কিসের বোঝা গেল না।

পরক্ষণেই ভেসে এল রবিনের চিৎকার, তীক্ষ্ণ, আতঙ্কিত। তারপর একটি মাত্র শব্দঃ *বাঁচাও!*

সাত

চোখ বড় বড় করে আবছা অন্ধকার গুহার ভেতরে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর আর মুসা, কি করবে বুঝতে পারছে না। এই সময় আবার শোনা গেল রবিনের চিৎকার।

'বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও!'

'বিপদে পড়েছে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'এসো।' ছুটে সুড়ঙ্গের ভেতরে ঢুকে গেল সে।

তাকে অনুসরণ করতে কষ্ট হচ্ছে কিশোরের। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আরেকটু আস্তে, মুসা। ও বেশি দূরে নয়, হুঁশিয়ার থাকা দরকার···'

কথা শেষ করতে পারল না কিশোর, মুসার গায়ে এসে পড়ল। বাড়ি খেয়ে হুঁক করে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল তার ফুসফুস থেকে। পড়তে পড়তে কোনমতে সামলে নিল।

কানে এল মুসার গলা, 'সরো কিশোর, সরে যাও! ও এখানেই!'

'কোথায়? কই, আমি তো কিছুই দেখছি না।'

চোখ মিটমিট করল কিশোর। চোখে সয়ে এল আবছা আলো। তার সামনেই চার হাত-পায়ে ভর রেখে উপুড় হয়ে রয়েছে মুসা।

'আরেকটু হলেই গেছিলাম গর্তে পড়ে,' বলল সে। 'রবিন ওতেই পড়েছে।'

'কই?' মুসার কাঁধের ওপর দিয়ে দেখার চেষ্টা করল কিশোর। 'রবিন, কোথায় তুমি?'

এত কাছে থেকে শোনা গেল রবিনের কণ্ঠ, চমকে উঠল কিশোর। 'এই যে, এখানে! চটচটে কিছু! খালি নিচে টানছে!'

'ইয়াল্লা!' চিৎকার করে বলল মুসা। 'চোরাকাদা!'

'অসম্ভব!' এই জরুরী মুহূর্তেও যুক্তির বাইরে গেল না গোয়েন্দাপ্রধান। 'সাধারণত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চল ছাড়া চোরাকাদা দেখা যায় না।' মুসার পাশ দিয়ে ঘুরে এসে কিনারে বসল, সাবধানে হাত নামিয়ে দিল নিচে। 'কই, দেখছি তো না। রবিন, আমাদের দেখছ?'

'হ্যাঁ! এই তো, তোমাদের নিচেই।'

নিচু হয়ে হাত আরেকটু নামাল কিশোর। 'আমি দেখছি না। রবিন, ধরো, আমার হাতটা ধরো। আমি আর মুসা টেনে তুলব।'

নিচে আঠাল তরলে নড়াচড়ার ফলে চপ চপ শব্দ হলো। 'পারছি না।...নড়লেই ডুবে যাচ্ছি আরও। নাগাল পাচ্ছি না।'

'হাতের ডাণ্ডাটা আছে তোমার?' মুসা জিজ্ঞেস করল। 'ওই দাঁড়ভাঙাটা। থাকলে...'

'নেই!' প্রায় ককিয়ে উঠল রবিন। 'পড়ে গেছে!'

নিজের হাতের কাঠটায় মুঠোর চাপ শক্ত হলো মুসার। 'আমারটাও এত শক্ত না। ভার সইবে না, ভেঙে যাবে।' গোঙানির মত একটা শব্দ করল সে।

শুঁয়াপোকার মত কিলবিল করে গর্তের ধারে হামাগুড়ি দিতে শুরু করল কিশোর। 'রবিন, চুপ করে থাকো, নোড়ো না। গর্তটা কত বড়, বুঝে নিই।'

'জলদি করো।' কেঁদেই ফেলবে যেন রবিন। 'তোলো আমাকে। গর্ত মাপার সময় নয় এটা।'

খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছে কিশোর। 'মাপতেই হবে। এ ছাড়া তোমাকে তুলে আনার আর কোন উপায় দেখছি না।'

অন্ধকারে খুব সাবধানে গর্তটার চার ধারে ঘুরল কিশোর, হুঁশিয়ার থাকা সত্ত্বেও কিনারের মাটি ভেঙে ঝুরঝুর করে পড়ল ভেতরে। 'আরে করছ কি!' নিচ থেকে চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'ভূমিধস নামাবে নাকি?'

'সরি। কিনারে আলগা মাটি, হাত লাগলেই পড়ে যাচ্ছে।'

মুসার গায়ে হাত পড়তেই বুঝল কিশোর, গর্ত ঘোরা শেষ হয়েছে। থামল। 'মুসা মনে হয় পারব। রবিন, তোমার পা-কি তলায় ঠেকেছে? বুঝতে পারছ কিছু?'

আরেকবার চপচপ করে উঠল আঠাল তরল। 'না,' তিক্ত শোনাল রবিনের কণ্ঠ। 'একটু নড়াচড়ায়ই আরও অনেকখানি তলিয়ে গেছি। দোহাই তোমাদের, কিছু একটা করো! তোলো আমাকে! তোমার হিসেবনিকেশটা পরে কোরো, কিশোর!'

মুসা বলল, 'কিশোর, আমার পা শক্ত করে ধরতে পারবে? আমি গর্তের ভেতর পেট পর্যন্ত ঢোকাতে পারলেই ওকে তুলে আনতে পারব।'

মাথা নাড়ল কিশোর, অন্ধকারে মুসা সেটা দেখতে পেল না। 'আমার কাঠটা ব্যবহার করতে পারি,' কিশোর বলল। 'টেনে তোলা যাবে না। গর্তের কিনারে আলগা নরম বালি, ভার রাখতে পারবে না, চাপাচাপি করলে দেবে যাবে। তবে, কাঠটা আড়াআড়ি গর্তের ওপর রাখা যায়, দু-মাথা গর্তের কিনারে মোটামুটি ভালই আটকাবে।'

'তাতে লাভটা কি? রবিন তো নাগাল পাবে না।

'মনে হয় পারবে, যদি কোণাকুণি ঢুকিয়ে দিই। কি করব, বুঝতে পারছ তো? একমাথা গর্তের ভেতরে কোণাকুণি ঢুকিয়ে ঠেসে ঢোকাব দেয়ালে। নরম মাটিতে ঢুকে যাবে সহজেই। আরেক মাথা থাকবে ওপরে, কিনারে শক্ত করে চেপে ধরব। সিঁড়ি তৈরি হয়ে যাবে···।'

'ঠিক বলেছ! জলদি করো, জলদি···।'

বেশি আশা করতে পারল না কিশোর, 'পাতলা কাঠ। ভার সইতে পারলে হয়। তবু, দেখা যাক চেষ্টা করে।···রবিন, তোমার মাথার কাছে দেয়ালে ঢোকানোর চেষ্টা করছি। খুব সাবধানে উঠবে। পিছলালে কিন্তু মরবে। কাঠটা ভেঙে গেলেও···খুব সাবধান।'

'জলদি করো! আরও ডুবেছি!' গলা কাঁপছে রবিনের।

দ্রুত গর্তের অন্য ধারে চলে এল কিশোর, মুসা যেখানে রয়েছে তার উল্টো দিকে। লম্বা হয়ে শুয়ে কাঠটা ঠেলে দিল গর্তের ভেতরে। আস্তে আস্তে, এক ফুট এক ফুট করে।

হঠাৎ নিচ থেকে রবিনের চিৎকার শোনা গেল, 'আরেকটু, আরেকটু ঠেলে দাও, ধরতে পারছি না।'

আরও কয়েক ইঞ্চি ঠেলে দিল কিশোর।

'আরও একটু,' নিচে থেকে বলল রবিন। 'এই আর কয়েক ইঞ্চি।'

কাঠটা আরেকটু আসার অপেক্ষা করছে রবিন।। এল না। তার বদলে শুনল ওপরে কিশোরের চাপা গলা, অস্ফুট একটা শব্দ। 'কি হলো, কিশোর?'

'কাঠের ভারে পিছলে যাচ্ছি, ব্যালান্স রাখতে পারছি না। কাঠ না ছাড়লে আমিও পড়ব গর্তে। সাংঘাতিক নরম বালি···'

আর কিছু শোনার অপেক্ষা করল না মুসা। লাফিয়ে উঠে বিপজ্জনক কিনার ধরে প্রায় ছুটে চলে এল কিশোরের কাছে। ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। উপুড় হয়ে শুয়ে কিশোরের পা ধরে টেনে সরিয়ে আনল খানিকটা। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এবার পারবে?'

'থ্যাংক ইউ,' কিশোরের কণ্ঠও কাঁপছে। 'পা ছেড়ো না। কাঠটা আবার ঢোকাচ্ছি আমি। বড় বাঁচা বেঁচেছি। আরেকটু হলেই আমিও গিয়েছিলাম···' কাঠটা আবার ঠেলে দিল সে। গর্তের দেয়ালে ঠেকতেই হ্যাঁচকা ঠেলা দিয়ে ঢুকিয়ে দিল কয়েক ইঞ্চি। জোরে জোরে শ্বাস নিল কয়েকবার।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কি হলো, পারছ না?'

'হ্যাঁ, দেয়ালে ঠেকেছে।'

'আমি ধরে আছি, ছাড়ব না। তুমি ঠেলো।'

জোরে জোরে কয়েকটা হ্যাঁচকা ঠেলা দিয়ে কাঠের মাথা অনেকখানি গর্তের দেয়ালে ঢুকিয়ে দিল কিশোর। ডেকে বলল, 'রবিন, দেখো এবার। ঝুলে ঝুলে আসবে, আস্তে আস্তে হাত সরাবে, একটুও তাড়াহুড়ো করবে না।' কাঠ ভাঙলে সর্বনাশ?'

কাঠের মৃদু কড়মড় প্রতিবাদ শুনেই বোঝা গেল উঠে আসছে রবিন। কতক্ষণ

সইতে পারবে কে জানে।

'আসছে, না?' জানতে চাইল মুসা।

'হ্যাঁ,' বলল কিশোর। 'পা ছেড়ো না আমার। কখন কি হয় বোঝা যাচ্ছে না।' গর্তের ভেতরে হাত আর মাথা ঢুকিয়ে দিল সে, বিপজ্জনক ভঙ্গিতে ঝুলে পড়ল, রবিন নাগালের মধ্যে এলেই যাতে টেনে তুলতে পারে।'

গুঙিয়ে উঠল রবিন। 'কিশোর, আর পারছি না! ইস্, এত পিছলা! খালি হাত পিছলে যায়!'

'আমার হাত দেখতে পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর?

'পাচ্ছি। আর তিন-চার ফুট উঠতে পারলেই ধরতে পারব। কিন্তু পারছি না তো।'

'চুপ! তাড়াহুড়ো কোরো না।' জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে কিশোর। আনমনে বলল, 'ইস, একটা দড়ি যদি পেতাম।'

'দড়ি পাবে কোথায়?' পেছন থেকে বলল মুসা।

'কিশোর, আর পারছি না!' নিচে থেকে ককিয়ে উঠল রবিন। 'হাত ছিঁড়ে যাচ্ছে!'

'আরেকটু ধরে থাকো। মুসা, আরও শক্ত করে ধরো।'

অনেক কায়দা কসরত করে কোমর থেকে বেল্টটা খুলে ফেলল কিশোর। বাকলসের ভেতর চামড়ার ফালিটা ঢুকিয়ে ছোট একটা ফাঁস বানাল। তারপর মাথা ধরে ঝুলিয়ে দিল নিচে। 'রবিন, দেখতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, পাচ্ছি!'

'ফাঁসের মধ্যে হাত ঢোকাও।'

আস্তে করে কাঠ থেকে একটা হাত সরিয়ে ফাঁসের মধ্যে ঢোকাল রবিন। আরেক হাতে অনেক কষ্টে ঝুলে রইল। পিছলে সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

টান দিয়ে তার হাতে ফাঁসটা আটকে দিল কিশোর। 'মুসা, টানো। টেনে টেনে পেছনে সরাও আমাকে।'

'ব্যথা পাবে তো।'

'আরে রাখো তোমার ব্যথা। টানো।'

টানতে শুরু করল মুসা। দু-হাতে বেল্টের একমাথা ধরে রেখেছে কিশোর। ঘামে ভিজে পিছল হয়ে গেছে হাতের তালু, বেল্টটা না ছুটলেই হয় এখন।

অবশেষে গর্তের বাইরে বেরিয়ে এল রবিনের হাত। মাথা বেরোল। উঠে এল সে।

থামল না মুসা। টেনে আরও সরিয়ে আনল কিশোরকে, সেই সঙ্গে রবিনকে। যখন বুঝল আর ভয় নেই, কিশোরের পা ছেড়ে দিয়ে ধপ করে বসে পড়ল। 'আরিব্বাপরে, কি একখান টাগ অভ ওয়ার গেল!'

হাঁপাচ্ছে কিশোর আর রবিন, ঘড়ঘড় শব্দ বেরোচ্ছে গলা থেকে।

রবিনের গায়ে হাত রাখল কিশোর, 'ইস, এত পিছলা। কাদায় গড়িয়ে ওঠা শুয়োরও তো এত পিচ্ছিল না।'

তিনজনেই হাসল।

আট

বন্ধুদেরকে বার বার ধন্যবাদ জানাল রবিন। মুখের কাদা মুছে বলল, 'কিশোর, ঠিকই বলো তুমি, বিপদে মাথা গরম করতে নেই। তোমার ঠাণ্ডা মাথাই আজ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে।'

'সব ভাল যার শেষ ভাল,' মুসা বলল। 'তো, এখন কি করব?'

'বাড়ি ফিরব,' সঙ্গে সঙ্গে বলল কিশোর। 'গোসল করে কাপড় বদলানো দরকার, বিশেষ করে রবিনের। নিশ্চয় খুব অসুবিধে হচ্ছে ওর। সব দোষ আমার। টর্চ না নিয়ে অন্ধকারে গুহা দেখতে এসেছি, গর্দভের মত কাজ করেছি।'

'আমারই দোষ,' রবিন বলল। 'তুমি তো হুঁশিয়ার থাকতে বলেইছিলে। আমি গাধার মত ছুটে গিয়ে পড়েছি গুহায়। এত তাড়াহুড়ো না করলেই তো পড়তাম না।'

উঠে দাঁড়াল কিশোর। চিন্তিত কণ্ঠে বলল, 'গুহামুখের অত কাছে এমন একটা গর্ত, কৌতূহলী লোককে ঠেকানোর ভালই ব্যবস্থা! দূরে সরিয়ে রাখবে!'

'খাইছে!' হঠাৎ কি মনে পড়ে যাওয়ায় বলে উঠল মুসা, 'হয়তো কুত্তাগুলো সব গিয়ে পড়েছে ওই গর্তে, চোরাকাদায় ডুবে মরেছে।'

কিশোর বলল, 'হতে পারে। কিন্তু ঢোকার আগেই ভালমত দেখেছি আমি। কুকুরের পায়ের ছাপ তো চোখে পড়ল না।'

'হুঁ! যাকগে, ওসব পরে ভাবা যাবে। চলো, বেরোই। জায়গাটা মোটেও পছন্দ হচ্ছে না আমার। ভয় ভয় করছে।'

তিনজনেই একমত হলো এ-ব্যাপারে।

গর্তের কাছ থেকে সরে এল ওরা।

তখন উত্তেজনা আর তাড়াহুড়োয় খেয়াল করেনি কিশোর, এখন দেখল, গুহামুখের উল্টো দিকে বড় বড় পাথরের চাঁই। আরেকটা সুড়ঙ্গমুখ দেখা যাচ্ছে। 'কদ্দূর গেছে কে জানে,' আপনমনে বিড়বিড় করল সে। 'চোর-ডাকাত আর চোরাচালানীর আখড়া ছিল তো শুনলাম।'

'সে-তো ছিলোই,' জোর দিয়ে বলল মুসা। 'কিন্তু তাতে কি?'

'দেখে কিন্তু সে রকম মনে হয় না। এতবেশি খোলামেলা, ঢোকা আর বেরোনো খুব সহজ, একটু সাবধানে চললেই বিপদ এড়ানো সম্ভব।'

'আরও সুড়ঙ্গ-টুড়ঙ্গ আছে হয়তো,' রবিন বলল। 'নরম মাটিকে ক্ষয় করে ফেলে পানির স্রোত, ধুয়ে নিয়ে যায়, অনেক সুড়ঙ্গ তৈরি হয়। তবে তাতে সময় লাগে, অনেক ক্ষেত্রে লাখ লাখ বছর। মনে হচ্ছে, অনেক আগে এই জায়গাটাও পানির তলায় ছিল। যদি তাই হয়, আরও অনেক সুড়ঙ্গ আছে এখানে।'

'হয়তো,' স্বীকার করল কিশোর। 'তবে সেগুলো খুঁজতে পারব না এখন। বাড়ি যাওয়া দরকার।'

'হ্যাঁ, সেই ভাল,' মুসা বলল।

গুহামুখের কাছে চলে এসেছে, সাগরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। তার গায়ের ওপর এসে পড়ল অন্য দু-জন।

'কি হলো?' মুসার প্রশ্ন।

নীরবে হাত তুলে দেখাল কিশোর।

তার পাশে দাঁড়িয়ে অন্য দু-জনও তাকাল। চোখ মিটমিট করল।

হাত দিয়ে চোখ ডলে আবার তাকাল মুসা। বিশ্বাস করতে পারছে না।

'ইয়াল্লা!' বিড়বিড় করল সে।

কালো, চকচকে কিছু একটা মাথা তুলছে পানির ওপরে।

'কি ওটা!' ফিসফিস করল রবিন।

কম্পিত কণ্ঠে মুসা বলল, 'ড্রাগনের মাথার মতই তো লাগছে!'

গড়িয়ে এল মস্ত এক ঢেউ, ঢেকে দিল কালো জিনিসটা।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেরা। চোখ সরাচ্ছে না।

প্রচণ্ড শব্দে সৈকতে আছড়ে পড়ে ভাঙল বড় ঢেউটা। তার পেছনে এল আরেকটা ছোট ঢেউ, ওটাও ভাঙল, সাদা ফেনার নাচানাচি চলল কয়েক মুহূর্ত, তারপর সরতে শুরু করল পানি।

ঢেউ সরে যেতেই আবার দেখা গেল কালো জীবটা। নড়ছে। সাগর থেকে উঠে এল টলোমলো পায়ে।

'স্কিন ডাইভার,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'ফেস মাস্ক···ফ্লিপার···অথচ কি ভয়ই না পেলাম। চলো, আমাদের পথে আমরা যাই।'

ঘুরতে গিয়েও দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। ফিসফিসিয়ে বলল, 'সাবধান! ওর হাতে স্পীয়ারগান!'

হেসে উঠল সহকারী গোয়েন্দা। 'তাতে কি? মাছ মারতে নেমেছিল হয়তো সাগরে।'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'এদিকে আসছে দেখছ না?'

হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসল ডুবুরি। স্পীয়ারগান তুলল।

'আরে!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'আমাদেরকেই তাক করছে!'

'অ্যাঁ!' চমকে গেল মুসা। 'কেন···' দ্রুত চোখ বোলাল আশেপাশে। 'কিশোর, রবিন ঠিকই বলেছে! আর কেউ নেই, আমাদেরকেই নিশানা করছে!'

একশো গজ দূরে রয়েছে লোকটা।

'দৌড় দাও!' চেঁচিয়ে বলল কিশোর। 'একেকজন একেকদিকে।'

কিন্তু দেখা গেল, একদিকেই দৌড় দিয়েছে তিনজন, ওপরে ওঠার কাঠের সিঁড়ির দিকে। কাছে যাওয়ার আগে মনেই পড়ল না, ওটা ভাঙা। ওরাই ভেঙেছে খানিক আগে। পেছনে পাগাড়ের খাড়া পাড়, বেয়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব।

আরেকটা সিঁড়ি যেটা আছে, ওটার দিকে তাকাল কিশোর। অনেক দূরে। নরম বালির ওপর দিয়ে তাড়াতাড়ি দৌড়াতে পারবে না, সিঁড়ির কাছে যাওয়ার আগেই স্পীয়ারগান থেকে ছোঁড়া বর্শা বিঁধবে শরীরে। খোলা সৈকতে খুব সহজ টার্গেট

হয়ে যাবে ওরা।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল কিশোর। 'একটাই উপায় আছে। আবার গুহায় ঢুকতে হবে। কুইক!'

ঘুরে আবার গুহামুখের দিকে দৌড় দিল ওরা। ফিরে তাকানোর সাহস নেই। ভাবছে, এই বুঝি এসে পিঠে বিঁধল চোখা ইস্পাত।

আলগা নরম বালি, জুতোর ঘায়ে ছিটকে যাচ্ছে।

'ডাইভ দাও!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর।

গুহামুখের ভেতরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল তিনজনে। হামাগুড়ি দিয়ে সরে গেল একটা বড় পাথরের আড়ালে।

'ওফ,' মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়ল মুসা। 'বাঁচলাম!...এবার?'

'লুকাতে হবে,' জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে কিশোর। 'বাঁচিনি এখনও। খানিকটা সময় পেয়েছি মাত্র।'

'কোথায় লুকাব?' রবিন বলল। 'ভেতরে আরও সুড়ঙ্গ নাকি আছে? চলো, খুঁজে বের করি। ওগুলোর কোনটাতেই ঢুকব।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'তাই বোধহয় করতে হবে। তবে এখুনি নড়ছি না। লোকটা আসুক আগে। তেমন বুঝলে পাহাড়ের একেবারে ভেতরে ঢুকে যাব।'

কিশোরের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। 'এখুনি সরতে হবে। আসছে।'

'যাব কোন দিক দিয়ে?' রবিন বলল। 'আবার গিয়ে ওই গর্তে পড়তে চাই না, কাদার মধ্যে।'

গুহার দেয়ালের কাছে পিছিয়ে গেল কিশোর। হঠাৎ ডাকল, 'এই দেখে যাও।' মেঝে থেকে ছাতের কাছে খাড়া উঠে গেছে কয়েকটা তক্তা।

'খাইছে,' মুসা বলল। 'তখন দেখলাম না কেন?'

'ধুলোবালিতে কেমন ঢেকে আছে দেখছ না? সহজে চোখে পড়ে না।' তক্তায় থাবা দিল কিশোর, ফাঁপা শব্দ হলো। 'গোপন পথ-টথ আছে। মনে হয় খোলা যাবে। মুসা, চট করে দেখে এসো তো ও আসছে কিনা?'

গিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল মুসা। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'ভাল বিপদে পড়েছি! একজন না, দু-জন আসছে!'

'দু-জন? জলদি এসো, হাত লাগাও।'

তক্তার ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে ধরে জোরে জোরে টানতে শুরু করল ওরা।

'এভাবে হবে না,' রবিন বলল। ওপরে-নিচে শক্ত করে গেঁথে দিয়েছে।'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'নিশ্চয় হবে।' পায়ের কাছে মাটিতে জুতোর ডগা দিয়ে খোঁচা দিয়ে দেখল মাটি আলগা। বসে পড়ে দু-হাতে খুঁড়তে শুরু করল তক্তার গোড়ার কাছে।

অন্য দু-জনও হাত লাগাল।

কিছুটা খুঁড়ে টান দিতেই নড়ে উঠল তক্তা।

'এই তো হয়েছে,' বলল কিশোর। 'এটাই তো সব চেয়ে চওড়া নাকি?...হ্যাঁ,

সরালে ভেতরে ঢোকা যাবে…' মাথা ঢুকিয়ে দিল সে, কিন্তু কাঁধ ঢোকাতে পারল না, চাড় দিয়েও কাজ হলো না।

আরও খানিকটা মাটি সরাল মুসা আর রবিন। টান দিয়ে আরও ফাঁক করল তক্তা, হ্যাঁ, এবার ঢোকা যায়।

ঢুকে গেল কিশোর। পেছনে দুই সহকারী। তারপর আবার টেনে আগের জায়গায় লাগিয়ে দিল তক্তা।

অন্ধকার গুহায় বসে কান পেতে রয়েছে ওরা।

ওপাশে কথা শোনা গেল। তক্তার ফাঁক দিয়ে টর্চের আলো দেখল।

'নিক,' বলল একজন, 'ওরা এখানেই ঢুকেছে, আমি শিওর। তুমি পড়ে গেলে, আমিও চোখ সরালাম। নইলে ঠিকই দেখতে পেতাম। ঢুকেছে এখানেই। বাতাসে তো আর মিলিয়ে যেতে পারে না।'

'এখানে থাকলে যাবে কোথায়?' বলল অন্যজন। 'বের করে ফেলব। আর না থাকলে তো নেইই। আমাদের কাজ শুরু করব।'

নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল তিন গোয়েন্দা।

গুহার ভেতরে আলো ফেলে ফেলে দেখছে লোকটা।

তক্তার ফাঁকে চোখ রেখে দেখছে কিশোর। তার ওপর ঝুঁকে রয়েছে রবিন আর মুসা, ওরাও দেখছে।

দু-জনের পরনেই কালো ওয়েট স্যুট, পানির নিচ থেকে উঠে এসেছে। আলো ফেলে গুহার চারপাশটা একবার দেখে অন্য দিকে চলে গেল। ফ্লিপার পরা পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল, হারিয়ে গেল আলো।

দ্বিতীয় লোকটা, অর্থাৎ নিকের খসখসে গলা শোনা গেল গর্তটার ধার থেকে, যেটাতে পড়েছিল রবিন, 'কই, জো? কোথায় ওরা? ভুল করেছ তুমি। এখানে ঢোকেনি।'

'আরেকটা সিঁড়ি যে আছে ওদিকে, ওটা বেয়ে উঠে গেল না তো?' অনিশ্চিত শোনাল জো-র কণ্ঠ।

'তা-ই গেছে হয়তো।'

টুলুপ টুলুপ করে মৃদু শব্দ হলো, তারপর নীরবতা। কিছুই আর কানে এল না কিশোরের, কিছু দেখছে না। ফাঁক থেকে চোখ সরিয়ে আনল সে। চোখের কোণে, নাকের ভেতরে কিচকিচ করছে বালি। সুড়সুড় করছে নাক। হাঁচি এলে এখন সর্বনাশ। তার সঙ্গীদেরও কি একই অবস্থা নাকি?'

মুসার বিশ্বাস নেই। অসময়ে হাঁচি দেয়ার জুড়ি নেই তার। বিপদ দেখলে কিংবা বেশি উত্তেজিত হলেই যেন সুড়সুড় করতে থাকে তার নাকটা। হুঁশিয়ার করল কিশোর, 'দেখো, হাঁচি দিও না। নাক ধরো।'

শুধু মুসাই নয়, রবিনও নাক টিপে ধরল। চুপ করে বসে আছে অন্ধকার গুহায়, অস্বস্তিতে ভুগছে।

কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'নেই মনে হচ্ছে। চলো, সময় থাকতে কেটে পড়ি।'

তক্তা সরিয়ে বেরোল ওরা। জায়গামত আবার তক্তাগুলো দাঁড় করিয়ে গোড়া বালি দিয়ে ঢেকে সমান করে দিল আগের মত।

'কিশোর, তুমি আগে বেরোও,' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'আমি আর রবিন পেছনে নজর রাখছি।'

নিঃশব্দে গুহামুখের কাছে চলে এল ওরা। খুব সাবধানে বাইরে উঁকি দিল কিশোর। নির্জন সৈকত। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। পিছিয়ে এসে বন্ধুদের বলল, 'কেউ নেই। এসো।'

নয়

'তারপর, কি বুঝলে?' প্রশ্ন করল কিশোর।

হেডকোয়ার্টারে বসেছে সে আর মুসা। ঘন্টাখানেক হলো ফিরে এসেছে রকি বীচে। রবিন বাড়ি গেছে। তার শরীর আর কাপড়চোপড়ের যা অবস্থা হয়েছে কাদায়, শুধু হাতমুখ ধুলে হবে না, গোসল দরকার।

ঠোঁট ওল্টাল মুসা। 'কিছুই বুঝতে পারছি না। ডুবুরীরা কারা, তা-ও জানি না; শুধু নাম জানি—নিক আর জো। স্পীয়ারগান তুলে আমাদের নিশানা করেছিল কেন, জানি না। জানি না কেন আমাদের পিছু নিয়ে এসে ঢুকেছিল গুহায়। তারপর কিভাবে খোকায় গায়েব হয়ে গেল, জানি না। এমনকি এ-ও জানি না, কি করে বেঁচে ফিরে এলাম আমরা।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ, আরও অনেক কিছুই জানি না। সিঁড়ি কে কেটে রাখল? কুকুর কিভাবে গায়েব হলো? কেউ কি চুরি করল ওগুলোকে? তাহলে কেন করল?' এই কেসের কিনারা করতে হলে এ-ধরনের অনেক *কেনর* জবাব জানতে হবে আমাদের।'

'এক কাজ করলে আর দরকার হবে না,' পরামর্শ দিল মুসা।

'উঁ!' রিভলভিং চেয়ার ঘুরিয়ে মুসার দিকে ফিরল কিশোর। চোখে জ্বলজ্বলে আগ্রহ। 'কি?'

ফোনটা দেখাল মুসা। 'ওটা তুলে ফোন করো মিস্টার জোনসকে। বলো, হারানো কুত্তা নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছি না আমরা। আরেকটু হলে আমরাই হারিয়ে যাচ্ছিলাম। বলে দাও, ড্রাগনের কথাও ভুলে যেতে রাজি আছি আমরা।'

নিরাশ হলো কিশোর। দপ করে নিভে গেল চোখের আলো। 'দুঃখিত। তোমার পরামর্শ মানতে পারছি না। এখন আমাদের প্রথম সমস্যা,' এক আঙুল তুলল সে, 'ডুবুরীরা কে, এবং গুহায় কি করছিল সেটা জানা?'

'ওদের নিয়ে এত মাথা ঘামানোর কি হলো? আমরাও তো গিয়েছিলাম গুহায়। কেন? সেটাই কি জানি?'

'মিস্টার জোনসের ড্রাগন দেখার সপক্ষে সূত্র খুঁজছিলাম,' মাঝে মাঝে কঠিন শব্দ ব্যবহার, কিংবা লম্বা বাক্য, কিংবা দুর্বোধ করে কথা বলা কিশোরের স্বভাব। 'এবং তাঁর আইরিশ সেটার কুকুর পাইরেটের সন্ধানে গিয়েছিলাম, রাতারাতি

হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যেটা।'

'এবং তাহাতে আমরা মোটেও কৃতকার্য হই নাই,' কিশোরের সুরে সুর মেলাল মুসা। 'অবশ্য কুয়া আবিষ্কারের ব্যাপারটা বাদ দিতে রাজি আমি, যদি ওটা কোন সূত্র হয়। এবং সে জন্যে রবিনের কাছে মহাকৃতজ্ঞ আমরা, নাকি?'

মুসার টিটকারি গায়েই মাখল না কিশোর। 'কিছু পাইনি, তাই বা বলি কিভাবে? তক্তার ওপাশে আরেকটা সুড়ঙ্গ পেয়েছি, হয়তো কোন গোপন গুহায় যাওয়ার পথ ওটা। হয়তো পুরানো আমলে দস্যু-তস্কররা হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করত ওটাকে।'

'তাতে আমাদের কি? কুত্তা লুকিয়ে রাখার জায়গা নিশ্চয় নয় ওটা?'

ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'একটা কথা ভুলে যাচ্ছ, মুসা আমান, আমরা গোয়েন্দা। সামান্যতম সূত্রকেও অবহেলা করলে চলবে না আমাদের। ওই গুহা আর সুড়ঙ্গগুলো আরও ভালমত দেখা দরকার, কি বলো?'

'তা-তো নিশ্চয়,' ভোঁতা গলায় বলল মুসা। 'তবে খামাকা যাবে। ওখানে কুত্তা পাওয়ার আশা নেই। লুকিয়ে রাখা হয়নি। আবল-তাবল ভাবনা হচ্ছে, অথচ অবাক হওয়ার মত যেটা ব্যাপার, সেটা নিয়েই ভাবছি না?'

'কী?' আবার আগ্রহে সামনে ঝুঁকল কিশোর।

'রবিন যে কুয়োটায় পড়েছিল, দুই ডুবুরী ওটাতে পড়ল না কেন? তারমানে এই নয় কি, ওরা গুহার ভেতরে কোথায় কি আছে জানে?'

দ্বিতীয়বার নিরাশ হতে হলো কিশোরকে। 'ভাবার কি দরকার। ওদের হাতে টর্চ ছিল, রবিনের কাছে ছিল না। আর ওরা কোথায় কিভাবে গায়েব হলো, টর্চ নিয়ে আমরা যখন যাব···'

ফোন বেজে উঠল।

যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে রইল দু-জনে।

আবার রিঙ হলো।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'তুলব?'

'আমি তুলছি,' রিসিভার তুলল কিশোর। স্পীকারের সঙ্গে যোগাযোগের সুইচ অন করে দিয়ে বলল, 'হ্যালো।'

জবাব নেই।

আবার বলল, 'হ্যালো?'

জবাব নেই।

'রঙ নাম্বার-টাম্বার হবে,' মন্তব্য করল মুসা।

'আমার মনে হয় না। জবাব তো দেবে···'

অদ্ভুত একটা শব্দ শোনা গেল স্পীকারে, ঘড়ঘড়ে, গলা টিপে ধরে ঠিকমত শ্বাস নিতে দেয়া হচ্ছে না যেন, অনেক কষ্টে দম টানছে বেচারা।

ধীরে ধীরে বদলে গেল ঘড়ঘড়ানি, কথা ফুটল। কোনমতে উচ্চারণ করল একটা মাত্র শব্দ, 'দূরে···!'

তারপর আবার শুরু হলো ঘড়ঘড়ানি। অনেক কষ্টে যেন গলা থেকে আঙুলের

চাপ সামান্য শিথিল করে আবার বলল, *'দূরে···দূরে থাকবে···!'* জোরে জোরে শ্বাস টানল।

'কি করে থাকব?' গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আমার···গুহা···,' আবার ঘড়ঘড়ানি, আগের চেয়ে বেড়েছে শ্বাসকষ্ট, মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়েছে বুঝি।

'কে বলছেন?' উত্তেজনায় রিসিভার-ধরা হাত কাঁপছে কিশোরের।

স্পীকারে ভেসে এল কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বর, যেন বহু দূর থেকে, *'মরা···মানুষ···! অনেক দিন আগে মরে যাওয়া একজন···গুহায় আটকে রেখে খুন করা হয়েছিল আমাকে····।'*

কাঁপা দীর্ঘ ঘড়ঘড়ানি, ফিসফাস হলো কিছুক্ষণ, তারপর নীরব হয়ে গেল।

আস্তে করে রিসিভার নামিয়ে রাখল কিশোর। দু-জনেই চেয়ে রইল যন্ত্রটার দিকে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল মুসা। 'আমি যাই। মা বলে দিয়েছে সকাল সকাল বাড়ি ফিরতে, জরুরী কাজ আছে। ভুলেই গেছিলাম।'

'যাবে?' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর।

'হ্যাঁ, যাই,' দুই সুড়ঙ্গের ঢাকনার দিকে এগোল মুসা। কিশোরকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে নেমে পড়ল সুড়ঙ্গে।

ভূতের ভয়ে পালাচ্ছে মুসা, বুঝল কিশোর। সে ভয় পায়নি, কিন্তু অবাক হয়েছে খুব। বিড়বিড় করল, 'দূরে থাকবে···আমার গুহা···'

মিস্টার জোনস বলেছিলেন, ড্রাগন দেখেছেন। সাগর থেকে উঠে দানবটাকে গুহায় ঢুকতে দেখেছেন। কিন্তু কই, কোন ভূতের কথা তো বলেননি?

একা একা বসে থাকতে ভাল লাগল না তার। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে-ও।

দশ

গোসল সেরে, কাপড় বদলে, হালকা খাবার খেয়ে অনেকটা ভাল বোধ হলো রবিনের। রকি বীচ পাবলিক লাইব্রেরিতে চলল, পার্ট টাইম চাকরিতে।

রবিনকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে তাকালেন লাইব্রেরিয়ান, হাসলেন। 'এই যে রবিন, এসেছ। খুব ভাল হয়েছে। সাংঘাতিক ভিড় আজ, কুলিয়ে উঠতে পারছি না। অনেক বই ফেরত এসেছে, রীডারও বেশি। ওই দেখো, কত বই নিচে জমে আছে। তাকে তুলে দেবে, প্লীজ?'

'এখুনি দিচ্ছি,' বলে বইয়ের স্তূপের দিকে এগোল রবিন।

ফেরত আসা বইগুলো এক এক করে তাকে সাজিয়ে রাখতে লাগল সে। সেগুলো তোলা শেষ করে চোখ ফেরাল রীডিং রুমের দিকে। টেবিলে অনেক বই জমে আছে। তুলতে শুরু করল। হঠাৎ একটা বইয়ের মলাটে দৃষ্টি আটকে গেল তার। নামটা নজর কেড়েছে:

লিজেণ্ডস অভ ক্যালিফোর্নিয়া

আনমনে বইটা হাতে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগল। দৃষ্টি আটকে গেল আবার বইয়ের একটা অধ্যায়ে:

সী-সাইড:
ড্রীম অভ আ সিটি দ্যাট ডাইড

'হুমম্,' আপন মনে মাথা দোলাল রবিন, 'ইনটারেসটিং!'

বইটা একপাশে সরিয়ে রাখল সে। বেশ ভাল একটা লেখা পেয়ে গেছে। পড়ার জন্যে আকুল হয়ে উঠল মন, কিন্তু আগে কাজ শেষ করতে হবে। তাড়াহুড়ো করে বই তুলতে লাগল।

বই তোলা শেষ হলে তাকে ডাকলেন লাইব্রেরিয়ান। কয়েকটা বইয়ের মলাট, পাতা ছিঁড়ে গেছে, আঠা দিয়ে ওগুলো জোড়া দিতে বললেন।

পেছনের একটা ঘরে সমস্ত সরঞ্জাম রয়েছে। বইগুলো তুলে নিয়ে সেখানে চলে এল রবিন। খুব দ্রুত হাত চালাল। কিন্তু কাজটা সহজ নয়, সময় লাগলই।

মেরামত সেরে সেগুলো নিয়ে আবার লাইব্রেরিয়ানের কাছে ফিরে এল সে। 'হয়ে গেছে। আর কিছু?'

হাসলেন লাইব্রেরিয়ান। 'খুব তাড়া আছে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, একটা বই পেয়েছি,' হেসে বলল রবিন।

'আর থাকতে পারছ না, না?' হাসিলেন লাইব্রেরিয়ান। 'নাহ্, আপাতত আর কিছু নেই। যাও, পড়োগে। দরকার হলে ডাকব।'

তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে পড়ার টেবিলে চলে এল রবিন।

অধ্যায়টা চিহ্ন দিয়েই রেখেছিল। খুলে পড়তে শুরু করল:

দুর্ভাগ্যের শিকারে পরিণত হয়, এমন অনেক শহর আছে। শহরের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর বাসিন্দাদের ভাগ্যেও নেমে আসে অমঙ্গল। সী-সাইডের অবস্থাও হয়েছে তাই। কী রিসোর্ট কমিউনিটি হওয়ার কথা ছিল ওটার, কিন্তু সে-স্বপ্ন নস্যাৎ হয়ে গেছে পঞ্চাশ বছর আগে।

ঝলমলে যে কর্মব্যস্ত শহরের কল্পনা করেছিল এর পরিকল্পনাকারীরা, তাদের সর্বস্ব বাজি ধরেছিল এর পেছনে, কার্যকর হয়নি। তারা কল্পনা করেছিল, ভেনিস নগরীর মত এটাতেও জালের মত বিছিয়ে থাকবে খাল আর প্রণালী। কিন্তু তাদের আশাকে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়ে গড়ে উঠল অসংখ্য কারখানা। একদা রমরমা হোটেলগুলোর কিছু পরিবর্তিত হয়ে গেল বোর্ডিং হাউসে, বাকিগুলো সব প্রাণ দিল বুলডোজারের কঠিন চোয়ালে—উত্তর-দক্ষিণে চলে যাওয়া সুবিশাল মহাসড়ককে জায়গা ছেড়ে দেয়ার জন্যে।

সী-সাইডের সব চেয়ে তিক্ত ঘটনা সম্ভবত এর ভূগর্ভ রেলওয়ে তৈরির ব্যর্থতা। পশ্চিম উপকূলে পাতাল-রেল ওটাই প্রথম তৈরি হওয়ার কথা ছিল। ব্যর্থতার একটা মূল কারণ, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিশেষ সাড়া মেলেনি। ফলে শুরুতেই থেমে গেল কর্মব্যস্ততা, কয়েক মাইল সুড়ঙ্গ তৈরি হলো বটে, কিন্তু ওই পর্যন্তই। পরিত্যক্ত হতে সময় লাগল না। ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ এখন ওটা।

এই অবস্থা! অবাক হলো রবিন। বইটা লেখা হয়েছে অনেক আগে, প্রায় পঞ্চাশ বছর। তারমানে সী-সাইড মারা গেছে তারও আগে, অর্থাৎ পঞ্চাশ বছরের বেশি। ভাগ্যিস পেয়ে গিয়েছিল টেবিলের ওপর, নইলে শহরটার এই করুণ ইতিহাস হয়তো জানা হতো না কোন দিনই।

কিছু কিছু পয়েন্ট নোটবুকে টুকে নিয়ে বইটা তাকে তুলে রাখল সে। তারপর বসে বসে ভাবতে লাগল। কিশোরকে বলার মত অনেক কিছু জেনেছে, কিন্তু সেগুলো উগরানোর জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। ছুটি হতে দেরি আছে।

সময় হলো। লাইব্রেরিয়ানকে 'গুডবাই' জানিয়ে বেরিয়ে এল রবিন। সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরল। মা রাতের খাবার সাজাচ্ছেন। বাবা খবরের কাগজ পড়ছেন, মুখে পাইপ। রবিনের সাড়া পেয়ে মুখ তুলে হাসলেন। 'এই যে, রবিন, কি হয়েছিল তোমার? এত কাদা লাগল কোত্থেকে? ওয়াশিং মেশিনটা তো বাপ বাপ ডাক ছাড়ল ধুতে গিয়ে।'

'গর্তে পড়েছিলাম, বাবা। প্রথমে ভেবেছিলাম চোরাকাদা। পরে বুঝলাম, সাধারণ কাদা। তবে সাংঘাতিক আঠা।'

'কোথায় সেটা?'

'সী-সাইডে গিয়েছিলাম কেসের তদন্ত করতে। একটা গুহায় ঢুকলাম। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। ঢুকেই পড়লাম গর্তের মধ্যে। চোরাকাদা ভেবে তো জানই উড়ে গিয়েছিল।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কাগজটা নামিয়ে রাখলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'হুঁ, জায়গাটা খারাপই। সব ছিল চোর-ডাকাতের আড্ডা। লোকে তো ঢোকারই সাহস পেত না। শুনেছি অনেকেই নাকি ঢুকে আর বেরোতে পারেনি।'

'আমিও শুনেছি। লাইব্রেরিতে একটা বই পেয়ে গেলাম আজ হঠাৎ করে। জন্মেই নাকি মারা গেছে সী-সাইড, বেড়ে ওঠার আর সুযোগ পায়নি। তুমি কিছু জানো?'

খবরের কাগজের লোক মিস্টার মিলফোর্ড, প্রচুর পড়াশোনা। রবিনের তো ধারণা, তার বাবা চলমান জ্ঞানকোষ।

আবার মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'হ্যাঁ। কত লোকের সর্বনাশ যে করেছে শহরটা। ওটার পেছনে টাকা খরচ করে ফকির হয়ে গিয়েছিল কত কোটিপতি, শেষে রুটি কেনার পয়সা পর্যন্ত জোটেনি। কপালই খারাপ ওদের, নইলে অ্যামিউজমেন্ট পার্কে আগুন লাগবে কেন? ওই হলো ধ্বংসের সূত্রপাত।'

'আমার কাছে কিন্তু এত খারাপ লাগল না শহরটা। বেশ বড়, প্রায় রকি বীচের সমান।'

হাসলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে হলে এ কথা বলতে পারতে না। শহর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর যারা তখনও টিকে রইল, তারা আবার ওটাকে গড়তে শুরু করল তিল তিল করে। অনেক পরিশ্রম আর আত্মত্যাগের পর আজ ওই অবস্থায় এসেছে। এখন আর পোড়া শহর বলে না কেউ, তবে স্বপ্ননগরীও আর হবে না কোনদিন। এখন ওটা কারখানা-শহর, টাকা কামানোর জায়গা।'

'যা দেখলাম-টেখলাম, কামানো বোধহয় খুব কঠিন। আচ্ছা, একটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলওয়ে তৈরি হওয়ার কথা নাকি ছিল ওখানে?'

'ছিল।' সামনে ঝুঁকলেন মিস্টার মিলফোর্ড, 'স্বপ্ননগরী তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন একজন কোটিপতি। আর এই ভুলের জন্যে শেষমেষ প্রাণ দিতে হয়েছিল তাঁকে। কাজটা শুরু করেই বোকা বনে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক। বিশাল পরিকল্পনা। একচুমুকে যেন কোটি কোটি টাকা গিলে শেষ করে ফেলল পরিকল্পনার বিশাল দৈত্যটা। চোখের পলকে ফুরিয়ে গেল সব টাকা। এমনটা যে ঘটবে কল্পনাই করতে পারেননি তিনি। আশা করেছিলেন, শুরু করলে অনেকেই এগিয়ে আসবে সাহায্য করতে, কিন্তু এল না। পথের ফকির হয়ে শেষে আত্মহত্যা করতে হলো তাঁকে।'

ঘনঘন বারকয়েক পাইপে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন তিনি। 'নামটা এখন মনে করতে পারছি না। শেষ মুহূর্তে যদি কিছু লোক বিশ্বাসঘাতকতা না করত, সী-সাইড সত্যি একটা দেখার মত শহর হত এখন…'

বেরসিকের মত বাধা দিলেন মিসেস মিলফোর্ড, 'খাবার তৈরি।'

আরও অনেক কিছু জানার ইচ্ছে ছিল রবিনের, কিন্তু হলো না। দেরি করলে মা রেগে যাবেন। উঠে বাবার পিছু পিছু খাবার টেবিলের দিকে এগোতে হলো তাকে।

এগারো

ড্রিলারের প্লর আবার হেডকোয়ার্টারে এসে ঢুকল তিন গোয়েন্দা।

'আমি বলছিলাম কি,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল মুসা, 'মিস্টার জোনসের কুত্তা খোঁজার কাজটা আমাদের বাদ দেয়া উচিত। কি কাণ্ড! ভয়াবহ এক মানুষখেকো ড্রাগন, দু-জন শয়তান ডুবুরী—সঙ্গে আবার স্পীয়ারগান থাকে, লোকের গায়ে বর্শা গাঁথার জন্যে হাত নিশপিশ করে ওদের। মানুষ পেলেই গিলতে চায় যে কাদা-ভরা গর্তটা, ওটার কথা নাহয় বাদই দিলাম। আর পুরানো কাঠের সিঁড়ি, যেটা থেকে পড়ে কোমর ভাঙার জোগার হয়, ওটাও নাহয় ধরলাম না। বাড়িতে ফিরেও যন্ত্রণার কমতি নেই। ভূতুড়ে টেলিফোন আসে, গুহার কাছ থেকে দূরে থাকতে বলে। উপদেশটা খুব পছন্দ হয়েছে আমার।'

'ভূতুড়ে টেলিফোন?' চোখ বড় বড় হয়ে গেল রবিনের।

'তুমি যাওয়ার পর,' কিশোর বলল, 'একটা ফোন এসেছিল।' কি কি বলেছে, জানাল রবিনকে।

'আমার কাছে ভোগলামী মনে হচ্ছে,' শুকনো গলায় বলল রবিন। 'কারও শয়তানী। সে চায় না, আমার গুহাটার কাছে যাই। না যাওয়াই বোধহয় ভাল।'

'যাব না মানে?' গম্ভীর হয়ে গেল কিশোর, 'এখনও ড্রাগনটাকেই দেখিনি। ভাবছি, আজ রাতেই দেখতে যাব।'

'ভোটাভুটি হয়ে যাক তাহলে,' প্রস্তাব দিল মুসা। 'আমি, না। কারও হ্যাঁ বলার থাকলে বলতে পারো।'

'হ্যাঁ! হ্যাঁ! হ্যাঁ!' মাথার ওপরে ঝোলানো খাঁচা থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে

ব্ল্যাকবিয়ার্ড, লঙ জন সিলভারের সেই ময়নাটা, রেখে দিয়েছে তিন গোয়েন্দা।

'চুপ, ব্যাটা!' কড়া ধমক লাগাল মুসা। 'তোকে কথা বলতে কে বলেছে? তুই কি তিন গোয়েন্দার কেউ? হারামীপনার আর জায়গা পাওনি ব্যাটা। ভোট নিয়ে মস্করা করতে এসেছ। বেশি জ্বালাতন করলে খাঁচাসুদ্ধ নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়ে আসব গুহায়!'

গ্রাহ্যই করল না ব্ল্যাকবিয়ার্ড। টেনে টেনে বলল, 'মরা মানুষ···মরা মানুষ। অ্যায়াম ব্ল্যাকবিয়ার্ড দা পাইরেট। হেহ্ হেহ্ হেহ্!' তারপর মুখ খারাপ করে গাল দিল কয়েকটা, কান গরম করে দিল মুসার।

'যা শোনে তাই মনে রাখে ব্যাটা,' বলল রবিন। 'ওই যে শুনেছে, মরা মানুষ, ব্যস, আর ভুলবে না। চান্স পেলেই বলবে।'

'একদিন ওটার ঘাড় না মটকে দিয়েছি তো আমার নাম মুসা আমান নয়,' ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। কিন্তু রবিন আর কিশোর জানে, তা সে কোনদিনই করবে না। তার অনুরোধেই পাখিটা রেখে দিয়েছে কিশোর, নইলে অন্যগুলোর সঙ্গে ওটাকেও দিয়ে আসত মিস কারমাইকেলের পাখির আশ্রমে। তবে বেশি জ্বালাতন করলে কিশোরের কথাও আর শুনবে না, ঠিকই চালান করে দিয়ে আসবে।

'যাকগে। তো, এখন কি ঠিক হলো?' আগের কথার খেই ধরল কিশোর।

'আমি যাচ্ছি না,' মুসার সাফ জবাব।

'কেন?'

'ভয় পাচ্ছি।'

'ভণিতা করছ তুমি, মুসা,' হাসল কিশোর। 'এই সামান্য ব্যাপারে ভয় পাওয়ার ছেলে তুমি নও। মাঝে মাঝে তোমার সাহস দেখে আমারই তাক লেগে যায়। সেই আমাজনের জঙ্গলে···'

'ব্যস ব্যস, হয়েছে, আর ফোলাতে হবে না,' হাত তুলল মুসা, 'যাব, যাও।, মরলে তারপর দেখাব মজা···'

'মরলে তো মরেই গেলে,' কিশোরের হাসি রবিনের মাঝেও সংক্রমিত হয়েছে। 'আর দেখাবে কি করে?'

'মরে গেলাম মানে? তোমরা মরবে না, যখনই মরো? আমি নরকে গেলে তোমরাও ওখানে যাবে। আগে মরলে বরং কিছু সুবিধে, শয়তানের সঙ্গে ভাব হয়ে যাবে আমার। তোমরা যখন যাবে তখন আমি অনেক পুরানো দোজখী, চোটপাট অনেক বেশি···'

'হয়েছে, হয়েছে,' বাধা দিল কিশোর। 'তোমার চোটপাট বেশি হলেই আমাদের সুবিধে। নরকে সুযোগ-সুবিধা বেশি পাব।' রিসিভারের দিকে হাত বাড়াল সে।

'কাকে করবে? জিজ্ঞেস করল মুসা।

'হ্যানসনকে। গাড়িটা দরকার। তোমার সম্মানার্থে আজ রোলস রয়েসে করেই যাব।'

ঘন্টাখানেক পর, গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে মুসা।

রাজকীয় রোলস রয়েস। চকচকে কালো শরীরের ওপর সোনালী অলঙ্করণ, শত গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে গাড়িটার রূপ। শক্তিশালী বিশাল এঞ্জিনের শব্দ প্রায় নেই বললেই চলে। উড়ে চলেছে যেন উপকূলের মহাসড়ক ধরে। দক্ষ, ভদ্র, 'খাঁটি ইংরেজ' শোফারের হাতে পড়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে গাড়ি, তার প্রতিটি নির্দেশের সাড়া দিচ্ছে চোখের পলকে, বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ না করে।

'বাজিটা সেদিন তুমি না জিততে পারলেই বোধহয় ভাল হত, কিশোর,' মুসা বলল। 'এই গাড়িটাই যত নষ্টের মূল। তিন গোয়েন্দা সৃষ্টিতে ওর মস্তবড় অবদান রয়েছে, অবশ্যই খারাপ অর্থে। কত বিপদে যে পড়লাম।'

'দোষটা কিশোরের চেয়ে অগাস্টের বেশি, মুসা,' হেসে মনে করিয়ে দিল রবিন। 'বাজি জিতে তো মাত্র তিরিশ দিনের জন্যে পাওয়া গিয়েছিল গাড়িটা। কিন্তু অগাস্টই তো চিরকালের জন্যে বহাল করে দিল।'

'এবং সর্বনাশ করল আমাদের,' ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করল মুসা। নরম গদিতে আরাম করে হেলান দিয়ে হাসল। 'তবে এরকম গাড়িতে চড়ার আলাদা আনন্দ। আরামের কথা বাদই দিলাম, নিজেকে খুব হোমড়া-চোমড়া মনে হয়। আহ্ কোটিপতি ব্যাটারা কি মজায় না আছে।'

সী-সাইডে পৌঁছল রোলস রয়েস। হ্যানসনকে পথ বাতলে দিল কিশোর।

সাগরপাড়ে পৌঁছল গাড়ি।

'আপনি এখানেই থাকুন, হ্যাঁ,' শোফারকে বলল কিশোর। 'আমরা আসছি।'

'ভেরি গুড, মাস্টার পাশা,' বিনয়ের চূড়ান্ত করে ছাড়ে হ্যানসন, এত বেশি, একেক সময় কিশোরের লজ্জাই লাগে।

বড় বড় হেডলাইট দুটো জ্বেলে রেখেছে হ্যানসন, তিন গোয়েন্দার হাঁটার সুবিধের জন্যে। হেডলাইট তো নয়, যেন সার্চলাইট, পথের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে তীব্র আলো।

নামল ছেলেরা। গাড়ির পেছনে গিয়ে বুট খুলল কিশোর।

'টর্চ...ক্যামেরা...টেপরেকর্ডার,' নিতে নিতে বিড়বিড় করছে সে, নিজেকে বোঝাচ্ছে, 'জরুরী অবস্থার জন্যে তৈরি এখন আমরা। ডকুমেন্ট রাখতে পারব।'

রেকর্ডারটা রবিনের হাতে দিল। 'ড্রাগন, কিংবা ভূতের যে কোন শব্দ শোনো, রেকর্ড করবে। কিছুই বাদ দেবে না।'

মুসার হাতে খুব শক্তিশালী একটা টর্চ দিল সে। আরেকটা দিল রবিনকে। নিজে রাখল একটা। এক বাণ্ডিল দড়ির ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে নিল সেটা।

'দড়ি কেন?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'কোনটা যে কখন কাজে লাগবে কে জানে। তৈরি থাকা ভাল। একশো ফুট নাইলনের দড়ি আছে এখানে, হালকা, কিন্তু খুব শক্ত। একটা সিঁড়ি তো ভেঙেছে, আরেকটার কি অবস্থা কি জানি। যদি ওটাকেও ভেঙে পড়ার অবস্থা করে রাখে? দড়ি লাগবে না তখন? উঠে আসব কি বেয়ে?'

আর কিছু বলল না মুসা।

গাড়ির আলোর সীমানা শেষ হলো। তারপর অন্ধকার পথটুকু চুপচাপ হাঁটল তিন গোয়েন্দা। দ্বিতীয় সিঁড়িটার কাছে এসে দাঁড়াল। প্রথমটা, ওই যেটা সকালে ভেঙে ছিল, সেটার কাছ থেকে কয়েকশো গজ দূরে দ্বিতীয়টা।

সবাই ঝুঁকে তাকাল নিচে। নির্জন সৈকত। হালকা মেঘের ফাঁকে লুকোচুরি খেলছে উঠতি চাঁদ। ঘোলাটে আলো ছড়িয়ে পড়েছে বেলাভূমিতে। বালিয়াড়িকে একনাগাড়ে চুমু খাচ্ছে ছোট ছোট ঢেউ, তার মোলায়েম মৃদু হিসহিস শব্দ কানে আসছে। নিয়মিত সময় পর পর ছোট ঢেউয়ের মাথায় ভর করে যেন ছুটে আসছে পাহাড়-প্রমাণ বিশাল ঢেউ, আছড়ে পড়ে ভাঙছে তীরে, বিকট শব্দে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে হিসহিসানি, সামান্য বিরতি দিয়ে আবার শুরু হচ্ছে।

অস্বস্তি বোধ করছে মুসা। শুকনো ঠোঁটে জিভ বোলাল। পুরানো কাঠের সিঁড়ির রেলিঙ আঁকড়ে ধরে রেখেছে, ধীরে ধীরে বাড়ছে আঙুলের চাপ। কান খাড়া করে শুনছে।

রবিন আর কিশোরও কান খাড়া রেখেছে।

বড় ঢেউয়ের ভোঁতা গর্জন, আর ছোট ঢেউয়ের মোলায়েম হাসি ছাড়া আর কিছুই কানে আসছে না। না না, আসছে, যার যার বুকের টিপ-টিপানি।

'চলো, নামি,' অবশেষে বলল মুসা। 'আল্লাহ্‌গো, তুমিই জানো।'

কয়েক ধাপ নেমেই থেমে গেল কিশোর। পেছনে অন্য দু-জন।

'কি হলো?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'সাগরের গর্জন একটু বেড়েছে না?' বলল কিশোর।

কান পেতে ভালমত শুনল মুসা।

তার শ্রবণশক্তি অন্য দু-জনের চেয়ে জোরাল। 'কি জানি। সে রকমই তো লাগছে। হয়তো আমাদেরকে হুঁশিয়ার করছে ঢেউ।'

সিঁড়ির ধাপগুলো অস্পষ্ট। মুখে কামড় মারছে যেন রাতের নোনা হাওয়া। ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে পাহাড়ের চূড়া, চাঁদের আলোয় বিষণ্ন ছায়া ফেলেছে বালিতে।

ওদের ভারে ভেঙে পড়ল না সিঁড়ির তক্তা। ভয় কাটল, পরের কয়েকটা ধাপ পেরোল দ্রুত। লাফিয়ে বালিতে নেমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

ওপরে তাকাল কিশোর। পাড়ের দু-একটা বাড়িতে এক-আধটা আলো জ্বলছে।

গুহামুখের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। কান পাতল শোনার জন্যে, ভালমত দেখল আশপাশটা। শব্দও নেই, কিছু চোখেও পড়ল না। গুহার ভেতরে নড়ছে না কিছু।

আবার ওপরে তাকাল কিশোর। ঠেলে বেরোনো চূড়ার জন্যে পাড়ের ওপরের বাড়িঘর কিছু চোখে পড়ছে না। ভ্রূকুটি করল সে। এই যে 'না দেখা যাওয়ার ব্যাপারটা', এটাকে একটা পয়েন্ট বলে মনে হলো তার, কিন্তু কেন সেটা বুঝতে পারল না

অবশেষে মাথা ঝাঁকাল সে, 'অল ক্লিয়ার।'

নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা। কান পাতল আবার কিশোর।

মুসার অবাক লাগছে। গেরিলা যোদ্ধার মত আচরণ করছে গোয়েন্দাপ্রধান, যেন যে-কোন মুহূর্তে আক্রমণের ভয় করছে।

'ব্যাপার কি?' ফিসফিস করল মুসা। 'বিপদ আশা করছ?'

'সাবধানের মার নেই,' ঘুরিয়ে জবাব দিল কিশোর।

টর্চ জ্বালল মুসা। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলে গুহাটা দেখতে শুরু করল। মাটিতে চোখ পড়তেই অস্ফুট শব্দ করে উঠল। বলল, 'আরি! ওখানেই শেষ হয়ে গেল গুহাটা, ওই যে, ওই গর্তের ওপারে। ডাইভার দু-জন তাহলে গেল কই?'

আলো জ্বেলে কিশোরও দেখছে। 'গুহাটা এত ছোট হবে ভাবিনি। মুসা, ঠিকই বলেছ, ওরা গেল কই? কোন পথে?'

গুহার দেয়াল পরীক্ষা করতে লাগল তিনজনে।

'নিরেট,' মাথা নাড়ল মুসা। 'নাহ্, মাথামুণ্ড কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।'

'কি বোঝা যাচ্ছে না?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'দেখছ না, কি ছোট গুহা? গর্তটাও ছোট। ড্রাগনের জায়গা হবে না।'

বিস্ময় ফুটল কিশোরের চোখে। 'অথচ মিস্টার জোনস বললেন, চূড়ার নিচে এদিকেই কোথাও ড্রাগন ঢুকতে দেখেছেন। গর্তের পাড়ে দাঁড়িয়ে নিচে তাকাল সে। 'আর, ডাইভার দু-জনও বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে না। হয় ধারেকাছেই আরও গুহা আছে, কিংবা এই গুহারই আরও মুখ আছে। সুড়ঙ্গ আছে।'

'কিশোর!' বলে উঠল রবিন। 'একটা কথা মনে পড়েছে।'

দ্রুত জানাল সে, বইয়ে কি পড়েছে, আর বাবার মুখে কি কি শুনেছে।

চিন্তিত দেখাল কিশোরকে। 'সুড়ঙ্গ?'

উত্তেজিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'পাতাল রেলের জন্যে খোঁড়া হয়েছিল। কাজ শেষ হয়নি। এখনও আছে, ভূতুড়ে রেলপথ বলা যায়।'

'হুঁ!' মাথা দোলাল কিশোর। 'কিন্তু কোথায় সেটা কে জানে। কয়েক মাইল দূরেও হতে পারে। এমনও হতে পারে, এখানেই এসে শেষ হয়েছে সুড়ঙ্গের মাথা, কিংবা এখান থেকেই শুরু হয়েছে।'

কিশোর পাশাকে চমকে দেবে ভেবেছিল, কিন্তু হতাশ হতে হলো রবিনকে। 'হতে পারে।'

'খুঁজে বের করব রেলপথটা,' কিশোর বলল। 'ম্যাপ পেলে ভাল হত। সী-সাইড সিটি প্ল্যানিং বোর্ড অফিসে গেলে হয়তো পাওয়া যাবে।'

'পঞ্চাশ-ষাট বছর পর?' হেসে উঠল মুসা। 'যে এঁকেছিল, এতদিনে নিশ্চয় মরে ভূত হয়ে গেছে। আর ম্যাপটা থাকলেও চাপা পড়েছে পুরানো কাগজ আর বালির তলায়। খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হয়তো। এসো, এখন ম্যাপ ছাড়াই খুঁজে দেখি পাওয়া যায় কিনা।'

'এক কাজ করলে কেমন হয়? আজ সকালে তক্তার আড়ালে যে গুহাটা

দেখেছি, ওটা থেকে শুরু করলে?'

'মন্দ বলনি,' কিশোর বলল।'

রবিনও একমত হলো।

গুহাটার কাছে চলে এল তিন গোয়েন্দা।

বালি সরাতেই বেরিয়ে পড়ল একটা বড় তক্তা। উত্তেজনায় জ্বলে উঠল কিশোরের চোখ।

লক্ষ করল রবিন। গলা বাড়িয়ে দিল, 'কী?'

ভুরু কুঁচকে গেছে কিশোরের। 'বুঝতে পারছি না এখনও। মনে হচ্ছে এটা প্লাইউড।'

'প্লাইউড?' হলেই বা কি বুঝতে পারছে না রবিন।

'আমার তাই বিশ্বাস।' তক্তায় হাত বুলাচ্ছে কিশোর। 'এই রহস্যের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?…থাক, পরে ভাবব। আপাতত বালি সরাই, তক্তাগুলো যাতে সরানো যায়।'

বালি সরিয়ে তক্তার গোড়া আলগা করে ফেলল ওরা। তক্তা সরিয়ে পথ করে সাবধানে ঢুকল সরু জায়গাটায়। আবার আগের জায়গায় লাগিয়ে রাখল তক্তা। টর্চ জ্বালল।

ছোট্ট একটা গুহা। নিচু ছাত। আর সামান্য নিচু হলেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত না মুসা, মাথায় লাগত। ভেজা ভেজা। খানিক দূর এগিয়ে হঠাৎ ঢালু হয়ে মিশেছে উল্টোদিকের একটা পাথুরে তাকের সঙ্গে।

'পথ নেই,' বিড়বিড় করল মুসা।

'চোর-ডাকাতের জন্যে চমৎকার লুকানোর জায়গা,' বলল কিশোর। 'অতীতে নিশ্চয় খুব ব্যবহার হত। তক্তা যে ভাবে লাগিয়েছে, বোঝাই যায়, গোপন কুঠুরী বানিয়েছিল এটাকে।'

মেঝেতে আলো ফেলল রবিন। 'ডাকাত হলে কিছু মোহর কি আর ফেলে যায়নি?

মোহরের কথায় রবিনের সঙ্গে মুসাও খুঁজতে লেগে গেল। বসে পড়ে বালির স্তর সরিয়ে দেখতে লাগল কোথায় লুকিয়ে আছে গুপ্তধন।

আগে হাল ছাড়ল মুসা। 'দূর, কিচ্ছু নেই।'

রবিন খুঁজতে খুঁজতে চলে গেল শেষ মাথার কাছে। 'কোণের দিকেই মোহর স্তূপ করে রাখে ডাকাতরা। আঁউ!'

তক্তাগুলোর ওপর আলো ফেলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কি দেখছিল কিশোর, ঝট করে ঘুরল। 'কি হলো, রবিন?'

ঘড়ঘড় একটা শব্দ। রবিন গায়েব।

'রবিন!' চেঁচিয়ে উঠে দৌড় দিল কিশোর। দাঁড়িয়ে গেল যেন হোঁচট খেয়ে, হাঁ হয়ে গেছে।

'কি হয়েছে?' উঠে দাঁড়িয়েছে মুসা।

হাত তুলে দেখাল কিশোর। 'মুহূর্ত আগেও ওখানে ছিল। দেখনি? তারপর

দেয়ালটা যেন গিলে ফেলেছে ওকে।'

'কী?' কিশোরের পাশ দিয়ে দেয়ালের দিকে ছুটল মুসা। কাছে গিয়ে আলো ফেলে ভালমত দেখল। 'কই, কিচ্ছু তো নেই। গর্ত-টর্তও নেই।'

খানিক আগে রবিন মোহর খুঁজছিল যে জায়গাটায় সেখানে মাটিতে বসে হাত বুলিয়ে দেখল মুসা। আবার হলো ঘড়ঘড় শব্দ। চমকে সরে এল সে। চোখ বন্ধ করে ফেলল ভয়ে।

'ও-কে,' হাসিহাসি কণ্ঠ কিশোরের, 'আবার উদয় হচ্ছে রবিন।'

চোখ মেলল মুসা। ছোট একটা অংশ সরে গেছে, দেয়ালের ওখানে কালো ফোকর যেন মুখব্যাদান করল। হামাগুড়ি দিয়ে ও পথে বেরিয়ে এল রবিন। আবার বন্ধ হয়ে গেল ফোকর।

'কি বুঝলে?' মিটিমিটি হাসছে রবিন। 'পাথরের গোপন দরজা। ঠেস দিয়ে বসেছিলাম ওটায়। ব্যস, গেল সরে।'

'ও পাশে কি আছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ঝুলে পড়ল রবিনের চোয়াল। 'দেখারই সময় পাইনি। এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল সব কিছু...দেখি তো আবার খোলা যায় কিনা।'

দেয়াল আবার হেলান দিয়ে বসল সে। চাপ দিল। কিছুই ঘটল না। সামান্য সরে কাঁধ দিয়ে আবার ঠেলা দিল। ক্লিক করে মৃদু একটা শব্দ হলো, তারপরই শুরু হলো ঘড়ঘড়। পাথর সরে যেতেই পেছনে হেলে পড়ল তার শরীর। 'আবার ঢুকছি! জলদি এসো, বন্ধ হয়ে যাবে।

লাফ দিয়ে এগিয়ে এল কিশোর আর মুসা। ঢুকে গেল রবিনের পিছু পিছু।

'বাব্বারেহ!' গাল ফুলিয়ে ফুঁস করে মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়ল মুসা। 'আরব্য রজনীর জিন নাকি? চিচিং ফাঁক বলতেই,' দুই হাত দুই দিকে ছড়াল সে, 'হাঁ!'

এটা অনেক বড় গুহা, ছড়ানো। ছাতও অনেক উঁচু।

ফোকরের কাছ থেকে সরে এল ওরা, গুহাটা ঘুরেফিরে দেখার জন্যে।

ক্লিক করে শব্দ, পরক্ষণেই ঘড়ঘড়। ঘুরল ওরা, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে গেছে ফোকর।

'খাইছে!' আঁতকে উঠল মুসা। 'বেরোব কি করে?'

'রবিন যেভাবে বেরিয়েছে,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'ও কিছু না। সহজ কোন লেভারেজ সিসটেম। চলো আগে গুহাটা দেখি, পরে এসে লেভার খুঁজে বের করব। ভয় পেয়ো না, খোলা যাবে ঠিকই।'

ছাতের দিকে তাকাল রবিন। 'কিশোর, আমার মনে হয় এটাই। এটার কথাই পড়েছি রেফারেন্স বইয়ে। সাইজ দেখেছ?'

'হতে পারে,' কিশোর বলল। 'কিন্তু রবিন, লক্ষ করেছ আর সব প্রাকৃতিক গুহার মত এটার দেয়ালও রুক্ষ, খসখসে। ছাতে খোঁচা খোঁচা পাথর বেরিয়ে আছে। মানুষের তৈরি হলে সমান হত, মসৃণ। পাতাল-রেলের সুড়ঙ্গ সিমেন্ট দিয়ে তৈরি হয়, সমান হতেই হবে।'

আলো ফেলে ফেলে দেয়াল, ছাত আবার দেখল সে, মাথা নাড়ল। 'নাহ,

প্রাকৃতিক গুহাই মনে হচ্ছে। সাগরের দিক থেকে ঢোকার সরাসরি কোন পথ দেখছি না। নিরেট পাথরের দেয়াল। চলো, এগিয়ে দেখি। যে সুড়ঙ্গটা খুঁজছি, হয়তো সামনেই আছে সেটা।'

'যাক, বাঁচা গেল।' হাত নাড়ল মুসা। 'সাগরের দিকে পথ নেই। তারমানে ড্রাগন ঢুকতে পারবে না এখানে।

'তা তো হলো,' হেসে বলল কিশোর। 'কিন্তু ভুলে যাচ্ছ, গুহাটা বিরাট। জায়গা হয়ে যাবে, চমৎকার বাসা হবে ড্রাগনের।'

'মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ,' অস্বস্তি ফিরে এল আবার মুসার কণ্ঠে। 'একটা সেকেণ্ডের জন্যে নিশ্চিত হওয়ার জো নেই, এমনই কাণ্ড!'

মেঝে বেশ সমান, মসৃণ বলা না গেলেও আর সব গুহার মত খসখসে নয়।

শেষ মাথায় এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। ছাত থেকে খাড়া নেমেছে পাথরের দেয়াল। পথ নেই।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর।

'কি ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'ওই দেয়ালটা,' সামনে হাত তুলে দেখাল কিশোর, 'ঠিক দেয়ালের মত লাগছে না।'

'আমার কাছে তো দেয়ালই লাগছে।...ভেবেছিলাম পথটথ পাব, সুড়ঙ্গে...' থেমে গেল সে। কিশোরের মনযোগ তার দিকে নেই।

চোখ আধবোজা হয়ে গেছে গোয়েন্দাপ্রধান, এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল দেয়ালের কাছে। থাবা দিল, কিল মারল, টোকা দিল। কান খাড়া করে আওয়াজ শুনছে। আরেকটা জায়গায় আঘাত করে শুনল, হাত রেখে অনুভব করল কি যেন।

'তফাৎ আছে,' অবশেষে বলল সে। 'বোঝাতে পারব না কেমন, তবে...'

'তাতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল?' অধৈর্য হয়ে পড়েছে মুসা। 'চলো। শীত করছে আমার।'

উজ্জ্বল হলো কিশোরের মুখ। 'পেয়েছি!' চুটকি বাজাল দুই আঙুলে। 'ঠাণ্ডা!...'

'সে কথাই তো বলছি...'

'আমি শীতের কথা বলছি না। বলছি, দেয়ালটা ঠাণ্ডা নয়। কিন্তু এই গুহারই অন্য সব দেয়াল ঠাণ্ডা। বিশ্বাস নাহলে গিয়ে হাত রেখে দেখতে পারো।'

দেখল দুই গোয়েন্দা।

'ঠিকই তো,' মাথা দোলাল মুসা। 'তত ঠাণ্ডা নয়। কিন্তু তাতে কি? ছাতের ওপর বাড়িঘর আছে, ওগুলো থেকেই কোনভাবে নেমে এসেছে উত্তাপ। দেয়াল গরম করেছে।'

'তাপ ওপর দিকে ওঠে, নিচে নামে না।'

'ওপাশে আরও গুহাটুহা আছে হয়তো,' অনুমান করল রবিন। 'হয়তো ওই পাশটা গরম।'

মাথা নাড়ল কিশোর। যুক্তিটা মানতে পারছে না। পকেট থেকে ছুরি বের

করল।

হেসে উঠল মুসা। 'পাগল! ছুরি দিয়ে পাথর কাটবে? ফলা ভাঙবে খামাকা। ডিনামাইট দরকার।'

মুসার কথায় কান না দিয়ে আঁচড় কাটল কিশোর। ছুরির আগা দিয়ে খোঁচা দিল। ধূসর আঠা আঠা পদার্থ লেগে গেল ছুরির ফলায়।

সঙ্গীদের দিকে ফিরল গোয়েন্দা প্রধান। মুখে জয়ের হাসি, যেন সাঙ্ঘাতিক কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছে। দুই গোয়েন্দার কাঁধের ওপর দিয়ে চোখ পড়তেই হাসি মুছে গেল মুখ থেকে। 'আ-আরে···খুলে যাচ্ছে···'

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরল দুই সহকারী গোয়েন্দা। বিশ্বাস করতে পারছে না। এ-কি কাণ্ড? সরে যাচ্ছে দেয়াল।

খুলছে···খুলছে···ফিকে হচ্ছে অন্ধকার। বাতাস এসে লাগল ওদের মুখে।

স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওরা। দুরুদুরু করছে বুক। দেয়ালের খোলা জায়গা দিয়ে আবছামত চোখে পড়ল সৈকতের বালি, তার পেছনে সাগরের সীমারেখা।

আগে সামলে নিল কিশোর। 'জলদি! ছোট গুহাটায় ঢোকো···'

ছুটে এসে প্রায় দেয়ালে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা, এখান দিয়েই বেরিয়েছিল।

পাগলের মত লেভার খুঁজতে শুরু করল রবিন। পেল না। কাঁধ দিয়ে জোরে ধাক্কা দিল দেয়ালে। খুলল না। সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, 'খুঁ-খুঁজে পাচ্ছি না···!' গলা কাঁপছে।

'পেতেই হবে,' জোর দিয়ে বলল কিশোর।

তিনজনে তিন জায়গায় খুঁজতে লাগল। কোনো ধরনের হাতল বা এমন কিছু রয়েছে, যাতে চাপ লাগলে খুলে যায় দরজা।

হঠাৎ আলোর বন্যায় ভেসে গেল গুহার ভেতর। জমে গেল যেন তিন কিশোর। দেয়াল আরও ফাঁক হয়েছে। কি যেন আসছে, এদিকেই। বিশাল একটা ছায়ামত, সাগর থেকে উঠেছে।

কিশোরের কাঁধ খামচে ধরল মুসা। 'সত্যিই দেখছি তো···' কথা আটকে গেল।

কিশোরও স্তম্ভিত। মাথা নেড়ে সায় দিল। গলা শুকিয়ে কাঠ, চোখের পাতা ফেলছে ঘনঘন। 'ড্রাগন!'

এগিয়ে আসছে দানবীয় সরীসৃপ। ভেজা চকচকে চামড়া, পানির কণা লেগে আছে। শরীরের তুলনায় ছোট মাথা, ত্রিকোণ। এদিক ওদিক দুলছে লম্বা সাপের মত গলা। হলুদ দুই চোখ থেকে আলো আসছে গুহার ভেতরে, যেন দুটো বিশাল হেডলাইট। একটানা শব্দ করছে, অদ্ভুত একধরনের গুঞ্জন।

দেয়ালের খোলা অংশ জুড়ে দাঁড়াল ওটা। প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসর যেন মাথা নোয়াল। হাঁয়ের ফাঁকে লকলকে জিভটা ঢুকছে-বেরোচ্ছে। ভোঁস ভোঁস করে শ্বাস ফেলছে, যেন দীর্ঘশ্বাস।

হাতল খোঁজায় বিরতি দিল না ওরা। বার বার দেয়ালে ধাক্কা দিয়ে দেখছে.

খোলে কিনা।

গুহায় ঢুকছে ড্রাগন। শ্বাস টানছে জোরে জোরে, হাঁপানী রোগীর মত।

দেয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়াল ওরা, কুঁকড়ে বাঁকা করে রেখেছে শরীর। আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে হাত উঠে গেছে মাথার ওপর।

লম্বা গলাটা বাড়িয়ে দিল ড্রাগন।

ভেজা চোয়াল ঝুলে পড়ল নিচে, বেরোল একসারি ঝকঝকে সাদা ধারাল দাঁত। আবার জোরে জোরে শ্বাস টানল কয়েকবার, ছোট্ট একটা কাশি দিয়ে থেমে দাঁড়াল।

আমাজনের জঙ্গলে জাগুয়ারের কথা মনে পড়ল কিশোরের। শিকার ধরার আগে এ রকম করেই কাশে ওই ভয়ানক বাঘ। তারমানে ড্রাগনও এখন শিকার ধরবে।

কালচে মাথাটার দিকে স্থির হয়ে আছে কিশোরের চোখ, নড়াতে পারছে না, যেন সম্মোহিত করে ফেলেছে তাকে দানবটা। ঝটকা দিয়ে মাথা সামনে বাড়াল, কিশোরকে ধরার জন্যেই বোধহয়।

পিছু হটার জায়গা নেই, বন্ধুদের কাছে সরে এল কিশোর। আঙুলগুলো মরিয়া হয়ে খুঁজল পেছনের দেয়াল। ইস্ কোথায় হাতলটা?

এগিয়ে আসছে ড্রাগনের হাঁ-করা চোয়াল। গায়ে এসে লাগছে বাষ্পের মত ভেজা উত্তপ্ত নিঃশ্বাস।

বারো

পেছনের দেয়ালে কিট করে একটা শব্দ হলো। ঘড়ঘড় করে সরে গেল পাথর। ফোকর দিয়ে ভেতরে উল্টে পড়ল রবিন। তাকে ঠেলে সরিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকল মুসা। তার পর-পরই ঝাঁপ দিয়ে পড়ল কিশোর।

বন্ধ হয়ে গেল আবার পাথরের দরজা।

হাঁপ ছাড়ল ছেলেরা। কিন্তু সেটা ক্ষণিকের জন্যে।

ড্রাগনের চাপা গর্জন শোনা যাচ্ছে ওপাশ থেকে। কেঁপে উঠল দেয়াল। থাবা মারছে যেন দানবটা, ধাক্কা দিচ্ছে।

'ভাঙতে চাইছে।' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

গর্জন বাড়ছে ওপাশে। ধাক্কায় থরথর করে কাঁপছে গুহার দেয়াল। ছাত থেকে ঝরতে শুরু করল বালি আর ছোট ছোট পাথর।

বাতাসে বালি উড়ছে, নাক দিয়ে ঢুকছে বালির কণা। দাঁতে কিচকিচ করছে বালি। কেশে উঠল মুসা, থুহ্ করে থুতু ফেলল।

'ভূমিধস!'

'পড়েছি ফাঁদে আটকা!' রবিনও কাশতে শুরু করল। 'দম বন্ধ হয়ে মরব এবার!'

মনে পড়ল কিশোরের, বলা হয়েছে এখানে যখন তখন ভূমিধস নামে, জ্যান্ত

কবর হয়ে যায় লোকের। কত লোক যে মরেছে এভাবে তার হিসেব নেই। বোঝা যাচ্ছে বানিয়ে বলেননি মিস্টার জোনস।

আরও পাথর পড়ল। ওপাশে যেন পাগল হয়ে গেছে ড্রাগনটা। গর্জনে কান ঝালাপালা।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল কিশোর, আতঙ্কে বুদ্ধি ঘোলা হয়ে গেছে। নইলে এই গুহা থেকেও যে বেরিয়ে যাওয়া উচিত সে কথা মনে পড়ত। তক্তার ওপর চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল, 'তক্তা! বেরিয়ে যেতে হবে!'

লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল তিনজনে। পাগলের মত মাটি সরাতে লাগল দুই হাতে। যখন মনে হলো, আর কোনদিনই সরাতে পারবে না, ঠিক এই সময় নড়ে উঠল তক্তাটা।

ছোট ফাঁক দিয়ে হুড়াহুড়ি করে বেরিয়ে এল ওরা। তক্তাটা আবার জায়গামত বসিয়ে লাথি দিয়ে দিয়ে বালি ঠাসতে লাগল ওটার গোড়ায়। হাঁপাচ্ছে জোরে জোরে।

'ভাগো,' বলেই দৌড় দিল কিশোর।

এক ছুটে গুহা থেকে বেরিয়ে দৌড়ে চলল সৈকত ধরে। পাশে ছুটছে মুসা। রবিন পেছনে।

ওদের হাতের টর্চ নাচছে ছোটার তালে তালে, আলোর বিচিত্র রেখা তৈরি করছে বালিতে বার বার। ভাঙা সিঁড়িটা পেরিয়ে এল। এসে পৌঁছল ভাল সিঁড়িটার গোড়ায়। থামল না। পুরানো কাঠ ভেঙে পড়ার পরোয়া করল না, উঠে চলল একজনের পেছনে একজন। পাড়ের ওপরে নিরাপদ জায়গায় উঠে যেতে চায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ওখানে রয়েছে হ্যানসন আর রাজকীয় রোলস রয়েস, একবার পৌঁছতে পারলে ছুটিয়ে নিয়ে যাবে ড্রাগনের কাছ থেকে দূরে। কিন্তু পারবে তো? পেছনে শোনা যাচ্ছে দানবের ভয়াবহ গর্জন।

অর্ধেক সিঁড়ি উঠে যাওয়ার পরেও ড্রাগনটাকে দেখা গেল না, তাদেরকে কামড়াতে এল না ভয়াবহ চোয়াল। শুধু শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ওপরে উঠে এল ওরা। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক।

সামনে, দূরে লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের আলো মিটমিট করছে। পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে রোলস।

গাড়ির কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর। 'হ্যানসন, বাড়ি চলুন!'

'নিশ্চয়। উঠুন।'

প্রাণ পেল বিশাল ইঞ্জিন। শাঁ করে মোড় নিয়ে প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ে ধরে তীব্র গতিতে ছুটে চলল গাড়ি।

একটু সুস্থির হয়ে নিয়ে মুসা বলল, 'এত জোরে দৌড়তে পারো তুমি, কিশোর, জানতাম না।'

'আমিও না,' গাল ফুলিয়ে মুখ দিয়ে বাতাস বের করে দিল কিশোর। 'দৌড়েছি কি আর সাধে?…জীবনে আর কখনও ড্রাগনের সামনে পড়েছি, বলো।'

চামড়ামোড়া নরম গদিতে হেলান দিল রবিন। 'উফ, বড় বাঁচা বেঁচেছি আজ।

আরেকটু হলেই···'

'···গেছিলাম,' কথাটা শেষ করে দিল মুসা। 'কিশোর, ড্রাগনের সামনে যে পড়ব কি করে জানলে তুমি? শুরু থেকেই হুঁশিয়ার ছিলে দেখেছি।'

'এমনি, না জেনেই হুঁশিয়ার। ড্রাগন দেখা গেছে শুনেছি তো।'

'আরিব্বাপরে, কি চেহারা ওটার। জীবনে ভুলব না।'

'আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না,' রবিন মাথা নাড়ল। 'যত বই পড়েছি, কোনটাতেই লেখা নেই যে ড্রাগন আজও বেঁচে আছে। কোনোদিন ছিল, সে কথাও বিশ্বাস করেন না বিজ্ঞানীরা। ছিল শুধু রূপকথাতেই।'

মাথা দোলাল কিশোর। চিমটি কাটতে শুরু করল নিচের ঠোঁটে। 'কোনদিন ছিল কিনা জানি না, কিন্তু এখন নেই। আর বাস্তবে যদি না-ই থাকে, তাহলে ড্রাগন দেখিনি।'

'কি বলছ?' মুসা বলল। 'তিনজোড়া চোখ ভুল দেখতে পারে না। গুহায় ওটা কি দেখলাম? গরম নিঃশ্বাস এখনও গায়ে লাগছে মনে হচ্ছে।'

'আমারও লাগছে,' রবিন বলল।

'একসকিউজ মী, জেন্টলমেন,' আর চুপ থাকতে পারল না হ্যানসন। 'ড্রাগন দেখেছেন? জ্যান্ত?'

'হ্যাঁ,' মুসা জবাব দিল। 'সাগর থেকে উঠে সোজা এসে ঢুকল গুহায়, আমরা যেটাতে ছিলাম সেটাতেই। আচ্ছা, হ্যানসন, আপনার কি মনে হয়, ড্রাগন আছে?'

মাথা নাড়ল শোফার। 'আমার মনে হয় না। তবে, স্কটল্যাণ্ডে শুনেছি ড্রাগনের মত একটা জীব আছে, অনেকে নাকি দেখেছে। বিশাল এক লেকে থাকে দানবটা।'

'লক নেস মনস্টারের কথা বলছেন?' আগ্রহ দেখাল কিশোর।

'হ্যাঁ। লোকে আদর করে ডাকে নেসি। একশো ফুট লম্বা।'

'আপনি কখনও দেখেছেন?'

'না। ছেলেবেলায় অনেকবার গেছি ওই হ্রদের ধারে, শুধু নেসিকে দেখতে। কিন্তু একবারও চোখে পড়েনি।'

'হুম। ড্রাগন তো তাহলে নিশ্চয় দেখেননি।'

'দেখেছি,' পথের দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে, হ্যানসনের হাসিটা দেখতে পেল না ছেলেরা।

'দেখেছেন! এই না বললেন, দেখেননি?'

'দেখেছি, ফুটবল মাঠে, খেলার আগে।'

'ফুটবল মাঠে?' বুঝতে পারছে না রবিন।

মাথা ঝাঁকাল হ্যানসন। 'নতুন বছরের খেলার সময় প্যাসাডেনার লোকেরা বেলুনে বেঁধে ড্রাগন ছেড়ে দেয় আকাশে।'

হ্যানসন দেখেছে শুনে উত্তেজনায় সামনে ঝুঁকে বসেছিল মুসা, চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ফোঁস করে ছেড়ে বলল, 'ওগুলো তো ফুল দিয়ে বানানো, তাই না, কিশোর?'

'হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞেস করছি, আসল ড্রাগন দেখেছেন কিনা।'

'আমাদের মত,' যোগ করল মুসা।
'না।'
আবার নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা শুরু করল কিশোর। চুপচাপ চেয়ে আছে জানালা দিয়ে পথের দিকে।
স্যালভিজ ইয়ার্ডে পৌঁছল রোলস রয়েস। হ্যানসনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল কিশোর, দরকার পড়লেই আবার ডাকবে।
'ভেরি গুড, মাস্টার পাশা,' হ্যানসন বলল। 'আপনাদের সঙ্গে সময়টা খুব ভাল কাটে। ধনী বিধবাদের কাজ করতে বিরক্ত লাগে। তাই আপনারা যখন ডাকেন, খুশিই হই। কিছু মনে না করলে, একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন?'
'নিশ্চয়। কি?'
'রক্ত-মাংসের জ্যান্ত ড্রাগন দেখেছেন আজ আপনারা? খুব কাছে থেকে?'
'কাছে মানে?' বলে উঠল মুসা। 'হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারতাম। গায়ের ওপর এসে উঠেছিল।'
'আপনাদের নিশ্চয় জানা আছে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে ড্রাগনের নাকমুখ দিয়ে আগুন বেরোয়। ওটার কি বেরিয়েছিল?'
আস্তে মাথা নাড়ল কিশোর। 'না, আগুন দেখিনি। তবে ধোঁয়া…হ্যাঁ, ধোঁয়া বেরিয়েছে বলা যায়।'
'তাহলে ড্রাগনের আসল ভয়ঙ্কর রূপই দেখেননি…'
'যা দেখেছি তা-ই যথেষ্ট,' বাধা দিয়ে বলল মুসা। 'অনেক দিন ঘুমাতে পারব না। ভাবলেই রোম খাড়া হয়ে যায়।'
আর কিছু না বলে গাড়ি নিয়ে চলে গেল হ্যানসন।
জাঙ্কইয়ার্ডে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। চাচা-চাচীর বেডরুমে আলো নেই, ঘুমিয়ে পড়েছেন। শুধু কিশোরের ঘরে ম্লান একটা আলো জ্বলছে।
বন্ধুদের দিকে ফিরল কিশোর। 'আমাদের বোধহয় আরেকবার গুহায় যেতে হবে।'
'কী?' চমকে উঠল মুসা। 'আবার! একবার যে বেঁচে ফিরেছি, যথেষ্ট নয়?'
'হত, যদি বোকামিটা না করতাম।'
'একবার যাওয়াটাই তো বোকামি হয়েছে। আরেকবার গেলে আরও বড় বোকামি হবে, কারণ এবার ড্রাগন আছে জেনেশুনে যাচ্ছি।'
'কিন্তু যেতেই হবে, উপায় নেই। ক্যামেরা, রেকর্ডার সব কিছু ফেলে রেখে ভয়ে দিয়েছি দৌড়। ওগুলো আনতে হবে।'
'ইচ্ছে করে ফেলে রেখে আসোনি তো? আবার ফিরে যাওয়ার ছুতো?'
'ছুতো? নাহ্,' আরেক দিকে তাকিয়ে মাথা চুলকাল কিশোর।
'কিছু বলবে মনে হয় তুমি?' কিশোরের উসখুস ভাবটা ধরে ফেলল রবিন।
বোম ফাটাল কিশোর, 'আমার ধারণা, ড্রাগনটা আসল নয়।'
বোকা হয়ে গেল অন্য দু-জন। বলে কি?
'আসল না?' বিড়বিড় করল মুসা। 'আমাদের খেয়ে ফেলতে চাইল, আর তুমি

বলছ ওটা আসল না?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না।'

'তাহলে কামড়াতে চাইল কেন?' রবিনের প্রশ্ন।

'চায়নি, হয়তো ভঙ্গি করেছে।'

'তাই বা কি করে করল?'

'আসলে, ভঙ্গিও করেছে কিনা, সে ব্যাপারেও শিওর নই। জ্যান্ত জানোয়ারের মত আচরণ করেনি ওটা, ওটুক বলতে পারি। আরেক বার গুহায় গিয়ে দেখলেই পুরো শিওর হতে পারব। তবে প্রাণী যে নয় ওটা, বাজি ধরে বলতে পারি।'

'কখন মরতে চাও?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

এমন ভঙ্গিতে প্রশ্নটা করল সে, কিশোরও বুঝতে পারল না। 'মরতে চাই মানে?'

'বুঝলে না। আরেকবার গুহায় দেখলে তো আর ছাড়বে না, গিলে খাবে আমাদের। তাই জিজ্ঞেস করছি, ড্রাগনের নাস্তা হতে চাও কখন?'

'ও, এই কথা,' হাসল কিশোর। 'এখন আর সময় নেই। কালকে সকালের আগে হবে না। এতক্ষণ না খেয়েই থাকতে হবে ড্রাগনটাকে।'

তেরো

সে-রাতে ভাল ঘুম হলো না রবিনের।

ভীষণ ক্লান্ত হয়ে শুয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ার কথা। পড়লও তাই, কিন্তু চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল দুঃস্বপ্ন, গুহা থেকে গুহায় তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল ভয়ঙ্কর এক ড্রাগন, আগুনের হলকা আর বাষ্পের মত গরম নিঃশ্বাস দিয়ে পুড়িয়ে দিল চামড়া।

দুঃস্বপ্ন কখন গেল, বলতে পারবে না রবিন, ঘুম ভাঙল মায়ের ডাকে। নাস্তা রেডি।

খাবার টেবিলে এসে দেখল, তার বাবার খাওয়া প্রায় শেষ। মাথা সামান্য ঝাঁকিয়ে ইশারায় 'গুড মর্নিং' জানিয়ে ঘড়ি দেখলেন মিলফোর্ড।

'গুড মর্নিং, বাবা।'

মুখের খাবারটুকু গিলে নিয়ে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'কাল রাতে বন্ধুদের সঙ্গে কেমন কাটালে?'

'ভাল,' আরেক দিকে তাকিয়ে জবাব দিল রবিন।

'গুড!' ন্যাপকিনে মুখ মুছে দলেমুচড়ে ওটা টেবিলে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন মিলফোর্ড। 'ও হ্যাঁ, ভাল কথা, কাল সী-সাইডের কথা বলছিলে না, তুমি যাওয়ার পর নামটা মনে পড়ল। স্বপ্নের শহর বানাতে গিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন যে মানুষটা···'

'তাই? কি নাম?'

'ডন হেরিঙ।'

'হেরিঙ?' জন হেরিঙের কথা মনে পড়ল রবিনের। বদ-মেজাজী, হাতে শটগান।

'হ্যাঁ। ভাল স্বাস্থ্য ছিল। কিন্তু সী-সাইড টাউন কাউন্সিল যখন তার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিল, স্বাস্থ্যও ভাঙতে লাগল তার। টাকা, স্বাস্থ্য, সুনাম হারালে আর কি থাকে একজন মানুষের? বেঁচে থাকার আর কোনো যুক্তি দেখলেন না তিনি।'

'হ্যাঁ, শুনলে খারাপই লাগে। তাঁর পরিবারের আর কেউ নেই?'

'আছে। হেরিঙ মারা যাওয়ার কিছুদিন পরেই তার স্ত্রীও মারা গেলেন। থাকল শুধু একমাত্র ছেলে জন হেরিঙ।...এখনও বেঁচে আছে কিনা জানি না। অনেক কাল আগের কথা তো।'

বেরিয়ে গেলেন মিলফোর্ড, অফিসে যাবেন।

তথ্যগুলো নোট করে রাখল রবিন। খেতে খেতে ভাবল, এসব শুনলে কি করবে কিশোর? এমন একজন মানুষকে পাওয়া গেছে, যিনি সুড়ঙ্গগুলো চেনেন। বাবার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল বলে টাউন কাউন্সিলের ওপর যাঁর রাগ আছে।

তাড়াহুড়া করে নাস্তা সেরে বেরিয়ে গেল রবিন।

'খাইছে,' বলে উঠল মুসা, 'কিশোর, আজব কথা শোনাল তো রবিন!'

হেডকোয়ার্টারে জড় হয়েছে তিন গোয়েন্দা। আগে হেরিঙের খবর জানাল রবিন। তারপর বলল, 'বাড়ি থেকে সোজা লাইব্রেরিতে গিয়েছিলাম। ড্রাগনের ওপর যত বই পেয়েছি, ঘেঁটে দেখে এসেছি।'

রবিনের নোট বইয়ের গিজিগিজি লেখার দিকে তাকাল কিশোর এক পলক। 'কি জানলে? জ্যান্ত ড্রাগন আছে?'

মাথা নাড়ল রবিন। 'না। নো ড্রাগন। একটা বইতেও লেখেনি। এমন কি ড্রাগন আছে, এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহও প্রকাশ করেনি কেউ।'

'গাধা!' ফেটে পড়ল মুসা, 'ব্যাটারা আস্ত গাধা। বই যারা লিখেছে, কিছুদিন এসে সী-সাইডের গুহায় বাস করা উচিত তাদের। তাহলেই বুঝবে আছে কি নেই। ধরে ধরে যখন গিলবে...'

হাত তুলল কিশোর। 'আহ্ আগে রবিনের কথা শুনি। হ্যাঁ, তারপর, নথি?'

আবার নোটের দিকে তাকাল রবিন। 'একটি মাত্র ড্রাগনের নাম লেখা আছে, একমাত্র প্রজাতি, কমোডো ড্রাগন। বিশাল গিরগিটি, দশ-বারো ফুট লম্বা হয়। আমরা যেটাকে দেখেছি ওটার চেয়ে অনেক ছোট।'

'মানুষের মধ্যে দানব আছে না,' ফস করে বলল মুসা, 'ওটাও হয়তো তেমনি। একটা কমোডো ড্রাগনের গায়ে ভিটামিন বেশি জমেছে আর কি।'

'হুঁ, বলেছে তোমাকে,' অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল কিশোর। 'রবিন, বলো।'

'কিন্তু কমোডো ড্রাগনের নিঃশ্বাসের সঙ্গে আগুন বা ধোঁয়া কিছুই বেরোয় না,' রবিন বলল। 'ওয়েস্ট ইনডিজের ছোট্ট একটা দ্বীপ কমোডোতে ছাড়া দুনিয়ার আর কোথাও পাওয়াও যায় না। গুহায় যেটাকে দেখেছি, চেহারায়ও ওটার সঙ্গে কোন মিল নেই। জোর দিয়ে বলা যায়, ড্রাগন নেই পৃথিবীতে। ওই ধরনের কোন

জীব কাউকে আক্রমণ করেছে বলেও শোনা যায়নি। অথচ···' মুখ তুলল রবিন। 'আর পড়ব?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, পড়ো,' বলল কিশোর।

'অনেক জানোয়ার আছে, মানুষকে আক্রমণ করে, মেরে খেয়েও ফেলে অনেকে। এর একটা হিসেবও টুকে এনেছি। এই যে, রোগজীবাণুবাহী পোকামাকড়ের কারণে প্রতি বছর সারা পৃথিবীতে দশ লাখ মানুষ মারা যায়। চল্লিশ হাজার মরে সাপের কামড়ে, দুই হাজার বাঘে মারে, এক হাজার যায় কুমিরের পেটে, আরও এক হাজার হাঙরের শিকার হয়।' মুখ তুলল সে।

'মুসা, শুনলে তো,' কিশোর বলল। 'ড্রাগনের কথা কিন্তু এখানেও বলা হয়নি।···হ্যাঁ, রবিন, পড়ো।'

'অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের আক্রমণেও মরে মানুষ। হাতি, গণ্ডার, জলহস্তী, নেকড়ে, সিংহ, চিতা, হায়েনা—সুযোগ পেলে কিংবা কোণঠাসা হলে এদের কেউই মানুষ মারতে ছাড়ে না। এগুলোর মাঝে আবার মানুষখেকোও আছে কিছু।'

'ম্যান ইজ দা প্রে' বইতে জন ক্লার্ক লিখেছেন: মেরুভালুক, পুমা, অ্যালিগেটর, এমন কি কিছু কিছু ঈগলও মানুষকে আক্রমণ করে মেরে ফেলে। তবে সেটা খুব রেয়ার। টারানটুলা মাকড়সার কামড়েও মানুষ মরে, গ্রিজলি ভালুক আর গরিলাও মাঝেসাঝে মারে। সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গা হলো আফ্রিকা আর ভারতের জঙ্গল। সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা আয়ারল্যাণ্ড।' নোট বই বন্ধ করল রবিন।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সবাই।

মুসার দিকে ফিরল কিশোর। 'কোন মন্তব্য?'

মাথা নাড়ল মুসা। 'ক্লার্ক মিয়া সী-সাইডে আসেনি, এলে অন্য কথা বলত। ওসব বই-টইয়ের কথা কমই বিশ্বাস করি। নিজের চোখে ড্রাগন দেখে এলাম। ওরা বললেই হবে নাকি? বিশ্বাস করতে পারি, যদি তুমি দেখিয়ে দাও ওটা আসল নয়।'

'বেশ···' টেলিফোনের শব্দ বাধা দিল কিশোরকে। রিসিভারে হাত রাখল, তুলতে দ্বিধা করছে।

'তোলো,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল মুসা। 'গুহার ভূতটাই হয়তো করেছে আবার।'

মৃদু হেসে রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল কিশোর। 'হ্যালো?' অন করল স্পীকারের কানেকশন।

'হ্যালো,' পরিচিত কণ্ঠস্বর। 'ডেভিস ক্রিস্টোফার। কিশোর?'

'ও স্যার, আপনি। নিশ্চয় কুকুরের খোঁজ নিতে করেছেন?'

'হ্যাঁ,' স্পীকারে গমগম করছে ভারি কণ্ঠ। 'জোনসকে বড় মুখ করে বলেছি এ-রহস্যের সমাধান তোমরা করতে পারবেই। কুকুরের খোঁজ পেয়েছ?'

'এখনও পাইনি। তবে ড্রাগনটা দেখে এসেছি।'

'সত্যি আছে! তাহলে তো ড্রাগন বিশেষজ্ঞের সঙ্গেই তোমাদের আবার কথা বলা উচিত।'

'কে, স্যার?'

'কেন, আমার বন্ধু জোনস। বলেনি? সারাজীবন দৈত্য-দানব আর ড্রাগন নিয়েই ছিল তার কারবার।'

'হ্যাঁ, বলেছেন। সিনেমার জন্যে নাকি খেলনা ড্রাগন বানাতেন। ঠিক আছে, এখুনি ফোন করছি তাঁকে।'

'দরকার নেই। আমি লাইন দিচ্ছি। সে লাইনেই আছে। ফোন করে কুকুরের খবর জানতে চাইছিল।'

সেক্রেটারীকে নির্দেশ দিলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার।

কয়েক সেকেণ্ড খুটখাটের পর স্পীকারে ভেসে এল বৃদ্ধ পরিচালকের কণ্ঠ। 'হাল্লো, কিশোর?'

'হ্যাঁ, মিস্টার জোনস। আপনার কুকুরের খোঁজ এখনও পাইনি, তবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

'ভেরি গুড। এত তাড়াতাড়ি পাবে আশাও করিনি, তবু মন মানছিল না...'

'আপনার পড়শীদের কুকুরগুলো পাওয়া গেছে?'

'না। প্রায় একই সময়ে সবগুলো হারাল, এটাই অবাক লাগে।'

'হ্যাঁ।'

'আমার পড়শীদের সঙ্গে দেখা করেছিলে?'

'করেছিলাম দু-জনের সঙ্গে, যাদের কুকুর নেই। মিস্টার হেরিং আর মিস্টার মারটিন।'

'বলেছে কিছু?'

'আজব লোক দু-জনেই। মিস্টার হেরিং শটগান নিয়ে এসে গুলি করার হুমকি দিলেন। কুকুর দু'চোখে দেখতে পারেন না। তাঁর বাগান-টাগান নাকি সব নষ্ট করে ফেলে।'

হাসি শোনা গেল। 'ও এমনি ভয় দেখিয়েছে। মানুষ তো দূরের কথা, একটা ইঁদুর মারার ক্ষমতা নেই তার। মারটিন কি বলল?'

'ভয় তিনিও দেখিয়েছেন, তবে অন্য ভাবে।'

আবার হাসলেন বৃদ্ধ চিত্রপরিচালক। 'ওর বাড়ির আজব খেলনাগুলোর কথা বলছ তো? আসলে খুব রসিক লোক। এই রসিকতার জন্যে মস্ত ক্ষতি হয়ে গেছে তার। ভাল একটা চাকরি হারিয়েছে।'

মুসা ও রবিনের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল কিশোর।

'কি হয়েছিল?'

'সেটা বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা। সিটি প্ল্যানিং ব্যুরোতে ইঞ্জিনিয়ার ছিল সে। তার এক জন্মদিনে কি জানি কি করে সারা শহরের কারেন্ট ফেল করিয়ে দিল। তার বক্তব্য, শহরে আলোই যদি থাকল, কেকের ওপর মোম জ্বেলে কি লাভ?'

'তারপর?' আগ্রহী হয়ে উঠেছে কিশোর।

'কয়েক ঘণ্টা কারেন্ট বন্ধ থাকায় অনেকের অনেক রকম ক্ষতি হলো। বড় বড় কয়েকজন কর্তাব্যক্তি গেল খেপে। চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো মারটিনকে। শুধু তাই নয়, শহরে আর কোথাও যেন চাকরি না পায় সে ব্যবস্থা করে ছাড়ল।'

'তারপর আর চাকরি পাননি? চলেন কিভাবে?'

'ভাল ইঞ্জিনিয়ার, কাজ জানে। এটা-ওটা টুকটাক প্রাইভেট কাজ করে। সবই আজব ধরনের। তবে তাতে বিশেষ আয় হয় বলে মনে হয় না।'

'হুঁ। দেখে কিন্তু মনে হয় না অসুবিধেয় আছেন। খেলনা বানিয়ে মানুষকে ভয় দেখান, সুখেই তো আছেন।'

'ভয় দেখানোর রসিকতা সব সময় পছন্দ করে না লোকে। আচ্ছা, রাখি?'

'আরেকটা প্রশ্ন, স্যার। যে ড্রাগনটা দেখেছেন আপনি, সেটা কি গোঙায়?'

'নিশ্চয়ই। কি রকম যেন গোঁ গোঁ করে।'

'পাড়ে দাঁড়িয়ে নিচে গুহায় ঢুকতে দেখেছেন, না?'

'হ্যাঁ। রাতে দেখেছি তো, মনে হলো গুহায়ই ঢুকেছে। তবে ড্রাগন দেখেছি তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'থ্যাংক ইউ, স্যার। শিগগিরই যোগাযোগ করব আপনার সঙ্গে।'

লাইন কেটে গেল।

'মারটিন তাহলে ভাল লোক নন,' বলে উঠল মুসা। 'মানুষকে অহেতুক ভয় দেখানোটা আমারও ভাল লাগে না। বাজপাখিটার কথাই ধরো, ড্রাগনের চেয়ে কম কিসে···' তার কথায় কিশোরের কান নেই দেখে থেমে গেল।

বিড়বিড় করল কিশোর, 'মিস্টার জোনসের কথায় নড়চড় আছে।'

'অ্যাঁ!' ভুরু কুঁচকে গেল সহকারী গোয়েন্দার।

'মিথ্যুক বলতে চাও?' রবিনও অবাক।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'বলেছেন পাড়ে দাঁড়িয়ে ড্রাগনটাকে গুহায় ঢুকতে দেখেছেন।

ভুরু আরও কুঁচকে গেল মুসার। 'তাতে দোষটা হয়েছে কোথায়?' তাছাড়া শিওর হয়েছেন এ কথা তো বলেননি, বলেছেন মনে হলো।'

মাথা চুলকালো মুসা। কি জানি। বুঝতে পারছি না। শিওর হওয়া যায় কি ভাবে?'

'আজ বিকেলে আবার যাব গুহায়। আশা করি আজই ড্রাগন রহস্যের সমাধান করে ফেলতে পারব।'

চুপ করে রইল দুই সহকারী গোয়েন্দা।

'মিস্টার জোনসকেও সন্দেহের বাইরে রাখতে পারছি না আর,' বলে চলল কিশোর। 'আমাদের ভেবে দেখতে হবে, এই শহরের লোকের ওপর কার ব্যক্তিগত আক্রোশ রয়েছে; এবং কারা কারা গুহা আর সুড়ঙ্গগুলো চেনে। মিস্টার জোনস চেনেন। শহরবাসীর ওপরও আক্রোশ থাকতে পারে। হেরিঙ আর মারটিনের তো আছেই। এর সঙ্গে ড্রাগনটাকে যদি কোনোভাবে যোগ করতে পারি, খোলাসা হয়ে যাবে সব। দেখি আজ রাতে গুহায় গিয়ে।'

'আবার,' মিনমিন করল মুসা, জানে প্রতিবাদ করে লাভ নেই। কিশোর যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে যাবেই।

জবাব না দিয়ে সামনে রাখা প্যাডে খসখস করে কিছু লিখল গোয়েন্দাপ্রধান।

হাত বাড়াল ফোনের দিকে। 'ইস্, আরও আগেই মনে পড়া উচিত ছিল।'

চোদ্দ

'প্লীজ, মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারকে দিন,' ফোনে বলল কিশোর। 'বলুন কিশোর পাশা বলছি।'

শূন্য দৃষ্টিতে একে অন্যের দিকে তাকাল মুসা আর রবিন।

ভেসে এল চিত্রপরিচালকের ভারি কণ্ঠ, 'কি ব্যাপার, কিশোর?'

'স্যার, আপনার বন্ধু মিস্টার জোনস তো হরর ফিল্ম বানাতেন।'

'হ্যাঁ বাদুড়, মায়ানেকড়ে, ভ্যাম্পায়ার, ভূত-প্রেত, ড্রাগন···মানে যা যা মানুষকে ভয় দেখাতে পারে, সব।'

'আচ্ছা, তাঁর দানবগুলোকে কি ছবিতে আসল মনে হয়?'

'নিশ্চয়। না হলে লোকে সে সব দেখবে কেন?'

'দানবগুলো কে বানাত?'

'স্টুডিওতে ওই পেশার অনেক লোক আছে, তারাই।'

'কাজ হয়ে গেলে ওগুলো কি করে? ফেলে দেয়?'

'কিছু কিছু রেখে দেয়, পরে আবার কাজে লাগায়। কিছু নিলামে কিনে নিয়ে যায় লোকে, সংগ্রহে রাখে। বাকি সব নষ্ট করে ফেলা হয়।'

'স্যার, মিস্টার জোনসের কোন ছবি সংগ্রহে আছে আপনার? এমন কিছু, যাতে ড্রাগন আছে?'

'আছে একটা,' অবাক মনে হলো পরিচালকের কণ্ঠ। 'দেখতে চাও?'

'তাহলে খুব ভাল হয়, স্যার। ফিল্ম, না ক্যাসেট?'

'ফিল্ম।'

'তাহলে তো আপনার ওখানে গিয়েই দেখতে হয়। কখন সময় হবে, স্যার।'

'চলে এসো, এখুনি। চার নম্বর প্রোজেকশন রুমে থাকব আমি।' লাইন কেটে দিলেন পরিচালক।

আস্তে করে ক্রেডলে রিসিভার নামিয়ে রাখল কিশোর। দুই সহকারীর দিকে তাকাল। 'খুব ভালমত লক্ষ করবে, ছবির ড্রাগন কি করে না করে, আচার-আচরণ, স্বভাব। হয়তো পরে কাজে লাগতে পারে। কে জানে, প্রাণও বাঁচতে পারে।'

'মানে?' একই সঙ্গে প্রশ্ন করল রবিন আর মুসা।

'মানে?' আবার রিসিভারের দিকে হাত বাড়াল কিশোর। 'আমার ধারণা, সী-সাইডের দানবটা মানুষের বানানো।'

সময় মতই রোলস রয়েস নিয়ে পৌঁছল হ্যানসন। তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে চলল হলিউডে।

চার নম্বর প্রোজেকশন রুমে অপেক্ষা করছেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। মেশিনপত্র, ফিল্ম সব রেডি। ইশারায় তিন গোয়েন্দাকে চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন।

তারপর ইশারা করলেন মোশনম্যানকে।

শুরু হলো ছবি। কয়েক মিনিটেই ভুলে গেল ছেলেরা, কোথায় রয়েছে। সত্যি ছবি বানাতেন বটে মিস্টার জোনস। দর্শককে এভাবে সম্মোহিত করে ফেলার ক্ষমতা সব পরিচালকের থাকে না।

পর্দায় চলছে একটা গুহার দৃশ্য। ঝাঁকুনি দিয়ে বেরোল একটা মুখ, গুহামুখ জুড়ে দাঁড়াল। বিশাল দানব। এতই আচমকা ঘটল ঘটনাটা, চমকে উঠল তিন গোয়েন্দা। তাদের মনে হলো, যেন সত্যি সত্যি একটা ড্রাগন তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

কানফাটানো গর্জন করে উঠল দানবটা। হাঁ করতেই দেখা গেল বড় বড় বাঁকা ধারাল দাঁত।

'খাইছে!' চেয়ারের পেছনে পিঠ চেপে ধরল মুসা। 'আসল ড্রাগন। জ্যান্ত।'

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ড্রাগন। চেয়ারের হাতল খামচে ধরল রবিন।

কিশোর শান্ত। গভীর মনযোগে দেখছে ড্রাগনের প্রতিটি নড়াচড়া। ছবির গল্পের দিকে তার কোন খেয়াল নেই।

স্তব্ধ হয়ে ছবিটা শেষ পর্যন্ত দেখল ওরা। ছবি শেষে উজ্জ্বল আলো জ্বলার পরও বিমূঢ় হয়ে রইল কিছুক্ষণ, যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছে।

মিস্টার ক্রিস্টোফার নেই। কোন এক ফাঁকে চলে গেছেন তাঁর অফিসে।

সেদিকে চলল তিন গোয়েন্দা। পায়ে জোর নেই যেন, কাঁপছে।

'সব্বোনাশ, কিশোর!' প্রথম কথা বলল মুসা। 'গতরাতে যেটা দেখেছি ঠিক ওই রকম। যেন জ্যান্তটাই এনে ছবিতে বসিয়ে দিয়েছে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'গুণী লোকের কাজই এমন। একটা ছবি দেখেই বোঝা গেল কতখানি দক্ষ পরিচালক ছিলেন মিস্টার জোনস। আরিব্বাপরে, কি ছবি! ভয় পাবে না এমন মানুষ কম আছে।'

ফাইলে ডুবে ছিলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার, ছেলেদের সাড়া পেয়ে মুখ তুললেন। 'কেমন দেখলে?'

মাথা কাত করল কিশোর। 'সাংঘাতিক।'

অনেক প্রশ্নের ভিড় জমেছে মনে, এক এক করে করার ইচ্ছে ছিল তার, কিন্তু পরিচালককে ব্যস্ত দেখে আর করা হলো না। এমনিতেই তাঁর অনেক সময় নষ্ট করেছে ওরা। ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল অফিস থেকে।

রোলস রয়েসে উঠে রকি বীচে ফিরে যেতে বলল কিশোর। স্টুডিও থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে এল হ্যানসন।

'ভালমত লক্ষ করতে বলেছিলে,' রবিন বলল, 'করেছি। মুসা ঠিকই বলেছে, গতকাল যেটাকে গুহায় দেখেছি তার সঙ্গে কোন পার্থক্য নেই।'

'কিছুই না?' কিশোরের প্রশ্ন।

'না, কেবল ওই গর্জনটা বাদে,' মুসা জবাব দিল। 'ছবিরটা বেশি গর্জাচ্ছিল, আর গুহারটা গোঙাচ্ছিল; আর মাঝে মাঝে ছোট ছোট কাশি।'

একদম ঠিক। তুড়ি বাজাল কিশোর।

'গুহার ওটার ঠাণ্ডা লেগেছে বোধহয়।'

'ড্রাগনের ঠাণ্ডা লাগে কি করে? ব্যাঙের সর্দির মত হয়ে গেল না ব্যাপারটা? ড্রাগনটা থাকে পানিতে আর ভেজা গুহায়। ঠাণ্ডা লাগে কি করে?'

জবাব দিতে পারল না দুই সহকারী গোয়েন্দা।

'আশা করি, আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভেদ করে ফেলব কাশির রহস্য,' বলল কিশোর। 'আর সেটা পারলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে অনেক কিছু।'

'যদি ততক্ষণ জীবিত থাকি,' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল মুসা। 'ড্রাগনের পেটে চলে না যাই।'

'বলা যায় না,' রহস্যময় কণ্ঠে বলল কিশোর, 'শেষ পর্যন্ত ড্রাগনের পেটেও ঢুকতে হতে পারে আমাদের!'

পনেরো

'ড্রাগনের পেটে!' আঁতকে উঠল মুসা। 'কি বলতে চাও তুমি, কিশোর? কিছু একটা ভাবছ, বুঝতে পারছি। এ রকম অন্ধকারের মধ্যে রেখে খুলে বলো না। হাজার হোক, আমরা তোমার সহকারী। তুমি যেমন মরতে যাচ্ছ, আমরাও যাচ্ছি। জানার অধিকার আমাদের আছে। কি বলো, রবিন?'

হাসল গবেষক। 'তা তো নিশ্চয়। বলো, কিশোর। আগে থেকে জানা থাকলে হুঁশিয়ার থাকতে পারব। আমরা মরে গেলে এত ভাল সহকারী আর কোথায় পাবে?'

রবিনের শেষ কথাটায় কিশোরও হাসল। 'আসলে আমি নিজেই শিওর না। ঝুঁকি একটা নিতে যাচ্ছি আর কি।'

জোরে মাথা নাড়ল মুসা। 'না জেনে কোন ঝুঁকি নিতে রাজি না আমি। বলতে ভুলে গেছি, গতরাতে একটা ছবি দেখেছি বাসায়। একটা সাইন্স ফিকশন। বোকার মত না বুঝে ঝুঁকি নিয়েছেন এক বিজ্ঞানী, প্রাণটা খোয়াতে হয়েছে তাঁকে।'

ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'কি ছবি?'

দাঁত বের করে হাসল মুসা। 'পোকামাকড়।'

'পোকামাকড়?'

'পিঁপড়ে আর সামান্য বিষাক্ত পোকা দুনিয়া দখল করতে চায়। যে ছবিটা এইমাত্র দেখে এলাম তার চেয়ে কম ভয়ঙ্কর নয়। একশো ফুট লম্বা একেকটা পিঁপড়ে, পঞ্চাশ ফুট উঁচু। বড় বিল্ডিঙের সমান।'

'করে কিভাবে এটা?' আনমনে বলল কিশোর।

আসল পিঁপড়ে দিয়ে।

'আসল পিঁপড়ে?' রবিন বিশ্বাস করতে পারছে না। 'কিভাবে, জানো?'

'বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,' মুসা বলল।

'বলেছেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'বলেছে। আতস কাচের ভেতর দিয়ে প্রথমে পিঁপড়ের ছবি তোলে। তারপর বড় করে ছবিকে, সুপার ইমপোজ করে, সেগুলোকে আবার বিল্ডিঙের ছবির পটভূমিকায় রেখে ছবি তোলে। পর্দায় দেখে মনে হয় জ্যান্ত পিঁপড়েগুলো একেকটা

বিল্ডিঙের সমান। যে ছবিটা দেখেছি, তার গল্পটা হলো মহাকাশের কোন এক গ্রহ থেকে এসে হাজির হয়েছে একদল পোকামাকড়...'

মাঝপথে থেমে গেল মুসা।

শুনছে না কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা শুরু হয়েছে, তারমানে গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে। হঠাৎ যেন ডুব দিয়ে উঠে এল ভাবনার জগৎ থেকে। 'ছবিটা দেখেছ?'

'বললামই তো,' হাত নাড়ল মুসা।

'ফিল্ম, না ক্যাসেট?'

'ফিল্ম। দেখতে চাও? চলো আজ রাতে।'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'রাতের আগেই দরকার হতে পারে ওটা।' ঘড়ির দিকে তাকাল। 'তোমাদের প্রোজেকটরে দেখেছ, না?'

কিশোরের কথা বুঝতে পারছে না মুসা। 'তো আর কারটা দিয়ে দেখব?'

আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর, 'জিনিসটা হয়তো আমাদের প্রাণ বাঁচাতে সাহায্য করবে। হয়তো রহস্যের সমাধান করতে পারব। মুসা, আজ রাতের জন্যে প্রাজেকটরটা আনতে পারবে?'

চোখ মিটমিট করল মুসা। 'কেন, আমাদের বাড়ি গিয়ে দেখতে অসুবিধে কি?'

'হ্যাঁ। ছবিটা কাউকে দেখাতে চাই। ওই ছবিই এখন আমার দরকার।'

মাঝেমাঝে রহস্য করে কথা বলা কিশোরের স্বভাব। রবিন আর মুসাও বুঝতে পারে না তখন তার কথার অর্থ।

নাক ডললো মুসা। 'আনা যাবে। মাকে বললেই দিয়ে দেবে। তবু বাবাকে একবার জিজ্ঞেস করে নিলে ভাল, তার জিনিস তো।'

'ঠিকই বলেছ,' বলল কিশোর। 'আংকেলকে ফোন করে অনুমতি নিয়ে নাও।'

'ধরে নাও, প্রোজেকটর পেয়ে গেছ,' মুসা বলল। 'তবে তার আগে জানতে হবে, আজ রাতে কি করতে যাচ্ছি আমরা। অন্ধকারে থাকতে রাজি না আমি।'

রবিনও মুসার সঙ্গে একমত হলো।

দু-জনেই তাকাল কিশোরের দিকে।

দ্বিধা করল কিশোর। ধড়াস করে দুই হাত ফেলল টেবিলে। 'আমার নিজের কাছেই স্পষ্ট নয় এখনও ব্যাপারটা। পুরো রহস্যটাই কেমন যেন অদ্ভুত, ঘোরাল। শুরু করেছি কুকুর হারানো দিয়ে, জড়িয়ে পড়েছি ড্রাগন শিকারে।'

'বার বার একটা কথাই বোঝাতে চাইছ, ড্রাগনটা নকল,' রবিন বলল। 'কেন এই সন্দেহ?'

'অনেক কারণে। গুহাটা আসল নয়। পুরানো সুড়ঙ্গটা আসল নয়। গুহামুখ আসল নয়। ড্রাগনটাও আসল হওয়ার কোন কারণ নেই।'

'এসব তো খেয়াল করিনি!' বিস্ময় ঢাকতে পারল না রবিন।

'প্রথমে গুহার কথাই ধরো। তক্তা সরিয়ে একটা ছোট গুহায় ঢুকলাম।'

'হ্যাঁ, অদ্ভুত চোখে তখন তাকিয়েছিলে আমার দিকে। আসল নয় বুঝলে কি করে?'

'গুহাটা পুরানো সন্দেহ নেই। চোর-ডাকাতের আড্ডা ছিল। কিছু কিছু তক্তাও পুরানো।'

'কিছু কিছু?' কথাটা ধরল মুসা। 'সব নয় কেন?'

'সবগুলো পুরানো নয়, সে জন্যে। যে তক্তা আমরা সরিয়েছি ওগুলো পুরানো। কিন্তু পাশেই আরও কিছু রয়েছে, যেগুলো অনেক পরে লাগানো হয়েছে। প্লাইউড। মাত্র এই সেদিন আবিষ্কার হয়েছে। ওগুলো প্রাচীন চোর-ডাকাতেরা লাগায়নি। পায়ইনি. লাগাবে কোত্থেকে?'

'প্লাইউড?' ভুরু কাছাকাছি হলো মুসার। 'তা নাহয় হলো। কিন্তু তাতেই কি প্রমাণ হয় সব কিছু নকল?'

'না হলে আরও প্রমাণ আছে। তারপরের গুহাটার কথা ধরো। বড় গুহাটা, রবিন যেটা আবিষ্কার করেছে, সেটার দরজাটা কি প্রাকৃতিক? মোটেও না, মানুষের তৈরি। বড় গুহাটার শেষ মাথায় কি দেখলাম? দেয়াল। অন্য পাশে যাওয়ার পথ নেই। অথচ আমরা আশা করেছিলাম ওই গুহা ধরে এগিয়ে গেলে একটা সুড়ঙ্গ-টুড়ঙ্গ পাব। কি মনে হয়?'

একমত হলো দুই সহকারী।

'ছুরি দিয়ে খোঁচাচ্ছিলে, মনে পড়ছে,' মুসা বলল। 'পাথরে ঘষে নষ্ট করেছিলে ছুরিটা?'

পকেট থেকে ছোট ছুরিটা বের করল কিশোর। 'নিজেই দেখো।'

'কি লেগে আছে ফলায়?'

'শুঁকে দেখো।'

'আরি! রঙ!' চেঁচিয়ে উঠল গোয়েন্দা-সহকারী।

রবিনও শুঁকে একমত হলো।

ভাঁজ করে আবার ছুরিটা পকেটে রেখে দিল কিশোর। 'পুরানো গুহার দেয়ালে বাড়িঘরের মত রঙ করা হয়, শুনেছ কখনও? ছুরির আঁচড়ের দাগ বসেছে দেয়ালে। আমার অনুমান, ওটা পাথরের দেয়াল নয়, প্ল্যাসটারবোর্ড। তার ওপর ধূসর রঙ করা হয়েছে। এবং তার ওপর বালি আর পাথরের কণা এমনভাবে লাগিয়েছে, দেখে মনে হয় আসল দেয়াল।'

'মানে?' রবিন বলল। 'অন্য পাশের কোন মূল্যবান আবিষ্কার লুকিয়ে রাখতে চাইছে কেউ?'

'হতে পারে।'

'ঠিক,' আঙুল তুলল মুসা। 'পুরানো সুড়ঙ্গটা হয়তো কেউ আবিষ্কার করে ফেলেছে। জানাজানি হলে লোকে ভিড় করে নষ্ট করে ফেলবে, তাই লুকিয়ে রাখতে চাইছে।'

'নাকি আগের চোর ডাকাতেরাই কোন কারণে ওই দেয়াল লাগিয়েছিল?' রবিনের প্রশ্ন।

'না।' মাথা নাড়ল কিশোর। 'প্ল্যাসটারবোর্ড ছিল না তখন।'

চুপ হয়ে গেল রবিন।

'আরেকটা ব্যাপার,' কিশোর বলল, 'আমরা ঢুকেছি চিচিং ফাঁক দিয়ে। কিন্তু ড্রাগনটা?'

ঢোক গিলল মুসা। 'নিশ্চয় পাহাড়ের আরেকটা চিচিং ফাঁক দিয়ে ঢুকেছে। আমাদের চোখে পড়েনি ওটা।'

'তাহলে ওই দরজা কে বানাল? কি সিসটেমে খোলে ওটা?'

'নিশ্চয় ড্রাগনটা জানে,' মুখ ফসকে বলে ফেলল রবিন।

'অনেকটা সে রকমই। বলেছি তো, সব নকল। ওই ড্রাগনটাও। গিয়ে দেখোগে, মানুষে চালায় ওটা।'

চোখ মিটমিট করল মুসা। রবিনের দিকে তাকিয়ে নিল একবার চট করে। আবার কিশোরের দিকে ফিরল, 'কি বলছ?'

'যা বলা উচিত, তাই।'

'তোমার ধারণা,' উত্তেজনায় লাল হয়ে গেছে রবিনের মুখ, 'আমাদের কেশো ড্রাগনটা একটা রোবট?'

'এখনও শিওর না। হতে পারে। আর তা হয়ে থাকলে, পাহাড়ের যে দরজা দিয়ে ওটা ঢোকে, সেটা মানুষের তৈরি। সিনেমায় যেমন করে বানানো হয়।'

রোলস রয়েসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মুসা। 'আজ রাতে দরজাটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব। কিশোরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, ড্রাগনটা আসল নয় কিভাবে বুঝলে?'

সীটে হেলান দিল কিশোর, কোলের ওপর রাখল দুই হাত। 'ড্রাগনটা যখন সামনে এল, কি দেখলাম, কি শুনলাম, মনে করার চেষ্টা করো।'

চুপ করে ভাবতে লাগল রবিন আর মুসা।

'গুঞ্জন,' অবশেষে বলল রবিন। 'আর গোঙানি। মাঝে মাঝে কাশি।'

'উজ্জ্বল আলো দেখেছি,' মুসা যোগ করল। 'সার্চ লাইটের মত।'

'হ্যাঁ। আর চলে কিভাবে খেয়াল করেছ?'

'খুব দ্রুত।'

রবিনের দিকে ফিরল কিশোর, 'কিভাবে চলে?'

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছল রবিন। 'মুসা ঠিকই বলেছে, খুব দ্রুত ছোটে। যেন উড়ে যায়।'

'সিনেমায় যে ড্রাগনটা দেখলাম, ওটা কি ওভাবে চলে?'

মাথা নাড়ল রবিন। 'না, ওটা হাঁটে। আমাদেরটা ওড়ে।'

'দেখে ও রকমই লাগে বটে, আসলে ওড়ে না। ওটার চেহারাটাই শুধু ড্রাগনের মত, কাজেকর্মে অন্যরকম। মানুষকে ভয় দেখানোর জন্যে কিংবা দূরে সরিয়ে রাখার জন্যেই ও রকম চেহারা তৈরি করা হয়েছে। আর ওড়ে মনে হয় কেন বলো তো? চাকায় ভর করে চলে বলে। সৈকতের বালিতে চাকার দাগ দেখেছিলাম মনে আছে?'

হাঁ করে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল দুই সহকারী।

'ড্রাগনের আবার চাকা!' বিড়বিড় করল মুসা।

তার সঙ্গে যোগ করল রবিন, 'আরও একটা ব্যাপার, মিস্টার জোনসের সিনেমার ড্রাগন গর্জন করে, আর আমাদেরটা গোঙায়, কাশে।'

'হ্যাঁ,' মুচকি হাসল কিশোর। 'মানুষের তৈরি বলেই এই কাণ্ড করে। কাশিটা ড্রাগনের না হয়ে মানুষেরও হতে পারে।'

'মানে?' বুঝতে পারছে না মুসা।

হাসি বিস্তৃত হলো কিশোরের। 'ওই ড্রাগনের ভেতরে বসা কোনো একজন মানুষের হয়তো ঠাণ্ডা লেগেছে, খুকুর খুকুর সে-ই করে…'

বেরসিকের মত বাধা দিল হ্যানসনের কণ্ঠ, 'ইয়ার্ডে পৌঁছে গেছি।'

নামতে গেল কিশোর।

জিজ্ঞেস করল শোফার, 'আমি থাকব?'

'হ্যাঁ, থাকুন। কয়েকটা জিনিস নিতে হবে আমাদের। আজ রাতে আবার সী-সাইডে যাব।'

ষোলো

ছবিটার কিছু অংশ আগেই দেখে নেয়ার ইচ্ছে কিশোরের।

প্রোজেকটর চালাচ্ছে মুসা। ফিতে গুটিয়ে নিয়ে সুইচ টিপল মুসা। পর্দায় ফুটল ছবি। বাড়িয়ে বলেনি সে। রবিন আর কিশোরও দেখল; ঠিকই, বিশাল সব পিঁপড়ে ভয়ানক ভঙ্গিতে চলাফেরা করছে পর্দায়।

মিনিটখানেক পরই থেমে গেল প্রোজেকটর। অন্ধকারে মুসার গলা শোনা গেল, 'রবিন, লাইটটা জ্বালবে, প্লীজ?'

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ভুল ফিল্ম লাগিয়েছি,' জবাব দিল মুসা। 'এটা ছয় নম্বর। অনেক পরের সিরিয়াল।'

'সিনেমা দেখতে বসিনি, মুসা,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'এটাতেই চলবে। চালাও।'

'প্রথমটা দেখো। ওটাতেও অনেক ভয়ঙ্কর ব্যাপার-স্যাপার আছে। পিঁপড়েরা কি করে শহর আক্রমণ করে…'

'দরকার নেই। যেটা দেখছি এটাই ভাল। মনে হবে গুহা আক্রমণ করতে আসছে পিঁপড়েরা।'

অবাক হলো দুই সহকারী।

'মনে হবে?' বুঝতে পারল না মুসা।

'হ্যাঁ, হবে।'

'হবে মানে…' হঠাৎ বুঝে ফেলল মুসা, 'ড্রাগনের গুহায় ছবি দেখাতে যাচ্ছি নাকি আমরা?'

'হ্যাঁ। প্রোজেকটরটা ভাল, আমাদের কাজের উপযুক্ত। বিল্ট-ইন স্পীকার রয়েছে, শব্দ সৃষ্টি করতে কোনো অসুবিধে হবে না। চলেও ব্যাটারিতে। গুহায়

গিয়ে চমৎকার চালাতে পারব।

'বাবার কাজের জিনিস তো, পোর্টেবল, এখানে ওখানে নিয়ে যায়। দেখে-শুনেই কিনেছে।'

'হয়েছে, কথা থামিয়ে ছবিটা দেখি, এসো,' বলে উঠল রবিন। 'চালাও।'

আবার চলল প্রোজেকটর।

তাজ্জব হয়ে পিঁপড়েদের কাণ্ডকারখানা দেখল রবিন আর কিশোর।

শেষ হলো রীলটা। প্রোজেকটর বন্ধ করে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'আরেকটা চালাব?'

অন্ধকারে হেসে বলল কিশোর, 'না এটাতেই চলবে।'

আলো জ্বালল রবিন।

ফিল্ম গুটিয়ে নিতে নিতে মুসা বলল, 'কি করতে চাইছ তুমি, বলো তো? পিঁপড়ের ছবি দেখিয়ে গুহার ভূত তাড়াবে?'

'ধরো, অনেকটা ওই রকমই। তবে রসিকতার জবাব রসিকতা দিয়ে দিলে কি ঘটে আমার দেখার খুব ইচ্ছে।'

'রসিকতা?' রবিন জানতে চাইল, 'আমাদের চেনা কাউকে সন্দেহ করছ?'

'মিস্টার হেরিঙ?' মুসার প্রশ্ন।

'না,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'ড্রাগনটা তিনি বানাননি। শটগান হাতে যে হুমকি দিচ্ছিলেন, সেটাও রসিকতা মনে হয়নি।'

'এত শিওর হচ্ছ কি করে?' মুসা চোখ নাচাল।

'কথা বলার সময় প্রচুর চেঁচামেচি করেছেন মিস্টার হেরিঙ, কিন্তু কাশেননি। ঠাণ্ডা লাগেনি তাঁর। কিন্তু মারটিনের লেগেছিল। কথা বলার সময় কাশছিলেন।'

'ড্রাগনটা তাঁরই কীর্তি বলতে চাইছ?'

'বানালে অসুবিধে কি?' হাত নাড়ল কিশোর। 'এসব কাজে তো তিনি ওস্তাদ।'

'কিন্তু স্বার্থটা কি? নিজের বাড়িতে নানা রকম খেলনা বানিয়েছেন, সেটা আলাদা কথা। অনুমতি না নিয়ে কেউ ঢুকে পড়লে তাকে তাড়াতে কাজে লাগে। গুহায় ড্রাগন ঢোকাতে যাবেন কেন? গুহাটা তাঁর সম্পত্তি নয়। ওখান থেকে লোক তাড়ানোরও কোন প্রয়োজন নেই।'

'আছে, কিনা সেটাই দেখতে যাব আজ। তবে মিস্টার জোনসের কাজও হতে পারে। ড্রাগন বানানোর অভিজ্ঞতা তাঁরও আছে।' হাতঘড়ির দিকে তাকাল কিশোর। 'তৈরি হওয়া দরকার।'

'এক মিনিট,' হাত তুলল মুসা। 'তোমার ধারণা, জোনস কিংবা মারটিন দু-জনের একজন বানিয়েছেন ড্রাগনটা। বেশ। কিন্তু সেদিন যে দু-জন ডুবুরীকে গুহায় ঢুকতে দেখলাম, তারা কারা?'

'হ্যাঁ, তারা কারা?' রবিনেরও জিজ্ঞাসা।

প্রোজেকটর বাক্সে ভরে ফেলেছে মুসা। তালা আটকে দিয়ে মুখ তুলে তাকাল কিশোরের দিকে। 'বলো, কারা?'

'সেটাও আজ রাতেই জানতে পারব।' হেসে বলল কিশোর, 'বেশ ভাল

একখান সিনেমা দেখতে পাবে ওরা।'

'আর ড্রাগনটাও যদি আসে?'

'তাহলে তো আরও ভাল, আরেকটা পরীক্ষা হয়ে যাবে,' রহস্যময় কণ্ঠে বল্ল কিশোর। 'ভয় দেখিয়ে ইঁদুর যে হাতি তাড়িয়েছে সেই গল্পটা শোনোনি? ইঁদুর যদি হাতি তাড়াতে পারে, পিঁপড়ে কেন ড্রাগন তাড়াতে পারবে না?'

সৈকতের পাশে পাড়ের ওপরে অন্ধকার। শান্ত পথের মোড়ে গাড়ি রাখল হ্যানসন।

সবার আগে নামল রবিন। নির্জন পথের এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল কেউ আছে কিনা। 'এত দূরে রাখতে বললে কেন?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল সে। 'সিঁড়ি তো অনেক দূরে।'

ভারি বোঝা নিয়ে কোনমতে বেরোল মুসা, প্রোজেকটরের ভারে নুয়ে পড়েছে। 'আল্লারে, কি ভার, হাত না লম্বা হয়ে যায়!'

'ভালই তো,' হেসে বলল রবিন। 'গরিলা হয়ে যাবে। তোমাকে দেখলে ভয়ে পালাবে তখন ড্রাগন।'

জবাবে গোঁ গোঁ করে কি বলল গোয়েন্দা-সহকারী, স্পষ্ট হলো না। বোঝাটা কাঁধে তুলে নিল।

'দেখি,' হাত বাড়াল কিশোর, 'আমাকেও কিছু দাও।'

মাথা নাড়ল মুসা। 'নো থ্যাঙ্কস্, আমিই পারব। কষ্টটা যদি কাজে লাগে তাহলেই খুশি?'

'তোমার খুশি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি,' হাসল কিশোর।

হ্যানসনকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে নির্জন পথ ধরে দ্রুত হেঁটে চলল তিনজনে। মেঘে ঢাকা পড়েছে চাঁদ। সৈকতে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের গর্জন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

সিঁড়ি থেকে বিশ কদম দূরে থাকতে কানে এল পদশব্দ।

'জলদি লুকাও!' বলতে বলতেই ভারি বোঝা নিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল মুসা। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল ছোট্ট একটা হালকা ঝোপের দিকে।

তাকে অনুসরণ করল অন্য দুই গোয়েন্দা।

কাছে আসছে পায়ের আওয়াজ। আরও কাছে এসে কমে গেল গতি, কেমন যেন অনিশ্চিত। কিছু সন্দেহ করেছে? গায়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এল ছেলেরা।

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল আবছা ছায়াটা···কাছে, আরও কাছে···দুই কদম পাশে সরলেই এসে পড়বে একেবারে গায়ের ওপর···

দুরুদুরু করছে গোয়েন্দাদের বুক। মোটা ওই মানুষটাকে আগেও দেখেছে। চোখ চলে গেল তাঁর হাতের দিকে। আছে সেই ভয়ঙ্কর চেহারার ডাবল-ব্যারেল শটগানটা। মিস্টার জন হেরিঙ; যিনি কুকুর দেখতে পারেন না, বাচ্চাদের ভালবাসেন না, পছন্দ করেন না দুনিয়ার কোন কিছুই।

মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছেন তিনি, বোঝা যায় কিছু সন্দেহ করেছেন। 'অবাক কাণ্ড!' আপনমনেই বিড়বিড় করলেন। 'নড়তে যে দেখেছি তাতে কোন ভুল

নেই…'

আরেকবার মাথা নেড়ে, ভাবনা ঝেড়ে ফেলে হাঁটতে শুরু করলেন।

পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে যাওয়ার পরও খানিকক্ষণ নড়ল না ওরা।

অবশেষে মাথা তুলল রবিন। 'হউফ!' করে মুখ দিয়ে বাতাস ছেড়ে বলল, 'বাঁচা গেল! আমি তো ভাবলাম, দেখেই ফেলেছেন।'

'আমিও,' মুসা বলল। 'কিন্তু বন্দুক নিয়ে কি করতে বেরিয়েছেন? খুঁজছেন কাউকে?'

'এসো,' নিচু কণ্ঠে ডাকল কিশোর। 'যাই। মিস্টার হেরিঙ অনেক দূরে চলে গেছেন। এই সুযোগ, সিঁড়ি দিয়ে নেমে পড়া দরকার। মাথা নামিয়ে রাখো।'

সিঁড়ির কাছে প্রায় ছুটে চলে এল ওরা।

ভালমত দেখে বলল মুসা, 'কেউ নেই।'

নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নামল তিনজনে। হাঁপ ছাড়ল। ঢেউয়ের গর্জন এখন তাদের পায়ের শব্দ ঢেকে দেবে, কারও কানে পৌঁছবে না।

'চলো, জলদি চলো,' তাড়া দিল মুসা। 'গুহায় ঢুকি। দেখি গিয়ে সিনেমা কেমন পছন্দ ড্রাগনের।'

'যদি সে বাড়িতে থেকে থাকে,' কিশোর যোগ করল।

'না থাকলেই আমি খুশি,' রবিন বলল। 'আমার আকর্ষণ ওই সুড়ঙ্গ।'

গুহার কাছে এসে গতি কমাল দুই সহকারী গোয়েন্দা। কিন্তু তাদেরকে অবাক করে দিয়ে এগিয়েই চলল কিশোর।

'এই কিশোর, এটাই তো,' রবিন বলল।

নীরবে ঘাড় নেড়ে সায় দিল কিশোর। ইঙ্গিতে দেখাল ঠেলে বেরিয়ে থাকা চূড়াটা। 'ও পাশে রয়েছে বড় গুহাটার মুখ। চলো দেখি, খুঁজে বের করতে পারি কিনা।'

চূড়ার নিচে এসে থামল ওরা। মাথার ওপরে তিনটে বিশাল পাথরের চাঙড় চূড়ার গায়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রয়েছে।

'বোধহয় ওগুলো নকল,' আনমনে বলল কিশোর। 'মুসা, নাগাল পাবে তুমি। চাপড় দিয়ে দেখো তো। মনে হয় এর নিচেই দরজা, লুকিয়ে রাখা হয়েছে।'

এগিয়ে গিয়ে একটা পাথরে চাপড় দিল মুসা। ভোঁতা, ফাঁপা শব্দ। মুচকে হেসে বলল, 'ঠিকই বলেছ। পাথর নয়, নকল। সিনেমার স্টুডিওতে যেমন তৈরি করে, হালকা কাঠ, প্লাস্টার আর তার দিয়ে।'

মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। 'চলো তোমাকে গুহায় রেখে আসি। তারপর আমি আর রবিন ঘুরতে বেরোব।'

'কী?' চমকে উঠল মুসা। 'আমাকে একা…'

'আমাদের চেয়ে অনেক নিরাপদে থাকবে তুমি,' ভরসা দিল কিশোর। এগোল প্রথম গুহামুখের দিকে। 'আমাদের কাজ অনেক বেশি বিপজ্জনক। গ্যাঁট হয়ে বসে থাকবে চুপচাপ, সিনেমা দেখানোর জন্যে তৈরি হয়ে।'

বিস্ময় গেল না মুসার। আশেপাশে তাকাল। 'দেখাব কাকে? বাদুড়-টাদুড়

কোন কিছু…'

জবাব না দিয়ে গুহায় ঢুকে পড়ল কিশোর। পেছনে রবিন। মুসাকেও ঢুকতে হলো।

ছোট গুহাটার সামনের তক্তা সরিয়ে ফেলল কিশোর। সাবধানে ঢুকল ভেতরে। অনুসরণ করল সহকারীরা। তক্তাটা আবার আগের জায়গায় লাগিয়ে রাখল সে।

নরম শিস দিয়ে উঠল কিশোর। 'এই যে, আমাদের জিনিসপত্র, যেগুলো ফেলে গিয়েছিলাম। থাক, যাওয়ার সময় নেব। রবিন, দেখো তো পাথরটা আবার খুলতে পারো কিনা।'

এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে বসল রবিন। সামান্য চেষ্টার পরেই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, 'পেয়েছি।'

ঘড়ঘড় করে ঘুরে গেল পাথরের দরজা, ওপাশে ঢোকার পথ মুক্ত।

'মুসা,' কিশোর বলল, 'এখানেই থাকো। এই ফাঁক দিয়ে প্রোজেকটরের মুখ বের করে গুহার দেয়ালে ছবি ফেলবে। ফাঁকে পাথর আটকে দিচ্ছি, পুরোপুরি আর বন্ধ হবে না দরজাটা। আমি সঙ্কেত দিলেই ছবি শুরু করবে।'

পা ছড়িয়ে আরাম করে বসে প্রোজেকটর খুলতে শুরু করল মুসা। টর্চের আলোয় ফিল্মের ক্যানটা দেখল, সিধে করে নিয়ে মেশিনে ফিতে পরাতে পরাতে বলল, 'ঠিক আছে। সঙ্কেতটা কি?'

ভেবে নিয়ে বলল কিশোর, 'বাঁচাও! বাঁচাও!'

সতেরো

মুসাকে রেখে বিশাল গুহায় বেরিয়ে এল কিশোর আর রবিন। এগিয়ে চলল। বাতাস ভেজা ভেজা, ঠাণ্ডা, গায়ে কাঁটা দিল ওদের।

খানিকটা এগিয়ে বলে উঠল রবিন, 'আরি!'

'কি?'

'খোলা।' আলো ফেলল সামনে। ধূসর ছড়ানো দেয়ালের মাঝে একটা ফোকর। কিংবা বলা যায় মস্ত এক ফাঁক, মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত।

'রবিন, মনে হয় হারানো সুড়ঙ্গটা পাওয়া গেল।'

খুব সাবধানে ফাঁক দিয়ে অন্যপাশে বেরিয়ে এল ওরা।

সুড়ঙ্গ এখানে আরও বেশি চওড়া, উচ্চতা বেশি। লম্বা হয়ে চলে গেছে সামনে। যতদূর দৃষ্টি চলে, কিছু নেই, তারপরে অন্ধকার।

আরও কিছুদূর এগিয়ে থমকে দাঁড়াল দু-জনে। ধড়াস করে উঠল বুকের মধ্যে। খাড়া হয়ে গেল ঘাড়ের রোম।

সুড়ঙ্গের আবছা অন্ধকারে হুমড়ি খেয়ে আছে বিরাট এক ছায়া, শান্ত, নিথর।

প্রায় ঝাঁপ দিয়ে মেঝেতে পড়ল ওরা। উপুড় হয়ে শুয়ে হাঁপাতে লাগল। জোরে নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয় পাচ্ছে।

চুপ করে আছে তো আছেই। কিছুই ঘটল না।

ড্রাগনটা যেমনি ছিল তেমনি রয়েছে। লম্বা গলার ডগায় বসানো মাথাটা লুটিয়ে আছে মাটিতে।

'ঘু-ঘুমোচ্ছে,' ফিসফিস করে বলল রবিন।

মাথা নাড়ল কিশোর। কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে। 'ভুলে যাও কেন, আসল না-ও হতে পারে।'

'সেটা তোমার ধারণা। হতেও পারে।'

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ওরা। তারপর টর্চ জ্বালল কিশোর। ধীরে ধীরে আলোকরশ্মি এগিয়ে নিয়ে গেল ড্রাগনের দিকে। হঠাৎ হাসি ফুটল মুখে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। 'ড্রাগনের নিচের দিকে দেখো, পায়ের জায়গায়,' পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে গেছে কণ্ঠস্বর।

চোখ মিটমিট করল রবিন। বিশ্বাস করতে পারছে না। 'লাইন! রেললাইনের মত!'

উঠে বসল কিশোর। 'যা আন্দাজ করেছিলাম, ওটা বানানো ড্রাগন। এই লাইনই তৈরি করেছিল ডন কারটার। তবে একটা কথা ভুল বলেছ, রবিন। বলেছ, ওটা কখনও ব্যবহার হয়নি।'

'ভুল কই বললাম?'

'ভুলই তো বলেছ। ড্রাগনটা ওই লাইন ব্যবহার করছে না?'

'করছে!'

'হ্যাঁ, করছে। এখনই বুঝতে পারবে। চলো গিয়ে দেখি। তাড়াতাড়ি করতে হবে, ওরা চলে আসতে পারে।'

'কারা?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

জবাব দিল না কিশোর। হাঁটতে শুরু করেছে।

সুড়ঙ্গ জুড়ে পড়ে থাকা বিশাল আকৃতিটার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা।

ভ্রূকুটি করল কিশোর, নাক দিয়ে বিচিত্র শব্দ করল।

'কি হয়েছে?' জানতে চাইল রবিন।

'ঠিক বুঝতে পারছি না। বাইরের দিকে, মানে সৈকতের দিকে মুখ করে পড়ে আছে এটা। ধূসর দেয়ালটা খোলা, কিন্তু বাইরের পথ এখনও বন্ধ। কি মানে হয়?'

ঠোঁট ওল্টাল রবিন। মাথা নাড়ল, একই সঙ্গে হাতও নাড়ল। সে-ও বুঝতে পারছে না।

'মনে হয়,' জবাবটা কিশোরই দিল,' এটার ভেতরে যে বা যারা ছিল তারা বেরিয়ে চলে গেছে। ড্রাগনটাকে এমন ভাবে ফেলে রেখে গেছে, যাতে কেউ ঢুকলেই দেখে ভয়ে পালায়।'

চুপ করে রইল রবিন।

ড্রাগনের মুখে টর্চের আলো ফেলল কিশোর। 'চোখ নয়, খুদে হেডলাইট, মুভেবল।'

আবার ড্রাগনের পাশে চলে এল দু-জনে। আঁশ আঁশ কালচে চামড়ায় কি

একটা চোখে পড়ল কিশোরের, হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল। দরজার হাতল। কিন্তু দরজাটা কই?

কিশোরের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল রবিন। 'ওই যে আরেকটা হাতল, তার ওপরে আরেকটা।'

ফিক করে হাসল কিশোর। 'আবার বোকা বানাল। দরজার হাতল নয় ওগুলো। পা-দানী। পা রেখে উঠে যাওয়ার জন্যে।'

হাতলের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে শুরু করল সে। কিছুটা উঠে ফিরে তাকিয়ে রবিনকে ওঠার জন্যে ডাকল। পিঠের ওপরে উঠে রাস্তার ম্যানহোলের মত ঢাকনাটা দেখতে পেল।

'আরি, একবারে সাবমেরিনের হ্যাচ,' অবাক কণ্ঠে বলল কিশোর। 'রবিন, থাকো এখানে, পাহারা দাও। আমি নিচে যাচ্ছি।'

ঢোক গিলল রবিন, কিছু বলল না, মাথা কাত করল শুধু।

উবু হয়ে হ্যাচের হাতল ধরে জোরে টান দিল কিশোর। উঠে গেল ঢাকনা। সিঁড়ি বেয়ে ভেতরে নামল কিশোর।

অপেক্ষা করে আছে রবিন। খানিক পরেই সাড়া এল ভেতর থেকে। থাবা দেয়া হচ্ছে খোলসে। তারমানে ড্রাগনের পেটে ঢুকে গেছে গোয়েন্দাপ্রধান।

ভয় পাচ্ছে রবিন, অস্বস্তিতে বার বার তাকাচ্ছে এদিক ওদিক। অন্ধকারে লম্বা সুড়ঙ্গে বেশিদূর এগোচ্ছে না টর্চের আলো। সুড়ঙ্গের দেয়াল কংক্রিটে তৈরি, ছাতে ইস্পাতের কড়িবরগা।

এতই অন্যমনস্ক ছিল রবিন, হ্যাচ খোলার শব্দে চমকে উঠল। চেয়ে দেখল, মাথা বের করেছে কিশোর। ডাকল, 'এসো, দেখে যাও।'

সিঁড়ি বেয়ে ভেতরে নামল রবিন।

টর্চ জেলে আলো ফেলল। 'চমৎকার, তাই না? বাইরে থেকে মনে হয় জ্যান্ত ড্রাগন। চলে রেলের ওপর দিয়ে। এই যে দেখো, পেরিস্কোপ। আর এটা, পোর্টহোল। আসলে, রবিন, এটা একটা সাবমেরিন। অদ্ভুত সাবমেরিন।'

ভেতরের দিকে বাঁকা, মসৃণ দেয়ালে হাত বোলাল রবিন। 'কি দিয়ে বানিয়েছে?'

'সাধারণত লোহা আর ইস্পাত দিয়েই সাবমেরিন বানানো হয়। তবে এটা অন্য কিছু দিয়ে তৈরি। দেখি তো, ইঞ্জিনরুমটা কেমন?'

সরু গলিপথ ধরে মাথার দিকে এগোল দু-জনে।

এক জায়গায় এসে চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'গীয়ারশিফট, ড্যাশবোর্ড, ব্রেক, প্যাডাল! কি ধরনের সাবমেরিন এটা? একেবারে তো গাড়ি।'

আঙুল মটকাল কিশোর। 'সবচেয়ে প্রথম যে সাবমেরিনটা তৈরি হয়েছিল, তার কথা বইয়ে পড়েছি। সাগরের তলার মাটি দিয়ে গাড়ির মত চাকায় গড়িয়ে চলত ওটা। গাড়ির মতই জানালা ছিল, কাচে ঢাকা, যাতে তার ভেতর দিয়ে বাইরে দেখতে পারে দর্শকরা। ভেতরে বিশেষ এয়ার কম্পার্টমেন্টের ব্যবস্থা ছিল, বাইরের পানির চাপ থেকে সাবমেরিনকে রক্ষা করার জন্যে। মনে হয় ওই আইডিয়াটাই

কাজে লাগিয়েছে এই ড্রাগনের ইঞ্জিনিয়াররা। অনেকটা ওই রোজ বাউল ফ্লোটসের মত ব্যাপার। গাড়ির চ্যাসিসকে ফুল দিয়ে ঢেকে সাজানো হয়, জানো হয়তো। ভেতরে বসে থাকে ড্রাইভার, লুকিয়ে, তাকে দেখতে পায় না কেউ। লো গীয়ারে গাড়ি চালায়।'

'এই ড্রাগনটাকেও অনেকটা ওভাবেই চালানো হয়,' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে রবিন। 'দেখে মনে হয় বালির ওপর দিয়ে ভেসে আসে, চাকা চোখে পড়ে না বলে। মিস্টার ক্রিস্টোফারের ওখানে যে সিনেমাটা দেখেছি, তাতে ড্রাগন কিন্তু অন্য রকম ভাবে হাঁটে। দুলে দুলে, পায়ের পর পা ফেলে।'

'ওই ড্রাগন অন্য রকম ভাবে বানানো হয়, যাতে পর্দায় আসল ড্রাগনের মত লাগে। কিন্তু এটা বানানো হয়েছে মানুষকে ভয় দেখিয়ে দূরে সরানোর জন্যে।'

'কেন?' প্রশ্নটা করতে গিয়েও থেমে গেল রবিন। বিচিত্র একটা গোঙানি শোনা গেল, টানা টানা।

চমকে গেল দু-জনেই।

'কি-কী?' কণ্ঠস্বর খাদে নেমে গেল রবিনের।

'ওখান থেকে আসছে,' লেজের দিকে দেখাল কিশোর।

'চলো, পালাই। জেগে উঠছে সাবমেরিন। পানিতে গিয়ে ডুব দিলে মরেছি। অটোপাইলটে চলে মনে হয়।'

আবার শোনা গেল গোঙানি, কেমন যেন বিষণ্ণ, গা-শিরশির করা শব্দ।

কেঁপে উঠল রবিন। 'আমার একদম ভাল্লাগছে না!'

কিন্তু তাকে বিস্মিত করে দিয়ে সরু গলিপথ ধরে ড্রাগনের লেজের দিকে ছুটে গেল কিশোর।

আবার গোঙানি শোনা গেল।

মেঝের দিকে ঝুঁকল কিশোর। কিছু বোঝার চেষ্টা করছে।

কাছে চলে এল রবিন। 'কী?'

জবাব দিল না কিশোর। টর্চের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেয়াল পরীক্ষা করতে লাগল। তারপর রবিনকে আরেকবার অবাক করে দিয়ে হাসল। 'আরও একটা রহস্যের কিনারা হলো।'

'কিনারা?'

'শুনছ না?' রবিনের কথার জবাব দিল না কিশোর।

কান পেতেই আছে রবিন। 'শুনছি তো। কিন্তু মোটেই ভাল্লাগছে না আমার।'

'ভয় পেয়েছ বলে লাগছে না। এসো, দেখো, ভয় কাটবে,' হাসতে হাসতেই হাতল টেনে ছোট একটা দরজা খুলে ফেলল কিশোর। আলো ফেলল ভেতরে। জোরাল হলো গোঙানি।

'কুকুরের গলা মনে হচ্ছে না?' বকের মত গলা বাড়িয়ে দরজার ওপাশে তাকাল রবিন। 'আরে, কুকুরই তো! এক আলমারি ভরতি!'

'এবার বুঝলে তো? কুকুর-হারানো রহস্যের সমাধান হলো।'

'ঘটনাটা কি? দেখে মনে হচ্ছে নড়াচড়ার ইচ্ছে নেই বিশেষ। কুকুরের এত

ঘুম?'

'ইচ্ছে করে ঘুমাচ্ছে না। ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে।'

'ওষুধ? কেন?'

'জেগে থাকলে হয়তো কারও অসুবিধে হয়। কুকুরগুলোকে শান্তও রাখতে চায় সেই লোক, আবার ক্ষতি হোক এটাও চায় না। সে জন্যেই মারেনি, ধরে এনে আটকে রেখেছে।'

আবার গুঙিয়ে উঠল একটা কুকুর, ঘুমঘুম চোখে তাকাল। খানিক আগেও এটাই গুঙিয়েছে, স্বর শুনেই বোঝা যায়।

'আইরিশ সেটার!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'মিস্টার জোনসেরটা না-তো?'

কুকুরটার দিকে চেয়ে ডাকল কিশোর, 'পাইরেট, আয়।'

লালচে রোমশ কুকুরটা শরীর টানটান করল, হাই তুলল, আড়মোড়া ভাঙল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে শরীর ঝাড়া দিল আলস্য তাড়ানোর ভঙ্গিতে। লটপট করে উঠল লম্বা লম্বা কান।

'আয় পাইরেট,' আবার ডাকল কিশোর। 'আয়।' হাত বাড়িয়ে দিল।

হাত শুঁকল কুকুরটা। লেজ নাড়তে শুরু করল। লাফিয়ে নেমে এল আলমারির তাক থেকে। টলছে মাতালের মত। সামলে নিতে সময় নিল। কিশোরের পায়ে গা ঘঁষছে, কুঁই-কুঁই আওয়াজ বেরোচ্ছে নাক দিয়ে।

'দারুণ কুকুর,' মাথা চাপড়ে দিতে দিতে বলল কিশোর। 'খুব ভাল।'

'মিস্টার জোনসও তাই বলেছেন অবশ্য।' হাত বাড়াল রবিন। কুকুরটা চলে এল তার কাছে, পায়ে গা ঘষতে লাগল।

'আরে, যে ডাকে তার কাছেই তো যায়।'

'বাড়ি যাবি?' কুকুরটাকে বলল কিশোর।

কি বুঝল পাইরেট কে জানে, ঘেউ ঘেউ শুরু করল। তার ডাকে আস্তে আস্তে চোখ মেলল অন্য কুকুরগুলোও। শুরু হলো নানারকম বিচিত্র মিশ্র শব্দ। কেউ কেউ নেমে এসে কুকুরের কায়দায় স্বাগত জানাল দুই গোয়েন্দাকে।

'ছয়টা,' গুনল রবিন। 'হারানো সবগুলোই এক জায়গায়।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। প্রতিটি কুকুরের গলার কলারে আটকে দিল এক টুকরো লেখা কাগজ।

'কি?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'মেসেজ। কুকুরের মালিকেরা জানবে, কে, কি ভাবে বের করেছে এগুলোকে। বিজ্ঞাপন হবে আমাদের সংস্থার।'

গোঁ গোঁ করে উঠল পাইরেট।

ঝুঁকে তার গলা চাপড়ে আদর করে বলল কিশোর, 'ও-কে ও-কে, তুইই আগে যাবি।'

কোলে করে কুকুরটাকে তুলে নিয়ে এল হ্যাচের বাইরে। 'যা, দৌড় দে, সোজা বাড়ি।'

আনন্দে আরেকবার কোঁ কোঁ করল পাইরেট, লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে দৌড়

দিল দেয়ালের ফাঁকের দিকে।

নিচ থেকে এক এক করে কুকুরগুলোকে তুলে দিল রবিন, ওপর থেকে ধরল কিশোর। খোলা বাতাসে ওষুধের ক্রিয়া পুরোপুরি কেটে গেছে কুকুরগুলোর, তরতাজা হয়ে উঠেছে। আইরিশ সেটারটার পেছনে ছুটল সব ক'টা।

কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে বলল রবিন, 'মুসা শুনলে খুব অবাক হবে। তো, আমরা আর এখানে থেকে কি করব? কাজ তো শেষ। চলো, যাই।'

'এখন যাওয়া যাবে না।'

'কেন?'

'সুড়ঙ্গের ভেতরে কিছু নড়ল দেখলাম। আসছে কেউ।'

'হায় হায়! গেলাম তো আটকে। লুকাই কোথা?'

সাবমেরিনের ভেতরে এসে ঢুকল আবার দু-জনে। রবিনকে নিয়ে আলমারিটার কাছে চলে এল কিশোর, যেটাতে কুকুর রাখা হয়েছিল। টান দিয়ে খুলল আলমারির দরজা।

আঠারো

ঠাণ্ডা বেশি নয়, তবু ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে মুসার হাত। তালুতে তালু ঘষে গরম রাখার চেষ্টা করছে। জায়গামত বসিয়ে ফেলেছে প্রোজেকটর। সুচ টিপলেই ছবি শুরু হবে এখন।

শেষবারের মত আরেকবার সবকিছু চেক করে নিল সে, দেখল ঠিকঠাক আছে কিনা। তারপর দেয়ালে হেলান দিয়ে পা লম্বা করে বসে রইল চুপচাপ। সঙ্কেত শুনলেই চালু করে দেবে মেশিন।

শব্দ শুনল, তবে সঙ্কেত নয়। তাছাড়া সামনের দিক থেকেও নয়, পেছন থেকে আসছে খসখস শব্দটা।

স্থির হয়ে গেল সে। ভুল শোনেনি তো? না, আবার শোনা গেল।

ছোট্ট গুহার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ। প্রবেশ মুখের তক্তার নিচের বালি সরাচ্ছে।

নিচের ঠোঁটে কামড়ে ধরল মুসা। কি করবে? উঠে দৌড়ে বেরিয়ে যাবে বড় গুহায়? কিশোর আর রবিনের কাছে? কিন্তু তাহলে তো সব পণ্ড হবে। জায়গা ছেড়ে নড়তে মানা করে দিয়ে গেছে কিশোর। তার কথা অমান্য করলে আবার না আরও বড় বিপদে পড়ে। এসব ব্যাপারে অতীত অভিজ্ঞতা আছে মুসার। কিশোর পাশার নির্দেশ না মেনে অনেক বড় বিপদে পড়েছে।

সরে যাচ্ছে তক্তা। দ্রুত চিন্তা চলছে তার মাথায়। যা করার জলদি করতে হবে। কিছু একটা অস্ত্রের জন্যে মেঝে হাতড়াল অহেতুক। এই সময় খেয়াল হলো, টর্চটা জ্বলছে।

তাড়াতাড়ি নিভাল ওটা। গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করে নিল তাকে। কিন্তু এই অন্ধকার কতক্ষণ আচ্ছাদন দেবে? লোকটার হাতেও তো আলো থাকতে পারে।

বেশি ভাবার সময় পেল না মুসা। দেয়াল ঘেঁষে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

সরে গেল তক্তা। আবছা আলোর পটভূমিকায় মূর্তিটাকে দেখতে পেল সে। এত মোটা মানুষ, সরু ফাঁক দিয়ে সামনাসামনি ঢুকতে পারবেন না, পাশ ফিরে আসতে হবে। আকার দেখেই তাঁকে চিনতে পারল। বদমেজাজী হেরিঙ! হাতে শটগান।

গুহার নিচু দেয়াল। মাথা ঠেকে যায়। নুয়ে নুয়ে এগোতে হলো হেরিঙকে। দুই পা এগিয়েই থমকে দাঁড়ালেন। কান পেতে কিছু শুনছেন মনে হলো।

শব্দ মুসাও শুনতে পাচ্ছে। কুকুরের ঘেউ ঘেউ। শিকারী কুত্তা ছেড়ে দেয়া হয়েছে? প্রমাদ গুনল সে। মিশে যেতে চাইল দেয়ালের সঙ্গে। কিন্তু খুব একটা লাভ হবে বলে মনে হলো না তার। চোখ নাহয় এড়াতে পারল, কিন্তু গন্ধ?

তীব্র গতিতে ছুটে এল ওগুলো। পাথরের দরজার পাল্লা ফাঁক করে রেখে গেছে কিশোর। সেদিক দিয়ে স্রোতের পানির তোড়ের মত ঢুকল একটার পর একটা।

কিন্তু মুসাকে আক্রমণ করতে এল না ওগুলো। ছুটে গেল গুহামুখের দিকে। গিয়ে পড়ল একেবারে হেরিঙের গায়ে। 'আঁউ' করে উঠলেন তিনি। পড়ে গেলেন মাটিতে।

ঢোক গিলল মুসা। ড্রাগনের ভয় করছিল সে, কিন্তু কুকুর আশা করেনি। মিস্টার হেরিঙকে বাঁচাতে হলে কিছু একটা করা দরকার। নইলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে কুত্তার দল। আর কিছু না পেয়ে হাতের টর্চটাই উঁচু করে ধরল বাড়ি মারার জন্যে।

উনিশ

কিশোর আর রবিনও পড়েছে বেকায়দায়। আলমারিতে বসে দরজায় কান পেতে শুনছে।

'ইস্, কত কাজ যে করলাম,' তিক্ত কণ্ঠ শোনা গেল একজনের। 'এসব লাইন-টাইন পরিষ্কার···তারপর কি খোঁড়াটাই না খুঁড়লাম।'

'খামকা কষ্ট করোনি, নিক,' জবাবে বলল আরেকজন। 'বিফলে যাবে না। পুরস্কার শিগগিরই পাবে।'

'তা ঠিক। কিন্তু জো, লোকটা খুব হারামী। বিশ্বাস করা যায়?'

হেসে উঠল নিক। 'ও একলা, আর আমরা দু-জন। নৌকাটাও আমাদের। গিয়ে দেখো, ও-ও হয়তো ভাবছে আমাদের বিশ্বাস করা যায় কিনা।'

মই বেয়ে লোক নেমে আসার শব্দ শোনা গেল। সরু গলিপথে পদশব্দ।

জীবন্ত হলো ইঞ্জিন। কেঁপে উঠল সাবমেরিন, একবার ধাক্কা দিয়েই মসৃণ গতিতে চলতে শুরু করল লাইনের ওপর দিয়ে।

অন্ধকারে কিশোরের হাঁটুতে হাত রাখল রবিন। ফিসফিসিয়ে বলল, 'দুই ডাইভার না তো? সাগরে নামতে যাচ্ছে নাকি?'

'মনে হয় না। ডুবিয়ে রাখার মত ভার তোলা হয়নি সাবমেরিনে। পানিতে

নামার আগে ভার বোঝাই করে নিতে হবে।'
'না নামলেই বাঁচি,' মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়ল রবিন।
'পেছনে চলেছি। সুড়ঙ্গের গভীরে।'
'বুঝতে পারছি। কিন্তু কেন যাচ্ছে? কি করবে?'
'জানতে পারলে ভাল হত। তবে যা-ই করুক, ব্যাপারটা গোলমেলে।'
হঠাৎ আবার ঝাঁকুনি খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল ড্রাগন। পেছনে ধাক্কা খেলো কিশোর আর রবিন।
ড্রাইভার ফিরে এল মইয়ের কাছে। 'চলো, নিক। মাল বোঝাই করার সময় সাবধান থেকো।'
'ব্যাটা কোনরকম চালাকি করবে না তো?' অস্বস্তি যাচ্ছে না জো-র। 'করলে কিন্তু বিপদে পড়বে সে। ওই ইঁট দিয়েই মাথায় বাড়ি মেরে বসব।'
'মেরো। চালাকি করলে আমিও ছাড়ব না। দুই কোটি ডলারের মামলা, সোজা কথা?'
অন্ধকারের দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে রয়েছে দুই গোয়েন্দা। দুই কোটি ডলার? ঠিক শুনছে তো?
মই বেয়ে ওঠার শব্দ হলো। হ্যাচ উঠল...নামল...দুই বার। দু-জনেই বেরিয়ে গেছে।
রবিনের কাঁধে হাত রাখল কিশোর। 'বেরোও।'
সাবধানে দরজা খুলে বেরিয়ে এল ওরা। কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল। বাইরে কথা বলে উঠেছে কেউ, খসখসে কণ্ঠ, কথার মাঝে মাঝে কাশছে।
'জলদি করো,' বলল সে। 'গার্ডকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছি। কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে থাকবে। ও জাগার আগেই সরিয়ে নিতে হবে ইঁটগুলো।'
কনুই দিয়ে কিশোরের গায়ে গুঁতো দিল রবিন। রোভার মারটিনের গলা চিনতে পেরেছে। 'তোমার অনুমান ঠিকই ছিল।'
'ড্রাগনের কাশি রহস্যেরও সমাধান হলো। বাকি রইল আর একটা রহস্য।'
'ওরা কি করছে এখানে, সেটা তো?'
'না। বার বার ইঁটের কথা বলছে। কিসের ইঁট?'
রবিনের পিঠে ঠেলা দিয়ে চলার নির্দেশ দিল কিশোর। ম্লান আলোয় আলোকিত গলি ধরে এসে আস্তে করে বাইরে মাথা বের করল সে।
হাঁ হয়ে গেল দেখে। ড্রাগনের পাশেই কংক্রিটের দেয়াল। মস্ত একটা গর্ত করা হয়েছে ওতে, একজন মানুষ হেঁটে ঢুকে যেতে পারবে ওতে, এতটাই বড়। হাতে পাঁজাকোলা করে কি যেন নিয়ে গর্তের মুখে দেখা দিল একজন লোক, ভারের চোটে পেছনে বাঁকা হয়ে গেছে।
'উফ, ভারিও!' বলল লোকটা। 'এক টন হবে।'
'তুমি কি ভেবেছিলে, শোলার মত পাতলা?' বললেন মারটিন। 'এতই যদি সহজ হবে, তোমাদের ভাড়া করতে যাব কেন?'
'আমি সে কথা বলছি না। বলছি, বেজায় ভারি।'

'তা ঠিক। একেকটা ইট সত্তর পাউণ্ড। বাইরে সারি দিয়ে রাখো। পরে ঢোকাবে।'

বোঝা নামিয়ে রেখে আবার গর্তের দিকে চলল লোকটা। সে ঢোকার আগেই বেরোল তার সঙ্গী। পাঁজাকোলা করে ইট নিয়ে এসেছে। হাঁপাচ্ছে। ওই অবস্থায়ই হেসে বলল। 'সাংঘাতিক ভারি হে, জো।'

মারটিনের নির্দেশ মত সে-ও বোঝা নামাল ড্রাগনের পাশে। আরও আনতে ফিরে চলল।

নিঃশব্দে হ্যাচ নামিয়ে নেমে এল কিশোর।

'একেকটা ইট সত্তর পাউণ্ড,' রবিনকে শুনিয়ে শুনিয়ে হিসেব শুরু করল সে। 'নিক আর জো বলল, দুই কোটি ডলার। কিসের ইট বোঝাই যাচ্ছে। স্বর্ণ।'

'স্বর্ণ!' জোর করেও কণ্ঠস্বর খাদে রাখতে পারল না রবিন। 'পাচ্ছে কোথেকে?'

'সরকারী ইট, বর্তমানে সবচেয়ে বড় স্ট্যাণ্ডার্ড, সত্তর পাউণ্ড। ব্যাটারা ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক লুট করছে।'

নরম সুরে শিস দিয়ে উঠল রবিন।

'চুপ!' তার মুখ চেপে ধরল কিশোর। 'শুনে ফেলবে।'

কিশোরের হাত সরিয়ে ফিসফিস করে বলল রবিন, 'চলো, পালাই। দেখলে আমাদের ছাড়বে না ডাকাতেরা, খুন করে ফেলবে।'

'কিন্তু পালাই কি করে?' প্রশ্নটা নিজেকেই করল কিশোর। 'বেরোতে গেলেই মারটিনের চোখে পড়ব।'

সামনের দিকে রওনা হলো কিশোর। রবিন ভাবল, নতুন কোন গুপ্তস্থানের সন্ধান করছে গোয়েন্দাপ্রধান, যেখানে নিরাপদে লুকিয়ে থাকা যায়।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল রবিন। কথা বলে উঠল, 'সরি...'

তাড়াতাড়ি তার মুখ চেপে ধরল কিশোর, ফিসফিস করে বলল, 'তুমি দেখছি ধরা পড়িয়েই ছাড়বে!' উত্তেজনায় চকচক করছে তার চোখ। 'ইগনিশানে কী রেখে গেছে!'

'মানে...তুমি, মানে...ড্রাইভ করবে? চালাবে এটাকে? গাড়ি তো চালাতে জানো না। তাছাড়া জানালাও নেই। তাকাবে কোনখান দিয়ে?'

'দেখি কি করতে পারি। লাইনের ওপর দিয়ে চলবে যখন, দেখার দরকার হবে না বোধহয়। আর গাড়ি চালাতে জানি না বটে, কি করে চালাতে হয় তা জানি। ক্লাচ, ব্রেক, অ্যাকসিলারেটর, গীয়ারশিফট, সবই গাড়ির মত।'

ছোট্ট ড্রাইভিং সীটে বসল কিশোর। মোচড় দিল চাবিতে।

গর্জে উঠল ইঞ্জিন।

কিন্তু পুরোপুরি চালু হওয়ার আগেই ছোট্ট কয়েকটা কাশি দিয়ে থেমে গেল।

'মারটিন না, কিশোর,' চেঁচিয়ে উঠল রবিন, উত্তেজনায় আস্তে কথা বলার কথা ভুলে গেছে আবার, 'মারটিন কাশেনি! ইঞ্জিনের কাশিই শুনেছি আমরা।'

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছে কিশোর। রবিনের কথার জবাব না দিয়ে মরিয়া হয়ে আবার মোচড় দিল চাবিতে। ধরেই রাখল।

আবার ইঞ্জিন চালু হলো। বন্ধ হলো না।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে গীয়ার দিল কিশোর, আস্তে করে পা সরিয়ে আনল ক্লাচ প্যাডাল থেকে।

ঝাঁকুনি দিয়ে এগিয়ে হোঁচট খেয়ে যেন থেমে গেল গাড়ি। কাশি দিয়ে বন্ধ হলো ইঞ্জিন।

'ইস্, ক্লাচটা ডোবাল,' বলেই আবার ইগনিশনে মোচড় দিতে গেল কিশোর। ঠিক এই সময় হ্যাচ খোলার শব্দ হলো।

'সর্বনাশ!' বড় বড় হয়ে গেছে রবিনের চোখ। 'হ্যাচ খোলা!'

'হ্যাঁ, ভুলই হয়ে গেল!' ভয় ফুটেছে গোয়েন্দাপ্রধানের চোখেও। 'হ্যাচ আটকে নেয়া উচিত ছিল!'

মুসা কাঁপছে। কাঁপছে তার হাতে টর্চ। এই সামান্য টর্চের বাড়ি মেরে কি ওই ভয়ানক কুকুর ঠেকাতে পারবে? হেরিঙ করছেনটা কি? তাঁর হাতে তো শটগান রয়েছে। গুলি করছেন না কেন?

হঠাৎ বুঝতে পারল ব্যাপারটা। আক্রমণ করেনি কুকুরগুলো, তাড়াহুড়ো করে বাইরে বেরোতে চাইছে। ফলে পথ যেটা খোলা পেয়েছে সেই পথেই ছুটে গেছে হুড়মুড় করে। অন্ধের মত ছুটতে গিয়েই হেরিঙের গায়ের ওপর পড়েছিল, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে তাঁকে।

ব্যাপার কি? নড়ছে না কেন?

সাহস খানিকটা ফিরে পেয়েছে মুসা। পায়ে পায়ে এগোল। হেরিঙের গায়ে হাত দিয়ে দেখল। নড়ে না। শ্বাস-প্রশ্বাস ঠিকই বইছে। নিশ্চয় পড়ে গিয়ে পাথরে বাড়ি খেয়েছে মাথা, বেহুঁশ হয়ে গেছেন।

পালাতে চাইলে এই-ই সুযোগ। হেরিঙের হুঁশ ফিরলে আর পারবে না।

দ্রুত ফিরে এসে প্রোজেকটরটা তুলে নিল মুসা। পাথরের দরজা ঠেলে ফাঁক করে বেরিয়ে এল বড় গুহায়। ফাঁক করার জন্যে গোঁজ লাগানোর ছোট পাথরটা সরাতে হয়েছে। সেটা আর লাগানোর সময় পেল না। এক হাতে প্রোজেকটর—ওটার ভারেই হিমশিম খাচ্ছে; ফলে অন্য আরেক হাতে দরজাটা ধরেও রাখতে পারল না। জোর পেল না। ছুটে গেল হাত থেকে। বন্ধ হয়ে গেল আপনাআপনি।

যা হয় হোকগে। বাঁচলে পরে খোলার চেষ্টা করতে পারবে। আগে কিশোর আর রবিনকে খুঁজে বের করা দরকার।

ধূসর দেয়ালের দিকে এগোল মুসা। ফাঁক দেখল। কোন রকম ভাবনা চিন্তা না করেই ঢুকে পড়ল ভেতরে। অদ্ভুত একটা শব্দ হতেই ঝট করে পেছনে ফিরে তাকাল। ক্ষণিকের জন্যে থেমে গেল যেন হৃৎপিণ্ড। পাক দিয়ে উঠল পেটের মধ্যে।

পেছনে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দরজার ফাঁক!

বিচিত্র শব্দ হলো এবার সামনে। ফিরে চেয়েই আরেকটা ধাক্কা খেলো মুসা। সামনে লম্বা সুড়ঙ্গ, অন্ধকারে আবছামত দেখা যাচ্ছে মস্ত একটা অবয়ব। চেনে ওটাকে। হলুদ দুই চোখে উজ্জ্বল আলো। হাঁ করা মুখ। গর্জে উঠল ড্রাগন।

টর্চ নিভিয়ে নিজের অজান্তেই পিছিয়ে এল মুসা। পিঠ ঠেকল দেয়ালে। আর পিছানোর জায়গা নেই।

পাশে সরতে শুরু করল সে। চলে এল একটা অন্ধকার কোণে। ভারি প্রোজেকটরটা সামনে তুলে ধরেছে অনেকটা বর্মের মত করে।

অদ্ভুত কাণ্ড করছে ড্রাগনটা। লাফিয়ে লাফিয়ে এগোচ্ছে। খানিকটা এগিয়েই থেমে যাচ্ছে, খানিক পরই গর্জে উঠে আরও খানিকটা এগোচ্ছে। এই-ই করছে বার বার। কিশোর আর রবিনের চিহ্ন নেই। জোরে ঠোঁটে কামড়ে ধরেছে সে, চাপা একটা গোঙানি বেরোল গলা দিয়ে।

নিশ্চয় তার দুই বন্ধুকে গিলে ফেলেছে ওটা। ওরা এখন দানবের পেটে হজম হচ্ছে। ওদেরকে বাঁচানোর আর কোন উপায় নেই। সে নিজে এখন বাঁচতে পারবে কিনা, সেটাই সন্দেহ।

বিশ

খোলা হ্যাচ দিয়ে ভেসে এল রোভার মারটিনের চিৎকার, 'বেরোও! কে ওখানে, বেরিয়ে এসো! যদি ভাল চাও তো বেরোও!'

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন।

মাথা নাড়ল কিশোর। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসেছে, দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। আঙুলগুলো দ্রুত নড়ছে কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর। এটাই বাঁচার একমাত্র উপায়, ড্রাগনটাকে চালিয়ে নেয়া।

আবার চালু হলো ইঞ্জিন। ঝাঁকুনি দিয়ে আগে বাড়ল ড্রাগন। হঠাৎ কি জানি কি হলো, ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠল লম্বা গলাটা।

'কিশোর! দেখো দেখো!' চেঁচিয়ে বলল রবিন। 'নিশ্চয় কোন বোতামে চাপ লেগেছে। কি ভাবে সোজা হলো দেখলে? ওই যে একটা জানালা, বাইরে দেখা যায়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানিয়ে গ্যাস প্যাডাল চেপে ধরল কিশোর, যতখানি যায়। আগের মতই কিছুদূর এগিয়ে কাশি দিয়ে থেমে গেল ইঞ্জিন। শোনা গেল মারটিনের চিৎকার।

খটাং করে হ্যাচ বন্ধ হলো, খোলস বেয়ে কি যেন গড়িয়ে ধুপ করে পড়ল মাটিতে। যেন ময়দার বস্তা পড়ল।

'মারটিন পড়েছে,' রবিন বলল। 'ঝাঁকুনি সামলাতে পারেনি। চালাও, চালাও।'

'চেষ্টা তো করছি। পারছি না। কিছু একটা গোলমাল আছে, খালি থেমে যায়।'

চাবি ঘোরাতেই আবার চালু হলো ইঞ্জিন। ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে শোনা গেল

মারটিনের চেঁচামেচি, সাহায্যের জন্যে ডাকছেন নিক আর জোকে।

পেছন দিকে পোর্টহোলের কাছে ছুটে গেল রবিন, কাচে নাক চেপে ধরে বাইরে তাকাল। 'কিশোর, ব্যাটারা আসছে। জলদি কিছু করো। পাগলা কুত্তা হয়ে গেছে ওরা।'

গীয়ার দিয়ে ক্লাচ ছাড়তেই লাফ দিয়ে আগে বাড়ল ড্রাগন। অ্যাকসিলারেটরের ওপর প্রায় দাঁড়িয়ে গেল কিশোর, এত জোরে চাপ দিচ্ছে।

ভীষণ ঝাঁকুনি দিয়ে আবার থেমে গেল ড্রাগন, ইঞ্জিন স্তব্ধ।

দাঁতে দাঁত চেপে আবার চালু করল কিশোর। আগে বাড়ল ড্রাগন, আবার থেমে গেল।

'এভাবেই চালিয়ে যাও,' বলল রবিন। 'থেমো না।'

চালু হলো ইঞ্জিন।

'ওরা কদ্দূর?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ধরে ফেলল। চালাও।'

প্রাণপণে ছুটছে দুই ডাকাত, তাদের পেছনে চেঁচামেচি করছেন আর হাত-পা ছুঁড়ছেন মারটিন।

কয়েক ফুট এগিয়ে থেমে গেল ড্রাগন।

গতি আরও বাড়াল দুই ডাকাত।

ফ্যাকাসে হয়ে গেল রবিন। দেখছে, ড্রাগনের লেজ প্রায় ধরে ফেলেছে ওরা!...ধরল। চেপে ধরে টান দিল পেছনে। দু-জনের গায়েই মোষের জোর। ইঞ্জিন বন্ধ থাকলে টেনেই পিছিয়ে নিয়ে যাবে সাবমেরিনটাকে।

'ধরে ফেলেছে!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আগে বাড়ল ড্রাগন। সেই একই ব্যাপার। কয়েক ফুট গিয়েই ঝাঁকি দিয়ে থেমে গেল।

'নাহ, হবে না।' ভ্রূকুটি করল কিশোর। কপালের ঘাম মোছারও অবকাশ নেই। 'এখন আর ইঞ্জিনই স্টার্ট নিচ্ছে না।'

'নিলেও আর লাভ নেই,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রবিন। 'ধরে ফেলেছে।'

লেজ চেপে ধরে গায়ের জোরে টানছে দুই ডাকাত, টানের চোটে পেছনে হেলে পড়েছে দু-জনের শরীর। বুঝতে পারল, টানার দরকার নেই, ইঞ্জিন স্টার্ট নিচ্ছে না। লেজ ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে এল একজন। পা-দানী ধরে ফেলল। দেখতে দেখতে উঠে চলে এল হ্যাচের কাছে, টান দিয়ে খুলে ফেলল ঢাকনা।

'ধরে তো ফেলল, কিশোর!' কাঁদো কাঁদো হয়ে গেছে রবিন। 'কি করি এখন?'

কি আর করার আছে? সীট থেকে উঠে সরু গলিপথ ধরে এগিয়ে এল কিশোর। 'আত্মসমর্পণ করব। তাহলে হয়তো আর কিছু বলবে না,' কিন্তু কথাটা নিজেই বিশ্বাস করল না সে।

মই বেয়ে উঠে বাইরে হাত বের করে নাড়ল কিশোর। 'মিস্টার মারটিন, আমরা বেরিয়ে আসছি!'

মারটিনের রাগান্বিত চিৎকার শোনা গেল। কি বললেন, কিছু বোঝা গেল না।

এই সময় বদ্ধ গুহা ভরে গেল আরেকটা বিকট চিৎকারে। ভয়ঙ্কর আওয়াজ। অন্ধকার সুড়ঙ্গের পুরু দেয়ালে প্রতিধ্বনি উঠল।

হ্যাচের বাইরে মাথা বের করেছে কিশোর। শব্দ শুনে ঝটকা দিয়ে ফিরে তাকাল। তাদের সামনের দেয়ালটা রুদ্ধ, যেটা ফাঁক ছিল খানিক আগে, যেখান দিয়ে ঢুকেছে ওরা।

'খবরদার, জো!' চেঁচিয়ে সাবধান করল নিক।

ওদের চেহারায় প্রথমে বিস্ময়, তারপর আতঙ্ক ফুটতে দেখল কিশোর। ওদের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল। গুহার দেয়ালে উদয় হয়েছে বিশাল এক পিঁপড়ে, যেন একটা পাহাড়। দূরে রয়েছে এখনও। ছুটে আসছে দ্রুত। বিকট চিৎকার করছে ওটাই, সুড়ঙ্গ জুড়ে যেন এগিয়ে আসছে।

'রাক্কস! খেয়ে ফেলবে!' আতঙ্কে কোলা ব্যাঙের ডাক ছাড়ল নিক। টান দিয়ে পকেট থেকে পিস্তল বের করল। পিঁপড়েটোকে সই করে গুলি করল দু-বার।

গুলি খেয়েই যেন আরও বিকট চিৎকার করে উঠল পিঁপড়ে। আরও জোরে ছুটে এল। ওটার পেছনে দেখা যাচ্ছে এখন আরেকটা পিঁপড়ে।

'দেখলে কাণ্ড!' বিস্ময়ে কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে যেন নিকের চোখ। 'গুলি খেয়েও কিছু হলো না। টেরই পায়নি যেন! একের পর এক গুলি করে গেল সে।'

গর্জন থামছে না পিঁপড়ের, অগ্রগতি কমছে না সামান্যতম। আগের দুটোর সঙ্গে আরও পিঁপড়ে এসে যোগ হয়েছে। সারি দিয়ে এগিয়ে আসছে যেন মানুষ ছিঁড়ে খাওয়ার জন্যে।

রবিন দেখল, রোভার মারটিনের চোখে বিস্ময় ফুটেছে, তবে তাতে আতঙ্ক নেই, আছে কৌতূহল।

জো-ও গুলি শুরু করেছে।

'আসছে রে, আসছে!' চেঁচিয়েই চলেছে নিক। 'খেয়ে ফেললরে বাবা! মেরে ফেলল!'

জো-র মাথা নিকের চেয়ে ঠাণ্ডা। গুলি করে ফল হবে না বুঝতে পেরে ছুটে গেল মারটিনের কাছে। পিস্তল উঁচিয়ে ধরে চেঁচিয়ে বলল, 'জলদি দরজা খোলো! কুইক!'

ঠাণ্ডা চোখে ওর দিকে তাকালেন মারটিন। কাঁধ ঝাঁকালেন হতাশ ভঙ্গিতে। পকেটে হাত দিলেন। বের করলেন হুইসেলের মত একটা জিনিস। ঠোঁটে লাগিয়ে ফুঁ দিলেন।

রবিন আশা করেছিল, তীক্ষ্ণ শব্দ হবে।

কিছুই হলো না, কোন শব্দই নেই। অবাক হয়ে দেখল, ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে ধূসর দেয়ালের দরজা।

ফাঁক বড় হওয়ার আগেই নিকের হাত ধরে টান দিল জো, 'এসো।'

পিঁপড়েগুলোর দিকে ফিরেও তাকাল না আর ওরা, ছুটে বেরিয়ে গেল ফাঁক

'পালাও, গাধার দল, পালিয়ে যাও!' পেছন থেকে মুখ বাঁকিয়ে ভেঙচালেন মারটিন, 'নইলে যে খেয়ে ফেলবে! গবেট কোথাকার!' হ্যাচ দিয়ে মুখ বের করেছে কিশোর, তার দিকে তাকালেন ইঞ্জিনিয়ার। 'খুব দেখিয়েছ যা হোক। কষ্ট এতখানি এসে খালি হাতে ফিরব না আমি। বেরোও, বেরিয়ে এসো।' আবার পকেটে হাত দিলেন। বের করলেন চকচকে কালো আরেকটা মারাত্মক জিনিস। কিশোরের দিকে নিশানা করে নাড়লেন, 'নেমে এসো।'

আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে কিছু করার নেই। লক্ষ্মী ছেলের মত নেমে এল কিশোর আর রবিন।

অন্ধকার কোণের দিকে ফিরে ডাকলেন মারটিন। 'আর এই যে, তুমি, প্রোজেকটরওয়ালা, তুমিও এসো।'

থেমে গেল পিঁপড়ের চিৎকার। দেয়াল থেকে গায়েব হয়ে গেল ওগুলো।

'গু-গুলি করবেন না,' অন্ধকার থেকে শোনা গেল মুসার কণ্ঠ। 'আমি আসছি।'

নিথর ড্রাগনের পাশে বন্ধুদের কাছে এসে দাঁড়াল সহকারী গোয়েন্দা। কৌতূহলী চোখে ড্রাগনটাকে দেখে ফিরল কিশোরের দিকে, 'তাহলে ঠিকই বলেছিলে, আসল নয়।'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'তোমার পিঁপড়েগুলোর মতই আসল,' ব্যঙ্গ ঝরল মারটিনের কণ্ঠে। পিস্তল নেড়ে বলল, 'এসো আমার সঙ্গে···'

থেমে গেল ঘেউ ঘেউ শব্দ।

'ওহ্-নো! আবার আসছে।' তাড়াতাড়ি পকেট থেকে হুইসেলটা বের করলেন আবার মারটিন। ফুঁ দিলেন। আগের বারের মতই কোন শব্দ শোনা গেল না। কিন্তু মৃদু শব্দ তুলে বন্ধ হতে শুরু করল দেয়ালের ফাঁক।

হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। টর্চ জ্বালল, আলো ফেলল ফাঁকের বাইরে। জ্বলজ্বল করে উঠল কয়েকজোড়া চোখ। হাঁ করা মুখে ঝকঝকে ধারাল দাঁতের সারি বিকশিত।

'আল্লাহরে!' আঁতকে উঠল মুসা। 'কুত্তাগুলো আবার···'

দরজা বন্ধ হলো ঠিকই, কিন্তু দেরিতে। ততক্ষণে ভেতরে ঢুকে পড়েছে কুকুরগুলো। ঘেউ ঘেউ করে লাফ দিয়ে এসে পড়ল একটা মারটিনের ওপর।

'পাইরেট!' বিড় বিড় করল কিশোর। ডাকল। 'এই পাইরেট, এদিকে আয়।'

শুনলই না যেন কুকুরটা, দুই পা তুলে দিল মারটিনের বুকে। অন্য কুকুরগুলো এসে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে দাঁড়াল তাকে।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মারটিনের চেহারা। ঘামছেন। পিস্তল নেড়ে ধমক দিলেন কুকুরগুলোকে, সরে যাওয়ার জন্যে।

'লাভ নেই, মিস্টার মারটিন,' বলল কিশোর। 'আপনি জানেন, গুলি করতে পারবেন না। কুকুর খুব বেশি ভালবাসেন আপনি, ওরাও আপনাকে ভালবাসে।'

'হ্যাঁ।' বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন মারটিন। 'আমার জন্যে পাগল।' মুখ

তাকালেন। আনমনে বিড়বিড় করলেন, 'শেষ পর্যন্ত তীরে এসে তরী ডুবল।'

'ঠিকই বলেছেন,' একমত হলো কিশোর। 'আর কিছু করার নেই আপনার। সোনা লুট করে পার পাবেন না। সে চিন্তা বাদ দিন।'

'কি করব তাহলে?'

'আমার কথা শুনবেন? পিস্তলটা সরান।'

পিস্তলের দিকে তাকালেন একবার মারটিন. ভাবলেন। দ্বিধা করলেন, তারপর ঢুকিয়ে রাখলেন পকেটে। 'বলো।'

'এ-শহরের সবাই জানে, জোক করতে ভালবাসেন আপনি। ধরে নিন, এই সোনা লুটের ব্যাপারটাও একটা জোক।'

'কি ভাবে?'

'এই যে, এত কিছু করার পর, নেয়ার সমস্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নিলেন না।'

'কই সুযোগ? তাহলে তো নিতামই।'

'সেটা তো আমরা জানি। আমরা যদি কাউকে কিছু না বলি, চেপে যাই, বেঁচে যাবেন আপনি। দরকার হলে আমরাই ঘোষণা করে দেব, আপনি জোক করেছেন। লোকেও বিশ্বাস করবে। এত সোনা হাতের কাছে পেয়েও নেননি আপনি, এটাই তো আপনার সততার প্রমাণ।'

হাসি ফুটল মারটিনের ঠোঁটে, 'খুব চালাক ছেলে তুমি।'

একুশ

দুই দিন পর।

চিত্রপরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে তাঁর বিশাল ডেস্কের অন্য পাশে বসে আছে তিন গোয়েন্দা।

ড্রাগনের কেসের ওপর লেখা রবিনের নোটটা গভীর মনোযোগে পড়ছেন তিনি।

পড়া শেষ করে মুখ তুললেন। 'হুঁ, অবিশ্বাস্য!' গমগম করে উঠল ভারি কণ্ঠস্বর। 'নকল ড্রাগনকে আসল বলে চালিয়ে দেয়া, খুব বুদ্ধিমান লোকের কাজ। হ্যাঁ, কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও দেখি এবার, নোটে লেখোনি এগুলো।'

সামনে ঝুঁকল রবিন, অর্থাৎ, কি প্রশ্ন?

'স্বভাব-চরিত্রে তো মনে হয় না ক্রিমিন্যাল টাইপের লোক রোভার মারটিন,' বললেন পরিচালক। 'ডাকাতদের সঙ্গে জুটল কিভাবে?'

জবাবটা কিশোর দিল. 'সী-সাইডের গুহা আর সুড়ঙ্গগুলোর প্রতি আগ্রহ ছিল মারটিনের, আকর্ষণ ছিল। প্রায়ই ঢুকতেন গিয়ে ওগুলোতে, নতুন গুহা আর সুড়ঙ্গ আবিষ্কারের আশায়। ঘুরতে ঘুরতেই একদিন আবিষ্কার করে বসলেন. ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের নিচ দিয়ে গেছে একটা সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গগুলোর ম্যাপ এঁকে রাখতেন, কোনটা কিসের তলা দিয়ে গেছে বোঝার চেষ্টা করতেন, এভাবেই জেনেছেন ব্যাংকের তলা দিয়ে গেছে সুড়ঙ্গ।

'সাগরের পাড়ে বাস। সৈকতে দেখা হলো নিক আর জো-র সঙ্গে। ওরা স্যালভিজে কাজ করে, স্যালভিজ রিগ আছে একটা, পুরানো। ওদের সঙ্গে পরিচয় হলো তাঁর, আলাপে আলাপে ঘনিষ্ঠতা। কথায় কথায় একদিন বলে ফেললেন ব্যাংকের নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গ গেছে যে সে কথা।

'ব্যস, ধরে বসল ওরা। বোঝাতে শুরু করল মারটিনকে। শেষে রাজি করিয়ে ফেলল সোনা লুট করতে। মার্টিনের দুঃসময় চলছে, টাকার খুব অভাব। এত টাকার লোভ ছাড়তে পারলেন না। তিনজনে মিলে পরামর্শ করে ঠিক করলেন, সাবমেরিনের সাহায্যে লুট করবেন সোনা। পানির তলায় থাকবে সাবমেরিন, সেটাকে রিগের সঙ্গে বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে মেকসিকোতে, তখন কেউ আর ধরতে পারবে না।

'তবে ড্রাগন তৈরির বুদ্ধিটা মারটিনের। তাঁর মাথায় সব সময়ই উদ্ভট সব বুদ্ধি খেলে। এক ঢিলে দুই পাখি মারার সিদ্ধান্ত আরকি। ড্রাগন দেখলে লোকে ভয় পাবে, গুহার কাছে ঘেঁষবে না। যে দেখবে, সে অন্য কাউকে বলতে পারবে না, কারণ তার কথা লোকে বিশ্বাস করবে না, বরং পাগল ঠাউড়াবে।

'গুহায় বসেই ড্রাগন বানিয়েছেন তিনি, নিক আর জো সহায়তা করেছে। গুহার মুখ খোলা থাকলে লোকে যখন-তখন ঢুকে পড়তে পারে, তাই ওটাকে আগে বন্ধ করে নিয়েছেন কৃত্রিম উপায়ে, বাইরে থেকে দেখতে আসলের মত লাগে। কোনরকম লেভার রাখেননি, খোলার ব্যবস্থা করেছেন সাউণ্ড সিসটেম দিয়ে, সোনিক বীমের সাহায্যে।'

'হুঁ,' হাসলেন পরিচালক। 'বাদ সেধেছে কুকুরগুলো। কুকুরের বাঁশি আর দরজা খোলার সিসটেম এক হয়ে গিয়েছিল।'

'তা-ই,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'দরজা খোলার জন্যে হুইসেল বাজালেই কুত্তার দল ছুটে চলে আসে। লোকের চোখে পড়ে যেতে পারে ব্যাপারটা। তাহলে গুহার গোপনীয়তা আর থাকবে না। সুতরাং কুত্তাগুলোকেই আগে সরানোর মতলব করলেন মারটিন। বাঁশি বাজিয়ে ওগুলোকে গুহায় ডেকে নিয়ে গেলেন। সাবমেরিনের মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলেন। কাজ শেষ হলেই ছেড়ে দিতেন, বলেছেন আমাদের।'

'মারেনি কেন?'

'একটা পিঁপড়ে মারার ক্ষমতাও নেই তাঁর। তাছাড়া কুকুর দারুণ ভালবাসেন, কুকুররাও তাঁকে পছন্দ করে। ক'দিনেই ভক্ত হয়ে গিয়েছিল। লোক হিসেবে খারাপ নন তিনি। অভাবে স্বভাব নষ্ট, আর অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ--দুটো প্রবাদ বাক্যই এক সঙ্গে আসর করছিল মারটিনের ওপর। খারাপ লোক হলে সেদিন এত সহজে আমাদের ছেড়ে দিতেন না। কোন না কোনভাবে সোনা দিয়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করতেনই, প্রয়োজনে আমাদের খুন করে হলেও।'

'বুঝলাম।' মাথা কাত করলেন পরিচালক। 'সে-ই তোমাদের সেদিন ফোন করেছিল? ভূতের ভয় দেখিয়েছিল?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল মুসা। 'কিশোর চাপাচাপি না করলে ওই গুহায় আর

যেতামই না আমি, ভূতের ভয়ে।'

'ভয় আরও নানারকম ভাবে দেখিয়েছেন,' বলল কিশোর। 'স্যালভিজ রিগ থেকে ডুবুরির পোশাক পরে সাগরে নামত নিক আর জো, হাতে স্পীয়ারগান থাকত, যাতে লোকে দেখলে মনে করে মাছ মারতে নেমেছে। ওরা সেদিন সাগর থেকে ওঠার সময়ই আমরা দেখেছি। আমাদের দেখে খানিকটা ভয় দেখানোর লোভ ছাড়তে পারেনি ওরা। তারপর আমরা গুহায় ঢুকে পড়লাম, ওরাও ঢুকল। আসলে গুহায় ঢুকতেই আসছিল। ডুবুরির পোষাক পরার আরও একটা কারণ ছিল ওদের। ওই-যে, যে গর্তটায় পড়ে গিয়েছিল রবিন, ওটা একটা সুড়ঙ্গমুখ। শুরুতে অনেকটা গ-র মত বাঁকা, তারপর সোজা। ফলে গ-র তলার দিকে থাকে পানি আর কাদা, ওপরের অংশটা শুকনো। টানেলে ঢোকার ওটা আরেকটা গোপনপথ। ওখান দিয়েই ঢুকেছিল ওরা, তাই পরে আমরা আর ওদের দেখতে পাইনি। মনে হয়েছে, যেন গায়েব হয়ে গেছে।'

এক মুহূর্ত চুপ করে কিছু ভাবলেন পরিচালক। বললেন, 'আচ্ছা, হেরিঙের ব্যাপারটা কি? শটগান নিয়ে সে এত রাতে কি করছিলেন ওখানে?'

'মারটিনের মত তিনিও প্রায়ই সৈকতে বেড়াতে যেতেন। গুহায়ও ঢুকতেন মাঝে মাঝে। আমরা প্রথম যে গুহাটায় ঢুকেছিলাম, ওটা তাঁর পরিচিত। তক্তা সরিয়ে যেটাতে ঢুকতে হয়, ওটাও। পুরানো তক্তাগুলো প্রাচীন ডাকাতেরা লাগিয়েছিল, তার দু-য়েকটা ভেঙে গিয়েছিল। নতুন করে আবার লাগিয়েছেন হেরিঙ। মাঝে মাঝে গুহার ভেতরে পিকনিক করতে যেতেন তিনি।' চুপ করল কিশোর।

'তার মানে তাঁর চোখে কিছু পড়েছিল। কিছু সন্দেহ করেছিলেন।'

'হ্যাঁ। রাতের বেলা ড্রাগনটাকে তিনিও দেখেছেন। ডাইভারদের আনাগোনা দেখেছেন। সেদিন রাতে সী-সাইডের আলো দেখে তদন্ত করতে এসেছিলেন। বোধহয় নিক আর জো-র টর্চের আলো চোখে পড়েছিল তাঁর। তিনি বেহুঁশ হয়ে না গেলে কপালে খারাপি ছিল নিক আর জো-র। মারটিনেরও।'

'তিনি তাহলে জানেন না কিছু?'

'না। সোনাগুলো আবার ব্যাংকের ভল্টে ভরে রেখেছেন মারটিন। উল্টোপাল্টা করে রেখেছেন। যাতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারে কিছু একটা গড়বড় হয়েছে।'

'হুঁ, বেশ ভালই জোক হয়েছে। বুদ্ধিটা ভালই করেছিলে, কিশোর। আর কেউ জানে?'

'না, স্যার, শুধু আপনাকে বললাম।'

চুপচাপ কিছু ভাবলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। মুখ তুললেন। 'ভাবছি, ওকে আমার স্টুডিওতে একটা কাজ দেব। ওর মত গুণী ইঞ্জিনিয়ার···কাজে আসবে আমার।'

উজ্জ্বল হলো কিশোরের মুখ। 'খুব ভাল হবে, স্যার। আপনি তো হরর ফিল্ম তৈরি করেন। মারটিনকে খুব কাজে লাগবে আপনার। তবে আগেই হুঁশিয়ার করে

রাখবেন, যাতে কোন জোক-টোক না করে।'

'আচ্ছা, ড্রাগনটা কি করেছে? ভেঙে ফেলেছে?'

'না, আছে। কেন?'

'ভাবছি, ওটা একদিন লস অ্যাঞ্জেলেসের পথে নামাব। লোকে দেখলে কি করবে ভাব একবার।'

'আপনি নামাবেন, স্যার? বদনাম হয়ে যাবে তো।'

'না, আমি না। তুমি চালাবে। তোমরা তিনজন থাকবে ওতে, চাইলে মারটিনকেও সঙ্গে নিয়ে নিও।'

'দারুণ মজা হবে।' খুশিতে সৌজন্য ভুলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। হাততালি দিল জোরে।

কিশোরের দিকে চেয়ে মুচকি হাসলেন পরিচালক, 'এক কাজ কোরো, কি করে ক্লাচ ছাড়তে হয় ওটার, শিখে নিও মারটিনের কাছে। আমার ধারণা, ক্লাচের মধ্যেই কিছু একটা ব্যাপার আছে। বড় বাসের মত যানবাহনে যে ভাবে ডাবল-ডিক্লাচ করতে হয়, তেমন কিছু। আর সে জন্যেই ক্লাচ ছাড়া সত্ত্বেও ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে থেমে গেছে ওটা বার বার।'

'ঠিক, ঠিক বলেছেন, স্যার।' আঙুল তুলল কিশোর। 'তাই তো বলি, ক্লাচ ছাড়ি আর বন্ধ হয়ে যায়, ছাড়ি আর বন্ধ হয়ে যায়, কেন?'

****

হারানো উপত্যকা

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী, ১৯৮৯

'কিশোর, তোর চিঠি,' ডেকে বললেন মেরিচাচী, 'অ্যারিজোনা থেকে।'

বারান্দায় ছিল কিশোর, স্যালভিজ ইয়ার্ডের কাঁচেঘেরা ছোট্ট অফিস ঘরটায় ঢুকল। 'কই দেখি?'

'কার চিঠিরে? ওখানে কাকে চিনিস?'

'কি জানি, বুঝতে পারছি না,' খাম ছিঁড়ে চিঠিটা খুলল কিশোর। 'আরে, ভিকিখালা।'

'ভিকি? কোন ভিকি? একজন তো আছে বলেছিলি টুইন লেকসে।'

জবাব না দিয়ে নীরবে পড়তে শুরু করল কিশোর:

'কিশোর,

'নিশ্চয় অবাক হচ্ছ, এতদিন পর লিখলাম। সেই যে খনির রহস্য ভেদ করে দিয়ে এসেছিলে, তারপর টুইন লেকসে তো আর একবারও এলে না। সত্যি, রহস্য ভেদ করার ক্ষমতা আছে বটে তোমার।'

চিঠি থেকে মুখ তুলে বলল কিশোর, 'হ্যাঁ, চাচী, সেই ভিকিখালাই।'

'ভাল আছে তো ও? আর মিস্টার উইলসন?'

'দেখি পড়ে।'

আবার পড়তে লাগল কিশোর:

'আমরা এখন টুইন লেকসে নেই। মিস্টার উইলসন ওখানকার সব কিছু বেচে দিয়েছেন, উন্নতি হচ্ছিল না তেমন, তাই। তারপর ফিনিক্সের পুবে এসে সুপারস্টিশন মাউনটেইনের কাছে লস্ট ভ্যালিতে পুরানো এক র‍্যাঞ্চ কিনেছেন। ফিটনেস-হেলথ রিসোর্ট করবেন। কাজ চলছে, খুব কাজের চাপ আমাদের। আগামী শীতের গোড়ায় টুরিস্ট সীজনের শুরুতেই স্টার্ট করার ইচ্ছে। কিন্তু সে-আশা পূরণ হবে কিনা সন্দেহ।

'র‍্যাঞ্চটার প্রধান আকর্ষণ একটা পুরানো বিল্ডিঙ। ওটাকেই মেরামত-টেরামত করে আধুনিক একটা হোটেল করা হবে। জায়গার নামের সঙ্গে মিলিয়ে বাড়িটার নামও রাখা হয়েছে লস্ট ভ্যালি। এটা নতুন নাম। আগে নাম ছিল ইনডিয়ান হাউস। মাঝখানের বড় একটা হলরুমে ইনডিয়ানদের তৈরি অসংখ্য পুতুল সাজিয়ে রাখা হয়েছে, ক্যাচিনা পুতুল। খুব সুন্দর। আগের মালিক জোগাড় করেছিল। মিস্টার উইলসনের কাছে বিক্রি করে গেছে সব।

'বাড়ির ভেতরটা সারিয়ে নিয়ে গত বড়দিনেই এখানে উঠেছি আমরা। তারপর শুনলাম ক্যাচিনার অভিশাপের কথাটা। আমরা বাড়িতে ওঠার পর থেকেই অদ্ভুত কিছু কাণ্ড ঘটতে শুরু করেছে এখানে, নানারকম গোলমাল

হচ্ছে। জিনা মানতে চায় না—এখানেই আছে ও—কিন্তু টনির দৃঢ় বিশ্বাস বাড়িতে ভূত আছে। আরও অনেকেই একথা বিশ্বাস করে, ভয় পায়। ভূতের কথা কিছুতেই পুলিশকে বোঝানো যাচ্ছে না। তুমি যদি সাহায্য না করো, লস্ট ভ্যালি হেলথ রিসোর্টের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে।

'অনেক কামরা আছে বাড়িতে, জায়গায় অভাব নেই। স্কুল নিশ্চয় ছুটি এখন তোমাদের, মুসা আর রবিনকে নিয়ে চলে এসো না। বসন্তে মরুভূমি কিন্তু খুব সুন্দর হয়, এলেই দেখতে পারবে। ভালই লাগবে তোমাদের।

'তোমাদের আশায় রইলাম। ক্যাচিনার অভিশাপ থেকে মুক্ত কর লস্ট ভ্যালিকে, প্লীজ।

'শুভেচ্ছা,

—ভিকিখালা।'

কিশোরের পড়া শেষ হলে মেরিচাচী জানতে চাইলেন, 'কি লিখেছে?'

চিঠিটা তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে কিশোর বলল, 'নাও, পড়ো।' একটা চেয়ার টেনে বসল সে।

চাচীও পড়লেন। চিঠির কোনায় হাতে আঁকা একটা ছবি দেখালেন, 'এটা কি? ক্যাচিনা?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'অনেক দিন আগে পড়েছিলাম, কাঠ কুঁদে পুতুল বানায় দক্ষিণ-পশ্চিমের ইনডিয়ান উপজাতিরা। ওগুলোর ছবিও দেখেছি। যেমন সুন্দর, তেমনি দামী।'

'এটা তেমন সুন্দর লাগছে না,' মুখ বাঁকালেন মেরিচাচী। চিঠিটা ফিরিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'তা কি করবি?'

'যাব। অ্যারিজোনায় যাওয়ার এমন সুযোগ হাতছাড়া করব নাকি? তাছাড়া ভিকিখালা এত করে অনুরোধ করেছে।...দেখি, চাচাকে জিজ্ঞেস করে, কি বলে। রবিন আর মুসাও যেতে পারবে কিনা জানা দরকার।'

টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল কিশোর, এই সময় দেখা গেল মুসাকে। স্ট্যাণ্ডে সাইকেল তুলে অফিসের দরজায় উঁকি দিল।

'এই যে, একেবারে সময়মত এসে পড়েছ,' হাত নেড়ে ডাকল কিশোর। 'এসো।'

'কি ব্যাপার? কোন খবর আছে নাকি?'

'খবর মানে?' হাসলেন মেরিচাচী। 'ক্যাচিনা ভূতের খপ্পরে পড়তে যাচ্ছ এবার। যাই দেখি, বোরিস কি করছে?'

বিস্মিত মুসাকে চিঠিটা দেখাল কিশোর। 'পড়ো।'

'যাচ্ছ তাহলে?' চিঠি পড়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'মেরিচাচী যখন আপত্তি করেনি, আর ঠেকায় কে? তুমি যাবে? ইচ্ছে আছে?'

'বলে কি লোকটা? অ্যারিজোনা র‍্যাঞ্চে ছুটি কাটানো...'

'তোমার আম্মা যদি রাজি না হন...'

'রাজি না হলে বাড়ি থেকে পালাব না! বাবাকে আগে বলব। বাবা মাকে রাজি

করাকগে।... কিন্তু, ভাই, ওই ভূতটুতের ব্যাপারটাই ঠিক পছন্দ হচ্ছে না।'

'আগেই এত ভাবছ কেন? দেখিই না গিয়ে।'

বাইরে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারে রবিনের বাবা-মায়ের আপত্তি কোনো সময়ই খুব একটা থাকে না।

শুক্রবার সকালের প্লেনে সীট বুক করা হলো। ছুটির সময়, ভিড় বেশি, আগে থেকে টিকেট কেটে না রাখলে পরে সীট পাওয়া যায় না। ভিকিখালাকে খবর পাঠিয়ে দিল কিশোর, ওরা যাচ্ছে।

টুকিটাকি কিছু জিনিসপত্র কেনা দরকার। বাজারে গিয়ে কিনে নিল তিন গোয়েন্দা।

রকি বীচ পাবলিক লাইব্রেরিতে পার্টটাইম চাকরি করে রবিন, বুধবারে গিয়ে ছুটি নিল ওখান থেকে। রেফারেন্স বই ঘেঁটে ক্যাচিনার ওপর কিছু তথ্য জোগাড় করে লিখে নিল নোটবইতে।

অদ্ভুত সব কাঠের পুতুলের অসংখ্য ছবি রয়েছে বইটাতে।

হোপি ইনডিয়ান আর আরও কয়েকটা ইনডিয়ান উপজাতির ধর্মে রয়েছে ক্যাচিনার উপাখ্যান। পুতুলগুলো আসলে ইনডিয়ানদের কল্পিত প্রেতাত্মার প্রতিমূর্তি। বাস্তব-অবাস্তব জিনিস আর জীবের সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি হয়েছে ওগুলো। ক্যাচিনা নানারকম আছে, যেমন, মেঘ-ক্যাচিনা, জন্তু-ক্যাচিনা, উদ্ভিদ আর পাখি-ক্যাচিনা। কল্পিত ভয়াবহ দৈত্যদানবের ক্যাচিনাও আছে অনেক।

জরুরী যা যা জানার, কিশোরের কথামত বই পড়ে সব জেনে নিল রবিন। কিন্তু বইয়ের কোথাও ক্যাচিনার অভিশাপের কথা লেখা নেই। কিচ্ছু না।

যাত্রার আগের দিন আরেকটা চিঠি এল কিশোরের নামে।

'অ্যারিজোনা থেকেই!' ভুরু কোঁচকাল কিশোর। খাম ছিঁড়ে চিঠি খুলল। কাগজের কোনায় বড় করে একটা ক্যাচিনা পুতুল আঁকা, পিঠে তীর বিদ্ধ। তার তলায় কয়েকটা শব্দ, খবরের কাগজ কেটে অক্ষরগুলো নিয়ে আঠা দিয়ে পর পর সেঁটে দেয়া হয়েছে, দাঁড়ি-কমা কিছু নেই:

কিশোর পাশা
অ্যারিজোনা থেকে দূরে থাকবে।

দুই

এয়ারপোর্ট টারমিনাল বিল্ডিঙ থেকে বেরোতেই যেন মুখে আগুনের ছ্যাঁকা দিল রোদ।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'বিকেলেই এত কড়া! দুপুরে কি অবস্থা?'

'বুঝবে কালই,' বলল জিনা। বিমান বন্দর থেকে বন্ধুদের এগিয়ে নিতে এসেছে। 'তবে ভাল জিনিসও অনেক আছে। একটু পরেই দেখতে পাবে লেবু বাগান। যা মিষ্টি গন্ধ!'

একটা স্টেশন ওয়াগনের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক তরুণ, ওদের

দেখে সোজা হলো। মাথায় লম্বা কালো চুলের বোঝা, নীল চোখ। বয়েস বিশের বেশি না।

'টনি,' পরিচয় করিয়ে দিল জিনা। 'চাচার র‍্যাঞ্চে কাজ করে।...টনি, ওরা তিন গোয়েন্দা। ওদের কথাই বলেছিলাম।'

হাউ ডু ইউ ডু-র পালা শেষ হলো। গাড়িতে চড়ল সবাই। টনি বসল চালকের আসনে।

'জিনা,' কিশোর বলল, 'তোমার চেহারাই বলছে, কিছু একটা গোলমাল হয়েছে? ঘটনাটা কি?'

'চাচা,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল জিনা, 'হাসপাতালে। গতরাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'ক্যাচিনার অভিশাপ,' গাড়ি চালাতে চালাতে বলল টনি। 'আগে কিছুটা সন্দেহ ছিল, কিন্তু এ-ঘটনার পর আর অবিশ্বাস করতে পারছি না।'

'কিসের অবিশ্বাস?' কিশোরের প্রশ্ন।

'ভূত নাকি?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'আরে না, ভূতফুত কিছু না,' মাথা নাড়ল জিনা। 'পাহাড়ের ওপর আগুন দেখেছে।'

ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'খুলে বলো।'

'গতরাতে আমরা ঘুমিয়ে পড়ার পর ঘটেছে ঘটনাটা,' ঝাড়া দিয়ে মুখের ওপর থেকে তামাটে চুলের গোছা সরাল জিনা। মরুভূমির রোদে পুড়ে গাঢ় হয়ে গেছে চামড়ার রঙ। 'চাচার নাকি ঘুম আসছিল না। ছাতে গিয়েছিল হাঁটাহাঁটি করতে। হঠাৎ পাহাড়ে উজ্জ্বল আলো দেখতে পেল।'

'আলো না বলে বরং বলো আগুন,' শুধরে দিল টনি। 'আগুন জ্বেলে সঙ্কেত দিয়েছে, কোন সন্দেহ নেই।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল জিনা। 'গতরাতে পূর্ণিমা ছিল, তাই ঘরের আলো সব নিভিয়ে দিয়েছিল চাচা। আলো দেখে ছাত থেকে নেমে বাইরে বেরোচ্ছিল। হলঘর দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেল ক্যাচিনাটাকে...'

'শুধু ক্যাচিনা নয়, ক্যাচিনা ভূতটাকে,' আবার শুধরে দিল টনি। বিমান বন্দর ছাড়িয়ে শহরে ঢুকেছে গাড়ি, রাস্তার দিকে মনোযোগ দিতে হচ্ছে তাকে।

'কি দেখেছে কে জানে,' নাকমুখ বিকৃত করে বলল জিনা। 'আলো ছিল না। অন্ধকারে সিঁড়িতে কিসে যেন পা বেধে গিয়ে—কার্পেটেই হবে হয়তো, আছাড় খেয়ে পড়েছে। হলরুমে সিঁড়ির গোড়ায় পেয়েছি তাকে।'

মাথা ঝাঁকাল টনি। 'হ্যাঁ। সিঁড়ি থেকে পড়েছে। কব্জি ভেঙেছে, গোড়ালি মচকেছে। ডাক্তার বলল, ভাল হতে হপ্তাখানেক লাগবে।'

সমবেদনা জানাল মুসা আর রবিন, কিন্তু কিশোর চুপ। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কয়েকবার। 'আচ্ছা, ওই ক্যাচিনা ভূতটাকে কি আগেও দেখা গেছে?'

'কেউ কেউ নাকি দেখেছে,' জিনা জবাব দিল। 'আমি দেখিনি।'

'উইলসন আংকেল বিশ্বাস করেন?'

'না।'
'ওই ভূতের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি তথ্য কে দিতে পারবে?'
এক মুহূর্ত চুপ রইল জিনা। 'বোধহয় জুলিয়ান। দিনরাত টই টই করে ঘুরে বেড়ায় পাহাড়ে, মরুভূমিতে।'
'জুলিয়ান?'
ভিকিখালার ভাইপো। নিজের কাছে নিয়ে এসেছে খালা। তার স্বামী, মানে আংকেলও চলে এসেছে তার কাছে। আংকেল স্কুল-মাস্টার। জুলিয়ানকে পড়ানোর ভার নিয়েছে। আশা করছে, বসন্তের শেষে স্কুল খুললেই ভর্তি করে দেবে।'
'কদ্দিন হলো এসেছে?'
'এই মাস দুয়েক। ভিকিখালার ভাই ভিয়েতনামে চলে গিয়েছিল, বিয়ে করেছিল ওখানেই। জুলিয়ানের মা ভিয়েতনামী মহিলা। ভালই ছিল তারা, কিন্তু হঠাৎ কার অ্যাকসিডেন্টে মারা গেল জুলিয়ানের বাবা।'
'আহ্‌হা!' আফসোস করল মুসা। চুকচুক করল জিভ দিয়ে।
'তারপর?' জিজ্ঞেস করল রবিন।
'বিদেশীকে বিয়ে করায় জুলিয়ানের মায়ের ওপর তার আত্মীয় স্বজনরা চটা ছিল। জুলিয়ানের বাবা মারা গেলে আবার বিয়ে করতে বাধ্য করল মহিলাকে। সৎবাপ ভাল চোখে দেখল না ছেলেটাকে। শেষে ভিকিখালার কাছে চিঠি লিখল মহিলা। ওই এক ফুফু ছাড়া বাপের কুলের আর কোন আত্মীয় নেই জুলিয়ানের।
'বয়েস কত ওর?' জানতে চাইল কিশোর।
'বারো,' জবাব দিল টনি। কণ্ঠে বিরক্তির ছোঁয়া।
জিনাও বিরক্ত হলো। 'তুমি ওকে দেখতে পারো না তাই এমন করো। ও তোমার কি ক্ষতি করেছে?'
'ক্ষতি কি আর আমার করে? করছে তো তোমাদের। মিস্টার উইলসনের দুর্ঘটনার জন্যে ও-ই দায়ী, ক্যাচিনা নয়।'
'মানে?' রহস্যময় চিঠিটার কথা ভাবল কিশোর।
'মিস্টার উইলসন হলে নেমেছিলেন বাইরে বেরোনোর জন্যে, আগুন দেখে। আর ওই আগুনের জন্যে ছেলেটা দায়ী। দুটো বড় ক্যাকটাস আর একটা প্যালো ভারডে গাছ ইতিমধ্যেই পুড়িয়ে ছাই করেছে।
'সেটা তোমার অনুমান,' প্রতিবাদ করল জিনা। 'আগুন যে জুলিয়ান লাগিয়েছে, তুমি শিওর হয়ে বলতে পারবে?'
দ্বিধা করল টনি। 'ও ছাড়া আর কে লাগাবে? সারাক্ষণ র‍্যাঞ্চের চারপাশে ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়, আগুন জ্বালে...'
'আমি বিশ্বাস করি না। ভিকিখালাও না।'
'কিন্তু আগুন তো একবার সে লাগিয়েছিল, নাকি?'
'তা লাগিয়েছিল, তবে সেটা এমন কোন ব্যাপার না।' কিশোরের দিকে ফিরল জিনা। 'এ দেশের লোক আর তাদের আচার আচরণ সম্পর্কে জানতে খুব আগ্রহী জুলিয়ান। হাজার হোক, বাপের কুলের লোকদের কথা কে না জানতে চায়?

সিনেমা আর টেলিভিশন থেকে নানারকম আইডিয়া নেয় ও। একটা পুরানো ফিল্মই তার মাথায় ঢুকিয়েছে স্মোক সিগন্যালের ব্যাপারটা। পাহাড়ের ওপর চড়ে ধোঁয়ার সিগন্যাল দিতে গিয়েছিল, একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে…এ রকম আর কখনও করবে না, কথা দিয়েছে।'

'তোমার চাচা যে আলো দেখল, ওটা কিসের আলো?'

'জানি না।

'হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে দেখতে গিয়েছিলাম,' জিনার কথার পিঠে বলল টনি। 'আগুনের কোন চিহ্ন দেখলাম না। মরুভূমিতে হয় এ রকম। জ্বলে ছাই হয়ে যায় জিনিস, বাতাসে বালি উড়িয়ে এনে তার ওপর ফেলে ঢেকে দেয় সব নিশানা।'

'চাঁদের আলোর কারসাজিও হতে পারে। মনে ভূতের ভাবনা থাকলে কত কিছুই তো দেখে মানুষ,' জিনা বলল।

'জুলিয়ানের তাহলে বদনাম হয়ে গেছে খুব, না?' আনমনে বলল কিশোর।

'হ্যা। ও আসার পর থেকেই অদ্ভুত কিছু কাণ্ড ঘটেছে। কয়েক জায়গায় আগুন লেগেছে। ভূতটাও ঘনঘন দেখা দিচ্ছে। কিশোর, আমি বলছি ছেলেটা নির্দোষ।' অনুরোধের সুরে বলল জিনা, 'তুমি ওর বদনাম ঘোচাও।'

'আমি?' ভুরু কোঁচকাল কিশোর। 'কি ভাবে? অকাজগুলো যদি সত্যি সত্যি করে থাকে সে? আগুন লাগিয়ে থাকে?'

শহর থেকে বেরিয়ে এসেছে গাড়ি। পথের দু-ধারে পামের সারি, তার ওপাশে খানিক পর পরই লেবু বাগান। সেদিকে চেয়ে মাথা নাড়ল জিনা, 'ও করেনি। তুমি তদন্ত করলেই বুঝতে পারবে। কিছু একটা রহস্য রয়েছে লস্ট ভ্যালি রিসোর্টে।' কিশোরের দিকে ফিরল। 'জুলিয়ান স্বীকার করেছে, সে একবার আগুন জ্বেলেছে সিগন্যাল দেয়া প্র্যাকটিস করার জন্যে। কিন্তু রাতে গেট খুলে রাখা, ঘোড়ার বাঁধন খুলে ওগুলোকে ছেড়ে দেয়া, ও সব শয়তানীর কোনোটাই সে করেনি। ভিকিখালা তার কথা বিশ্বাস করে, আমিও করি। অনেক রকমে চেষ্টা করেছে ভিকিখালার স্বামী; ভয় দেখিয়ে বলেছে, মিথ্যে কথা বললে আবার তাকে ভিয়েতনামে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেবে। কেঁদে ফেলেছে জুলিয়ান। কসম খেয়ে বলেছে, সে ও সব কিছুই করেনি।'

'ঠিক আছে, দেখা যাক,' নিচের ঠোঁটে জোরে একবার চিমটি কাটল কিশোর। আগে ভেবেছিল, একটা রহস্য, এখন দেখা যাচ্ছে দুটো। অ্যারিজোনা মরুভূমিতে ছুটি ভালই কাটবে মনে হচ্ছে।

'র‍্যাঞ্চ আর কদ্দূর?' প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্যে বলল মুসা।

'দূর আছে এখনও,' জানাল টনি। 'ওই যে, দূরে, সুপারস্টিশন মাউনটেইন,' পুবে দেখাল সে। মরুর বুক থেকে উঠে গেছে উঁচু গিরিশৃঙ্গ।

'নীল চূড়া এক পায়ে দাঁড়িয়ে, সব কিছু ছাড়িয়ে, মনে হয় সাদা মেঘ ফুঁড়ে যায়, একেবারে উড়ে যায়, আকাশের কোণটিতে। কোথা পাবে পাখা সে…'

'হেই, কি বিড়বিড় করছ?' কনুই দিয়ে গুঁতো লাগাল মুসা।

বাধা পেয়ে থেমে গেল কিশোর। 'অ্যা! ও, না, একটা বাংলা কবিতা অ্যাডাপ্ট

করছিলাম।'

'আচ্ছা, সুপারস্টিশন মাউনটেইনের বাংলা কি হয়?'

'কুসংস্কার পর্বত। উদ্ভট নাম।'

'আর লস্ট ভ্যালি?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'হারানো উপত্যকা।'

'জিনা,' রসিকতার সুরে বলল মুসা, 'কুসংস্কার পর্বতের হারানো উপত্যকায় পোড়ো খনিটনি আছে নাকি, ওই যে, টুইন লেকসের মৃত্যুখনির মত? রহস্যটা জমে তাহলে ভাল।'

'আছে, লস্ট ডাচম্যান মাইন,' হাসল টনি। 'অ্যাপাচি জাংশনে গেলেই দেখবে, টুরিস্টদের কাছে ম্যাপ বিক্রি করছে ফেরিয়ালারা, ওখানে যাওয়ার।'

'পথে পড়বে নাকি?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'হ্যাঁ। ছোট একটা টাউন। তার পরেই আমাদের র‍্যাঞ্চ।'

'আরিব্বাবা, কত দূরে চললাম!' মুসা বলল।

'তাতে কি?' টিপ্পনী কাটল জিনা। 'আমরা সব্বাই ঘিরে রাখব তোমাকে, ক্যাচিনা যাতে তোমাকে ধরতে না পারে।'

'আমি কি ভয় পাই নাকি? বললাম, সভ্য জগৎ থেকে কত দূরে চলে এসেছি···একেবারে ওয়াইল্ড ওয়েস্ট···'

'বুনো পশ্চিম,' বাংলায় বিড়বিড় করল কিশোর।

'প্রথম প্রথম এসে আমারও খারাপ লাগত,' বলল জিনা। 'এখন তো আর এ জায়গা ছেড়ে যেতেই মন চায় না। আহ্, কমলা বাগান এসে পড়েছে! কি সুন্দর গন্ধ!'

মরুর হালকা বাসন্তী বাতাসকে ভারি করে তুলেছে কমলা ফুলের মিষ্টি সুবাস। জোরে শ্বাস টেনে গন্ধ নিল কিশোর। 'আউফ, সত্যি চমৎকার!'

'এটাকে চমৎকার বলছ, আরও আগে এলে বুঝতে চমৎকার কাকে বলে,' বলল টনি। 'ফুল তো এখন অনেক কম, মৌসুম প্রায় শেষ। ভরা মৌসুমে রাশি রাশি ফুল ফোটে, কমলা আর পাকা আঙুরের গন্ধে মৌ মৌ করে বাতাস। আমাদের র‍্যাঞ্চেও আছে কিছু গাছ। ফলও ধরেছে। পাকা আঙুর আর কমলা নিজেরাই ছিঁড়ে নিয়ে খেতে পারবে।'

'খাইছে! তাই নাকি?' তর সইছে না আর মুসার। 'তা, ভাই, তাড়াতাড়ি করো। দিলে এমন এক কথা শুনিয়ে, ধৈর্য রাখতে পারছি না আর।'

'অধৈর্য করে দেয়ার আরও অনেক কিছু আছে, মুসা আমান,' হেসে বলল জিনা। 'ভিকিখালা তো তোমাকে চেনে, তোমরা আসার সংবাদ শুনেই খাবার বানাতে লেগে গেছে। আধমণী একখান ভুঁড়ি তৈরি করে দিয়ে তারপর তোমাকে রকি বীচে ফেরত পাঠাবে এবার।'

পথের একটা বাঁক ঘুরল স্টেশন ওয়াগন। গাড়িটাকে টনি দেখল আগে, তারপর রবিন; চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে আরে, কানা নাকি!'

উল্টো দিক থেকে নাক সোজা করে গুঁতো লাগাতে ছুটে আসছে একটা কার।

তিন

সাঁই করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে পাকা রাস্তার পাশের মাটিতে গাড়ি নামিয়ে আনল টনি। অসমতল জায়গায় পড়ে নাচতে শুরু করল স্টেশন ওয়াগন, প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। নানারকম সুরে চেঁচামেচি জুড়ল আরোহীরা। আতঙ্কিত চোখে তাকাল ঢালের দিকে। কঠিন পাথুরে মাটির ঢাল নেমে গেছে প্রায় দশ-বারো ফুট, তারপর শুরু হয়েছে মাঠ, তাতে বড় বড় কাঁটাঝোপ।

রুখতে পারল না টনি, ঢালে নেমে গেল গাড়ির সামনের চাকা। এরপর আর আটকানোর উপায় নেই, ব্রেক করলে উল্টে যাবে।

লাফাতে লাফাতে মাঠে নামল গাড়ি, ঝোপঝাড় ভেঙে এসে থামল। ইঞ্জিন গেল বন্ধ হয়ে। হুইল শক্ত করে চেপে ধরে আছে এখনও টনি, আটকে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়ল শব্দ করে। 'ব্যাটা মনে হয় গলা পর্যন্ত টেনেছে। এভাবে গাড়ি চালায় কেউ?'

মুসার বাহু খামচে ধরে রেখেছিল জিনা, আস্তে করে ছেড়ে দিল।

'বাপরে বাপ, বাঘের নখ; না না, বাঘিনীর! রক্ত বের করে ফেলেছে,' বাহু ডলছে মুসা। 'তা টনি, এখানে লোকে এভাবেই গাড়ি চালায় নাকি হে?'

'ইচ্ছে করে করেছে শয়তানিটা,' গম্ভীর হয়ে আছে কিশোর। 'ঠেলে ফেলে দিতে চেয়েছিল আমাদের। অ্যাক্সিডেন্ট করাতে চেয়েছিল। রহস্যময় চিঠিটা ফালতু শাসানী বলে আর মনে হচ্ছে না এখন।'

'আমারও তাই মনে হলো,' একমত হলো রবিন। 'কিন্তু কেন?'

'ক্যাচিনা রহস্যের সঙ্গে কোন যোগাযোগ আছে হয়তো,' চিন্তিত দেখাচ্ছে কিশোরকে।

ফিরে চাইল টনি। 'লাইসেন্স নাম্বার দেখেছ?'

এত তাড়াতাড়ি ঘটেছে ঘটনা, দেখার সময়ই পায়নি কেউ।

'হুঁ,' স্টার্টারের চাবিতে হাত দিল টনি। 'এখন এটার ইঞ্জিন চালু হলেই বাঁচি।' কয়েকবারের চেষ্টায় চালু হলো ইঞ্জিন। ঝোপঝাড়ের কিনার দিয়ে গাড়ি চালাল সে। কিছুদূর এগোনোর পর মাঠের সঙ্গে এক সমতলে এসে গেল পথ। রাস্তায় উঠল গাড়ি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল আরোহীরা।

মেসা ছাড়িয়ে এল ওরা। পাতলা হয়ে এসেছে পথের দু-ধারের ঝোপ। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বাড়িঘর। নির্মেঘ নীল আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে উঁচু উঁচু স্যাগুয়ারো ক্যাকটাস। বিচিত্র ডালপাতা। বসন্ত, তাই ফুল ফুটেছে। ডালের মাথায় মাখনরঙা ফুলের মুকুট।

অ্যাপাচি জাংশন পেরোল। সরু হয়ে এল পথ।

হাত তুলে দূরে বাড়িটা দেখাল জিনা।

'একেবারে তো দুর্গ,' মুসা বলল।

হাসল জিনা। 'প্রথমবার দেখে আমিও তাই বলেছিলাম।'

'দুর্গের বাড়া,' বলল টনি। 'কয়েক ফুট পুরু দেয়াল। এভাবে বানানোর কারণ আছে। ইন্ডিয়ানদের রাজত্ব ছিল তখন এখানে। নিরাপত্তা চেয়েছিলেন মিস্টার লেমিল।'

'দূর থেকে দেখলে মনে হয় পাহাড়েরই অংশ,' রবিনের মন্তব্য।

'সুপারস্টিশন থেকে এসেছে বেশির ভাগ পাথর। বাইরেটা যেমন আছে তেমনি রেখে দিয়েছেন মিস্টার উইলসন, কিছুই বদলাননি। পুরানো গন্ধটা রাখতে চেয়েছেন আরকি। টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন বাড়বে।'

'ফ্যানটাসটিক!' মুগ্ধ হয়ে দেখছে মুসা। 'এরকম বিল্ডিঙ আছে, ভাবিনি।'

'অন্য বাড়িগুলো কোনটা কি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ডানের ছোটটা আস্তাবল,' বলল জিনা, 'ওই যে পাশেই কোরাল। উল্টোদিকের ছোট ছোট বাড়িগুলো বাড়তি বাংলো। লোক বেশি হয়ে গেলে ওখানে জায়গা হবে। মেইন হাউসের পেছনে বিশাল স্নানের ঘর আছে, সুইমিং পুল আছে। কাছাকাছি টেনিস কোর্ট, র‍্যাকেটবল কোর্ট তৈরি হচ্ছে।' দম নিয়ে বলল, 'অনেক কিছুই তৈরি বাকি এখনও।'

'হুঁ, খুব বড় কাজ হাতে নিয়েছেন,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'তোমার চাচাকে সাহায্য করার কে কে আছে?'

'ভিকিখালা আর তার স্বামী, মিস্টার ডিউক। টনি আছে, প্রায় সব কাজই দেখাশোনা করে। আর আছে ডক্টর জিংম্যান,' হাসল জিনা। 'ডক্টর জিংম্যান আমাদের সবচেয়ে নিকট প্রতিবেশী। বাড়ি ওই-ই দিকে,' পর্বতের দিকে হাত তুলে দেখাল সে। 'খুব সাহায্য করে চাচাকে।'

'দশ-পনেরোজন মেহমানকে এখনই জায়গা দিতে পারি আমরা,' জানাল টনি। 'বাংলোগুলো হয়ে গেলে আরও বিশ-বাইশ-জনকে দিতে পারব।'

'আসলে হচ্ছেটা কি এখানে?' জিজ্ঞেস করল রবিন। সরু পথের দুই ধারে ক্যাকাসে সবুজ গাছগুলো ছোট ছোট হলুদ ফুলে বোঝাই, সেদিকে চেয়ে আছে সে। 'লোক দেখানো...মানে ডিউড র‍্যাঞ্চ, নাকি সত্যি সত্যি র‍্যাঞ্চ এটা?'

'তারমানে র‍্যাঞ্চ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা আছে তোমাদের, ভাল,' মাথা কাত করল টনি। 'এটাকে র‍্যাঞ্চ না বলে হেলথ রিসোর্ট বলা উচিত। মিস্টার উইলসন চান, বদ্ধ জায়গায় থাকতে থাকতে যাঁরা বিরক্ত হয়ে গেছেন, তাঁরা এখানে এসে খোলা হাওয়ায় একটু দম নেবেন, সেই সঙ্গে কিছুটা ব্যায়াম, কিছুটা বিশ্রাম আর খাওয়া-দাওয়াটা ঠিকমত করবেন। তাজা হয়ে ফিরে যাবেন আবার শহরে।'

'ঠিকমত খাওয়া?' শঙ্কিত হলো মুসা। 'ডায়েট কন্ট্রোলের ব্যাপার-স্যাপার না তো?'

'আরে না,' হাসল জিনা, তার হাসিতে যোগ দিল সবাই। 'ওজন কমানোর কোন ব্যাপার নেই। ভিকিখালার পাল্লায় পড়ে বরং তালপাতার সেপাইরা নাদুস নুদুস হয়ে ফিরে যাবে। তবে কেউ যদি ভুঁড়িটুরি কমাতে চায়, তাহলেও অসুবিধে নেই। ওই কাজেও ভিকিখালা ওস্তাদ। নাচ, ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার, সব কিছুরই ব্যবস্থা

থাকবে এখানে।'

'শুনতে ভাল লাগছে,' বলল কিশোর। 'টুরিস্ট আকর্ষণের চমৎকার ব্যবস্থা। সাধারণ রিসোর্টের চেয়ে আলাদা।'

হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল জিনার ঠোঁটে। 'যদি ক্যাচিনার *অভিশাপ* থেকে মুক্তি মেলে। ভূতের উপদ্রব ঘটতে থাকলে একজন লোকও আসবে না।'

ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে কি বলল টনি, বোঝা গেল না। রাস্তা শেষ, ড্রাইভওয়েতে পড়েছে গাড়ি। গাড়িপথের কাজ পুরোপুরি শেষ হয়নি এখনও, এবড়োখেবড়ো হয়ে আছে। এগিয়ে গেছে পুরানো বাড়িটার দিকে। মেসকিট ঝোপ আর ক্যাকটাস ঘন হয়ে জন্মেছে সামনের দিকে। গাড়িপথ ধরে বাড়ির পাশ দিয়ে গিয়ে মোড় নিতেই সামনের দৃশ্য দেখে প্রায় চমকে গেল তিন গোয়েন্দা।

পেছনে রুক্ষ মরুর বিশাল বিস্তার, তাতে পুষ্পশূন্য ধূলিধূসরিত ক্যাকটাস, মাঝে পাতাবাহারের নিচু বেড়া। বেড়ার এপাশে সবুজের সমারোহ, ঝিক করে চোখে লাগে। ঘন সবুজ রসাল ঘাসে ঢাকা লন, রঙিন ফুলের ঝাড়, কমলা লেবুর বাগান। কমলার গন্ধ ভুরভুর করছে গরম বাতাসে। বিরাট বাগানের ঠিক মাঝখানে সুইমিং পুল, স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পানিতে আকাশ দেখা যায়, মনে হয় পানির রঙই বুঝি ঘন নীল। তার পাশে ধবধবে সাদা একটা বাড়ি। সব কিছুই সাজানো গোছানো, যেন ছবি। এখনও নাকি পুরোপুরি তৈরিই হয়নি। হওয়ার পর কি হবে ভেবে অবাক হলো ওরা।

'আরিব্বাবা, দারুণ!' সহজে প্রশংসা করে না যে কিশোর পাশা, তার মুখ দিয়েও বেরিয়ে গেল এই কথা।

'পছন্দ হয়েছে, না?' হেসে বলল টনি। 'তারমানে সফল হয়েছি আমরা। দর্শককে চমকে দিতে পেরেছি।'

'রূপকথার রাজ্য মনে হয়,' বিড়বিড় করল রবিন।

'মরুভূমিতে মরূদ্যান,' মুসা বলল।

গাড়ি রাখল টনি। নামল সবাই।

'সাঁতারের পোশাক এনে তো ভালই করেছি দেখা যায়,' সুইমিং পুলটার দিকে লোভাতুর নয়নে তাকিয়ে আছে মুসা। 'কি রবিন, খুব তো হাসাহাসি করেছিলে, মরুভূমিতে ব্যাদিং সুট দিয়ে কি করব বলে বলে; এখন?'

'জিনা,' টনি বলল, 'তুমি ওদের নিয়ে এসো। আমি ভিকি আন্টিকে খবর দিচ্ছি।' দুই হাতে বিশাল দুই সুটকেস তুলে নিয়ে বাড়ির দিকে এগোল সে।

'ওদিকে আরও গোটা তিনেক বাংলো বানানোর ইচ্ছে আছে চাচার,' মরুভূমির দিকে দেখিয়ে বলল জিনা। 'আরও ছয়জনের জায়গা হবে তাহলে।'

'ভালই প্ল্যান করেছেন তিনি,' দেখতে দেখতে বলল কিশোর। 'লোকে ভাববে মরুভূমিতে যাচ্ছে, দেখবে শুধু বালি আর বালি। এসে যাবে চমকে, আমাদের মত। মরুভূমিও আছে, আবার সবুজও আছে। কষ্ট করতে হবে এটা ধরে নিয়েই আসবে, এসে পাবে এই আরাম। ফলে আরামটা আরও বেশি মনে হবে।'

'ইচ্ছে করলে ঘোড়ায় চড়ে চলে যাওয়া যায় পর্বতের ওদিকে,' জিনা বলল।

'চাইলে ওখানে রাতও কাটানো যায়। আহ্, কি যে মজা! আমি একবার গিয়েছিলাম। রাতে আগুনের কিনারে শুয়ে মনে হলো, দেড়শো বছর পিছিয়ে চলে গেছি সেই বুনো পশ্চিমে...' দরজা খুলতে দেখে থেমে গেল সে।

ভিকি বেরিয়ে ছুটে এল দু-হাত বাগিয়ে। 'তোমরা এসেছ। যাক, নিশ্চিন্ত হলাম।' সূক্ষ্ম একটা দুশ্চিন্তার ছায়া দেখা গেল তার চেহারায়।

কোনরকম ভূমিকায় না গিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করল কিশোর, 'কি হয়েছে, খালা? খারাপ কিছু?'

'খানিক আগে ডাক্তার এসেছিল, জানতে, জুলিয়ান একটা অ্যাপালুসা নিয়ে এসেছে কিনা।'

'কী?' ভুরু কোঁচকাল জিনা।

অস্বস্তি ফুটল ভিকির চোখে। 'ডেনিংদের আস্তাবলে নাকি একটা ঘোড়া পাওয়া যাচ্ছে না। কে জানি জিংম্যানকে বলেছে, একটা মাদী ঘোড়াকে টেনে আনতে দেখা গেছে একটা ছেলেকে।' এদিক ওদিক তাকাল। 'সাদাকালো পিন্টো ঘোড়ায় চেপেছে ছেলেটা।'

'ওটায় চড়ে এখানে এসেছিল নাকি?'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল ভিকি। 'বাড়িই আসেনি সারাদিন। গতরাতে মিস্টার উইলসন হাত-পা ভাঙায় ভীষণ ঘাবড়ে গেছে সে। মনমরা হয়ে আছে তারপর থেকে। সকালে খেয়ে সেই যে বেরিয়েছে, আর দেখিনি তাকে।'

'কোথায় দেখা গেছে তাকে, জিংম্যান কিছু বলেছে?'

মাথা নাড়ল ভিকি।

'ডিনারের দেরি আছে।' মেহমানদের দেখিয়ে বলল জিনা, 'ওদেরকে ওদের ঘরে দিয়ে আসি। তারপর দেখি, আমি আর টনি খুঁজতে বেরোব। তুমি কিছু ভেব না খালা। ওই চেরিই একমাত্র সাদাকালো পিন্টো ঘোড়া না এখানে, আরও আছে। আর জুলিয়ানের বয়েসের ছেলেও আছে। অন্য কাউকেও দেখে থাকতে পারে ওই লোক।'

হাসল ভিকি, কিন্তু ভাবনার কালো ছায়া দূর হলো না চেহারা থেকে।

সাদাকালো ঘোড়ায় চড়ে আসতে দেখা গেল একটা ছেলেকে। দড়িতে বেঁধে টেনে আনছে একটা ছাইরঙ মাদী অ্যাপালুসা ঘোড়া, পেছনটা ভারি সুন্দর, সাদার ওপর ছাই রঙের ফোঁটা। চকচকে চামড়া থেকে যেন তেল চুঁইয়ে পড়ছে।

'অ্যাই, ফুপু,' দূর থেকেই ডেকে বলল ছেলেটা, 'দেখো, কি এনেছি। মরুভূমিতে ঘুরছিল, ধরে নিয়ে এলাম। সুন্দর, না?'

'জুলিয়ান,' কেঁদে ফেলবে যেন ভিকি, 'কেন...'

হাত তুলে ভিকিকে চুপ করাল কিশোর। জুলিয়ান আরও কাছে এলে জিজ্ঞেস করল, 'মরুভূমিতে পেয়েছ?' এগিয়ে গেল সে।

লাজুক হাসি হাসল জুলিয়ান, অনেকটা মেয়েলি চেহারা। 'অ, তোমরা এসে পড়েছ। তোমাদের কথা শুনেছি ফুপুর কাছে। তুমি নিশ্চয় কিশোর পাশা।'

'হ্যাঁ। আর ও...'

'বোলো না, বোলো না। শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে। ও মুসা আমান, আর ও রবিন মিলফোর্ড।...হ্যাঁ, কি যেন বলছিলে...মরুভূমিতে পেয়েছি নাকি ঘোড়াটাকে? হ্যাঁ, পেয়েছি। ছাড়া পেয়ে ঘুরছিল। ডাকতেই কাছে চলে এল। বড় রাস্তায় চলে গেলে তো আর পাওয়া যেত না, ডাকলেই যখন কাছে যায়, কে না কে ধরে নিয়ে যেত। আমি নিয়ে এলাম, ভাল হলো না?'

'নিয়ে সোজা আস্তাবলে গেলে ভাল করতে,' জিনা বলল। 'যাকগে, এসেছ এসেছ, এখন চলে যাও। আমি ফোন করে জানিয়ে দিচ্ছি ওদেরকে, তুমি ঘোড়াটা খুঁজে পেয়েছ।'

'আচ্ছা,' মাথা কাত করে সায় জানাল জুলিয়ান। পিন্টোর মুখ ঘুরিয়ে অ্যাপালুসাটাকে টেনে নিয়ে চলে গেল।

সেদিকে চেয়ে অস্বস্তিভরে মাথা নাড়ল ভিকি। 'ঠিক ওকে চোর ভাববে ওরা!' তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরল সে। 'কি যে করব, বুঝি না! একটা সমস্যা! এসেই এ সব ঝামেলা দেখে নিশ্চয় বিরক্ত হচ্ছ। এসো, ঘরে এসো।'

পাথরের বাড়িটার ছায়ায় এসে অকারণেই গায়ে কাঁটা দিল কিশোরের। অথচ বাতাস গরম এখানেও। অবচেতন মন বলছে, হুঁশিয়ার! বিপদ আসছে!

চার

বিশাল বাড়ির ভেতরটাও চমকে দেয়ার মত। পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে এগোলে সামনে পড়বে মস্ত এক ঘর, সাজানো গোছানো সোফা আর চেয়ার, বসে কথা বলার জন্যে। এক কোণে একটা টেলিভিশন সেট। পেছনের দ্বিতীয় দরজা দিয়ে ঢুকলে, অতি-আধুনিক রান্নাঘর। ওরা ঢুকল সেখানেই। বাতাসে খাবারের লোভনীয় গন্ধ।

নাক কুঁচকে গন্ধ শুঁকল মুসা। 'খাইছে! কমলাফুলের গন্ধের চেয়ে ভাল।'

'ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হয়ে যাবে,' ভিকি বলল। 'রাঁধছিলাম, এই সময় এল ডাক্তার।'

'তুমি লেগে যাও আবার, খালা,' জিনা বলল। 'জিংম্যানের সঙ্গে আমি কথা বলব। ডেনিংদেরও ফোন করব।'

'আচ্ছা।' চুলার দিকে এগোল ভিকি।

তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে খোলামেলা একটা ডাইনিং রুমে ঢুকল জিনা। অন্যান্য ঘরের মতই এটাও বিরাট। চার কিংবা ছয় চেয়ারের অনেকগুলো খাবার টেবিল। কিশোর আন্দাজ করল, জায়গা যা আছে, তাতে এর ডবল চেয়ার-টেবিল জায়গা হবে। ছোট ছোট ইনডিয়ান কম্বল আর চাদর দিয়ে দেয়াল সাজানো। বেশ কয়েকটা পেইন্টিং রয়েছে, সবই মরুভূমির দৃশ্য। ইনডিয়ান ঝুড়িতে কায়দা করে সাজানো রয়েছে শুকনো ফুল, পাপড়ি শুকিয়ে গেলেও ঝরে যায়নি। ইচ্ছে করেই পুরানো 'ওয়েস্টার্ন' পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে।

'এসো, তোমাদের ঘর দেখিয়ে দিই,' জিনা বলল। 'তারপর জুলিয়ানের

ব্যাপারটা দেখতে হবে। ভাবছি, বিকেলটা তোমাদের সঙ্গে কাটাব...'

'তোমার কি মনে হয়, জিনা?' প্রশ্ন করল কিশোর। 'জুলিয়ান ঘোড়াটা চুরি করে এনেছে?'

'সে কথা ভাবতেও খারাপ লাগে,' ঘুরিয়ে জবাব দিল জিনা। 'কি আর বলব? ভিকিখালার কাছে শুনলাম, ভালই কাটছিল এখানে তাদের। জুলিয়ান ঘোড়ায় চড়া শেখার পর থেকেই নানারকম গোলমাল...'

'আমার কাছে কিন্তু বেশ চালাক ছেলে মনে হলো,' রবিন বলল। 'ইংরেজি তো ভাল বলে। এখানে এসে এত তাড়াতাড়িই শিখে ফেলল?'

'ওর মা ইংরেজি জানে। সে জন্যেই শিখতে পেরেছে। বাবা তো মারা গেছে ওর তিন বছর বয়েসের সময়। বাবার চেহারাই ভালভাবে মনে করতে পারে না।'

ডাইনিং রুম থেকে ওদেরকে আরেকটা হলরুমে নিয়ে এল জিনা।

'আরে! ওগুলো ক্যাচিনা?' অবাক হয়েছে মুসা। সাজানো দেয়ালের দিকে চেয়ে আছে সে।

'চাচার প্রাইভেট গ্যালারি এটা,' হেসে বলল জিনা। 'এবং আমাদের ঘরোয়া ভূতের বাসস্থান।'

'এসব কিচ্ছা নিশ্চয় বিশ্বাস করো না তুমি?' বলে উঠল কেউ।

ফিরে তাকাল সবাই। উল্টোদিকের একটা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকছে লম্বা, বলিষ্ঠদেহী এক লোক।

'ও, ডাক্তার আংকেল, এসে পড়েছেন,' বলল জিনা। 'আপনার কথাই ভাবছিলাম। ফোন করতাম।' জুলিয়ানের ঘোড়া নিয়ে আসার সংবাদ সংক্ষেপে জানাল ডাক্তারকে।

'ঠিক আছে,' ডাক্তার বলল, 'তোমার আর ফোন করার দরকার নেই। ডেনিংদের আমিই জানিয়ে দেব।'

এ ক্ষণে যেন তিন গোয়েন্দার ওপর চোখ পড়ল ডাক্তারের।

পরিচয় করিয়ে দিল জিনা।

'অ, তোমরাই তাহলে সেই বিখ্যাত তিন গোয়েন্দা।' কিশোরের দিকে ফিরল জিংম্যান। 'ভিকি আর জিনার ধারণা, তুমি এলে ওই ভূত-রহস্যের সমাধান হবেই হবে।'

হাসল শুধু কিশোর, কিছু বলল না।

'তা-তো হবেই,' জোর গলায় বলল জিনা। 'কিশোর পাশার কাছাকাছি থাকলে ভূতের আরামের দিন শেষ।'

'বাড়িয়ে বলছ,' বলল কিশোর। 'পারব কিনা জানি না, তবে ভূত তাড়ানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমরা। বদনাম যে কোন রিসোর্টের জন্যে মারাত্মক।'

'আমিও তো সে কথাই বলি,' সঙ্গে সঙ্গে কথাটা ধরল ডাক্তার। 'ওই ছেলেটাকে নিয়েই যত ভয়। যে হারে গোলমাল পাকাচ্ছে...জিনা, তোমার চাচার স্বার্থেই বলি, ছেলেটা ও রকম করতে থাকলে কিন্তু সাংঘাতিক বদনাম হয়ে যাবে। আর পড়শীদের সঙ্গে তোমার চাচার সম্পর্ক ভাল না থাকলে, এই রিসোর্ট চালাতে

পারবে না।'

'জুলিয়ানের কথা বলছেন তো? কিন্তু ওর বয়েসী একটা ছেলে কি আর এমন গোলমাল পাকাবে, যে সবাই অস্থির হয়ে থাকবে?' জুলিয়ানের লজ্জিত হাসি, বড়বড় বাদামী চোখ আর ঘোড়ার পিঠে জড়সড় হয়ে বসে থাকার দৃশ্য কল্পনা করল কিশোর। নাহ্, ওই ছেলে খারাপ কিছু করবে বলে ভাবা যায় না।

'যা করছে তা-ই যথেষ্ট,' গম্ভীর হয়ে বলল ডাক্তার। 'অ্যাপালুসাটার অনেক দাম। শুধু চুরিই নয়, আরও অনেক শয়তানী সে করেছে। এ-যাবৎ তো শুধু গাছ জ্বালিয়েছে, কোনদিন গোলাঘর আর খড়ের গাদায় আগুন লাগায় কে জানে। না জিনা, হেসে উড়িয়ে দেয়ার কোন মানে হয় না। এসব ব্যাপার সিরিয়াসলি নেয়া উচিত।'

ডাক্তারের কণ্ঠস্বরে অবাক হলো জিনা। কিছু বলতে যাচ্ছিল, এই সময় ঘরে ঢুকল টনি। 'এই যে, ডাক্তার আংকেল, আপনাকেই খুঁজছি।'

র‍্যাঞ্চ সংক্রান্ত কাজের কথায় মশগুল হলো দু-জনে।

দেয়ালের ছবিগুলোর দিকে ঘুরল জিনা। তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে এগোল। 'খুব সুন্দর, না? কেউ কেউ পরামর্শ দিয়েছে, ওগুলো ফেলে দিতে। তাহলে নাকি ভূত চলে যাবে।'

'মাথা খারাপ,' বলল রবিন। 'রিআল আর্ট ওগুলো।'

'কি ক্যাচিনা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'দেখে তো কিছু বোঝা যায় না।'

লাল, সাদা আর হলুদে আঁকা একটা ছবি দেখিয়ে জিনা বলল, 'ওটা মেঘ ক্যাচিনা। ওই যে, পালকের পাখার মত মনে হচ্ছে, ওটা ঈগল ক্যাচিনা। এই যে, সাদা রোমশ, এটা ভালুক ক্যাচিনা।' নীল মুখোশ আর সাদা কিম্ভূত শরীর দেখিয়ে বলল, 'প্রিকলি-পার ক্যাকটাস ক্যাচিনা। কয়েকটা অদ্ভুত ছবি দেখাল, 'ওগুলো কি, কেউ বুঝতে পারেনি। চেনা যায় না।'

'হুঁ,' অচেনা ছবিগুলো দেখতে দেখতে বলল রবিন, 'টুরিস্টরা পছন্দ করবে।'

'আমারও তাই মনে হয়।' হাসল জিনা। 'আচ্ছা, বলো এখন, কে কোথায় থাকবে? এ ঘরের পাশেই দুটো ঘর আছে। ওখানে থাকলে যখন খুশি এসে ছবিগুলো দেখতে পারবে। ঘর আছে দুটো, কোনটাতেই দু-জনের বেশি জায়গা হবে না। একলা কে শুতে চাও?'

'আমিই থাকি, কি বলো?' মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল কিশোর।

'থাকো।' হাত নাড়ল মুসা। 'আমি বাপু ভূতের ঘরের কাছে একলা থাকতে পারব না।'

দুটো ঘর থেকেই দরজা দিয়ে হলঘরে ঢোকা যায়।

'বাড়ির সামনের অংশ ছেড়ে দিতে হয়েছে লবি আর অফিসের জন্যে,' জিনা জানাল। 'তাই সমস্ত বেডরুমের দরজা হলের দিকে করা হয়েছে। আমার আর টনির ঘর তোমাদের ঘরের কাছেই। চাচার ঘরও। সব কিছু ঠিকঠাক হলে এ ঘর মেহমানদের ছেড়ে দিয়ে চাচা চলে যাবে ওপরে।'

'ভিকিখালারা কোথায় থাকছে?'

'আপাতত দোতলায়,' আঙুল তুলে মাথার ওপরের ছাত দেখাল জিনা।

'ভূতটাকে কোন জায়গায় দেখেছেন তোমার চাচা?'

'এ ঘরেই। প্রথমে ভাবল চোরটোর কিছু, ধরার জন্যে দৌড় দিতে গিয়ে কার্পেটে পা বেধে খেলো আছাড়।···ভূতটাকে মিলিয়ে যেতে দেখল ওই ছবিটার ভেতর···' নাম-না-জানা একটা ক্যাচিনা দেখাল জিনা।

স্থির চোখে ছবিটার দিকে চেয়ে রইল কিশোর। যেন ছবির মুখোশে ঢাকা মূর্তিটা মূল্যবান তথ্য জানাবে তাকে।

কিন্তু আগের মতই রইল ছবিটা, দুর্বোধ্য। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। 'চলো, ঘর দেখাও। হাতমুখ ধুয়ে রেডি হইগে। ভিকিখালা ডাকলে···'

'না, অত তাড়াহুড়ো নেই। রান্না শেষ হতে সময় লাগবে। ইচ্ছে করলে ছোট্ট একটা নিদ্রাও দিয়ে নিতে পারো।'

'আরে না, এখন কি ঘুমায়,' তাড়াতাড়ি বলল মুসা। 'পেট ঠাণ্ডা না করলে ঘুম আসবে না।'

ছেলেদের সুটকেস আর অন্যান্য মালপত্র সব একই ঘরে রেখেছে টনি। সুটকেসের হাতলে এয়ারলাইনসের নাম ছাপা ট্যাগ লাগানো, ট্যাগের উল্টোপিঠে যাত্রীর নাম, পাসপোর্ট নম্বর।

নিজের সুটকেসটা তুলে নিয়ে এল কিশোর। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। সুটকেসের খোপ থেকে চাবি বের করে তালায় ঢুকিয়ে মোচড় দিল। খোলা!

তালা লাগাতে ভুলে গিয়েছিল?—নিজেকেই প্রশ্ন করল সে। রওনা হওয়ার আগে তাড়াহুড়ো করেছে, ঠিক, তবু তালা না লাগিয়ে···সুটকেস খুলে কাপড় বের করতে শুরু করল। কোনটা কোথায় রেখেছিল, মনে করার চেষ্টা করছে। ঠিকমত আছে তো সব? নাকি ঘাঁটাঘাঁটি হয়েছে?

মনে হলো ঠিকই আছে।

কিন্তু নতুন কেনা শার্টটা টান দিতেই ভেতরে কি যেন নড়ে উঠল। হাত সরিয়ে নিল ঝট করে। ভাঁজ করা শার্টের এক কোনা দুই আঙুলে আলতো করে ধরে তুলে একটা হ্যাঙার দিয়ে খোঁচা দিল ফুলে থাকা জায়গায়। আরও জোরে নড়ে উঠল জায়গাটা। ভেতর থেকে টুপ করে মাটিতে খসে পড়ল কি যেন।

হাঁ হয়ে গেল কিশোর। বড় বড় হয়ে গেল চোখ। বড় বাঁচা বেঁচে গেছে!

প্রায় আড়াই ইঞ্চি লম্বা এক কাঁকড়াবিছে! ভীষণ ভঙ্গিতে নাড়ছে বাঁকানো লেজটা—ডগায় বেরিয়ে আছে মারাত্মক বিষাক্ত হুল।

পাঁচ

বোবা হয়ে কুৎসিত জীবটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। কিলবিল করে এগিয়ে আসছে ওটা। হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরে পেল সে। পায়ে শক্ত সোলের জুতো, লাফ দিয়ে গিয়ে মাড়িয়ে ভর্তা করে ফেলল বিছেটাকে।

'সুটকেসে এল কিভাবে?' বিড়বিড় করল আপনমনে। 'রকি বীচ থেকে সঙ্গে

আসেনি, শিওর।'

লেজ ধরে খেঁতলানো দেহটা তুলে নিয়ে ফেলে দিল ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে।

ভাবছে, এয়ারপোর্টে কোনভাবে ঢুকল, নাকি এখানে আসার পর···রহস্যময় চিঠিটার সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে?

তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে ইচ্ছে করেই সুটকেসে ঢুকিয়ে দিয়েছে কেউ। কে ঢোকাল? সেই ড্রাইভারটা, যে অ্যাক্সিডেন্ট করতে চেয়েছিল? চিঠিটাও কি ওই ড্রাইভারই পাঠিয়েছে?

একটা ব্যাপার পরিষ্কার, কেউ একজন চাইছে না, ভূত-রহস্যের তদন্ত হোক। শুরু থেকেই সে জানে—ভিকিখালা চিঠি দেয়ার সময় থেকেই, তিন গোয়েন্দাকে দাওয়াত করে আনা হচ্ছে তদন্ত করার জন্যে। রহস্যের কিনারা হলে নিশ্চয় তার কোন অসুবিধে আছে। তাই ঠেকিয়ে রাখতে চাইছে?

কিন্তু অসুবিধেটা কি? 'যা-ই হোক, হুঁশিয়ার থাকতে হবে,' নিজেকে বলল কিশোর। কাপড় পাল্টাতে শুরু করল।

ডিনার শেষে রান্নাঘরের লাগোয়া বৈঠকখানায় বসল ছেলেরা। জিনা আর টনিও রয়েছে সঙ্গে।

কাঁকড়াবিছের কথা শুনে দু-জনের কেউই অবাক হলো না।

'এখন তো নেইই,' বলল টনি। 'বাড়িটাতে যখন প্রথম ঢুকলাম তখন এলে বুঝতে। যেখানেই হাত দিতাম, বিছে বেরোত। মেরে সাফ করেছি। তবু, সকালবেলা না দেখে জুতোয় পা ঢুকিও না।'

'বাপরে,' মুসা বলল। 'রাতে কম্বলের মধ্যে ঢুকবে না তো?'

'ঘরে থাকলে ঢুকতেও পারে,' হাসল টনি। 'তবে মনে হয় নেই। গত হপ্তায় আরেকবার ঘর ঝাড়া দিয়েছি।'

'তাহলে কিশোরের সুটকেসে এল কোত্থেকে?'

'বোধহয় বাইরে থেকে।'

'ঠিক, আমিও একমত,' আঙুল তুলল কিশোর, 'বাইরে থেকেই এসেছে। তবে, নিজে নিজে ঢোকেনি। ঢোকানো হয়েছে।'

'মানে? ভুরু কোঁচকাল টনি।

'মানে সুটকেস তালা দেয়া ছিল। পরে খোলা পেয়েছি। বিছেটাকে ঢুকিয়ে রেখে তালা আটকানোর কথা মনে ছিল না বোধহয় আর,' আড়চোখে টনির দিকে তাকাল কিশোর।

'কে ঢোকাতে যাবে? কেন?'

'এই চিঠিটা দেখলেই কিছুটা আন্দাজ করতে পারবে, কেন ঢুকিয়েছে,' এক লাইনের চিঠিটা বের করে দিল কিশোর। তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করছে টনিকে।

হাসি হাসি মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল টনির। 'হুঁ! অ্যাক্সিডেন্টও তখন ইচ্ছে করে ঘটাতে চেয়েছে।'

'তাই কি মনে হয় না?'

জবাব দিল না টনি।

সারাদিন ধকল অনেক গেছে তিন গোয়েন্দার ওপর দিয়ে। ভ্রমণের পরিশ্রম আর উত্তেজনা চাপ দিতে আরম্ভ করেছে শরীরের ওপর। ক্লান্তি বোধ করছে ওরা। তাড়াতাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ার তাগিদ অনুভব করছে তিনজনেই।

খানিকক্ষণ চুপ করে রইল সবাই। অবশেষে জিনা বলল, 'ভাবছি, এখানকার কয়েকজন বন্ধুকে দাওয়াত করব কাল। আজ গিয়ে ঘরেই শোও, কাল মরুভূমিতে রাত কাটাব। আগুনের পাশে। আস্ত ভেড়া রোস্ট হবে...'

'তাই নাকি?' সোফার হাতলে চাপড় মারল মুসা। 'দারুণ হবে।'

'যদি অবশ্য কাঁকড়াবিছে না থাকে ওখানে,' রবিন যোগ করল।

'থাকুক,' রসিকতা করল মুসা। 'বিছেকেই কাবাব বানিয়ে খেয়ে ফেলব।'

'তা অবশ্য তুমি পারো,' হাসল রবিন।

জিনাও হাসল। 'যাও,' তাগাদা দিল সে, 'আর বসে থেকে লাভ নেই। সকাল সকাল গিয়ে শুয়ে পড়ো।'

খুশি হয়েই উঠে পড়ল তিন গোয়েন্দা।

কিন্তু প্রচণ্ড ক্লান্তি সত্ত্বেও বিছানায় শুয়ে ঘুম এল না কিশোরের। ঘরের একটিমাত্র জানালা, চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরে। জানালার লাগোয়া প্যালো ভারডে গাছটা কেমন ভূতুড়ে লাগছে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায়। জুলিয়ানের সঙ্গে আর দেখা হয়নি, কিন্তু খানিক আগে গলা শুনেছে তার। আচ্ছা, ওইটুকুন ছেলে এতসব গোলমাল পাকিয়েছে? নাহ্, বিশ্বাস হয় না। কিন্তু ওর সঙ্গে শত্রুতা করেই বা কার কি লাভ? আগুন লাগানো, ঘোড়া চুরির দায় ছেলেটার ওপর কেন চাপাতে চাইবে?

ক্যাচিনা পেইন্টিংগুলোও অস্থির করে তুলেছে তার মনকে। সুন্দর। এ ধরনের রিসোর্টের জন্যে মানানসই। কিন্তু বড় বেশি বিষণ্ণ, মন খারাপ করে দেয়। ঘরের পরিবেশই কেমন যেন বদলে দিয়েছে। ওখানে ভূত আছে বললে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে বলতে পারবে না কিশোর। চোখ মেলে জানালার দিকে চেয়েই বুঝল, অনেক সময় পেরিয়েছে। সরে চলে গেছে চাঁদ, জ্যোৎস্না আর ঘরে আসছে না এখন। কেন হঠাৎ ঘুম ভাঙল? দীর্ঘ এক মুহূর্ত চুপচাপ পড়ে রইল সে, তারপর আবার শুনল শব্দটা। ও, এ জন্যেই ভেঙেছে! ঘুমের মধ্যেও ওই শব্দ কানে ঢুকেছে। হলরুমে বিচিত্র শব্দ।

আস্তে করে উঠে বসে অভ্যাস মাফিক পা ঢুকিয়ে দিল জুতোতে। দিয়েই চমকে উঠল, টনি না বলেছিল ভালমত না দেখে না ঢোকাতে! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল পরক্ষণেই, না নেই। বিছে-টিছে কিছু লাগল না পায়ে। পা টিপে টিপে এগোল দরজার দিকে। নিঃশব্দে খুলল। দু-দিকে ছড়ানো হলরুম, জানালা দিয়ে ঘরে এসে পড়েছে চাঁদের আলো। তাতে জানালার কাছে অন্ধকার কিছুটা কেটেছে বটে, কিন্তু আসবাবপত্রের আশপাশে, দেয়ালের ধারে, আর ঘরের কোণে চাপ চাপ অন্ধকার।

দেয়ালের ছায়া থেকে বেরোল ওটা। বেগুনি আলোর একটা ঘূর্ণিমত, পাক খেতে খেতে এগোচ্ছে কিশোরের দিকে। ঘরের মাঝামাঝি এসে থমকে গেল। অদ্ভুত সব রূপ নিতে লাগল। একবার মনে হলো কোন মহিলার ছায়া, তারপর

পুতুল, পরক্ষণেই আবার গাছ কিংবা ভালুক, সবশেষে হয়ে গেল আকাশের ভাসমান মেঘের মত। তবে রঙের কোন পরিবর্তন হলো না কখনই। অদ্ভুত একটা আওয়াজ হচ্ছে, বোধহয় আজব 'জিনিসটাই' করছে বিচিত্র গান। বিটকেলে সুর। কথা কিছুই বোঝা যায় না।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিশোর। কি করবে বুঝতে পারছে না। এই সময় সিঁড়িতে শোনা গেল পদশব্দ। নেমে আসছে কেউ। ক্লিক করে অন হলো সুইচ, আলো জ্বলল।

ম্লান হলো বেগুনি আলো, দেয়ালের দিকে ছুটে গিয়ে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'কি, কিশোর?' জিজ্ঞেস করল ভিকি। সুইচবোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে আছে অবাক হয়ে।

'দেখলেন না?'

'বেগুনি আলোর মত কি যেন চোখে পড়ল। ভালমত দেখিনি।'

'রান্নাঘরে চলুন না? এখানে কথা বললে অন্যেরাও জেগে যাবে। জাগিয়ে লাভ নেই। ঘুমাক।'

'বেশ, চলো।'

রান্নাঘরে ঢুকে ভিকি বলল, 'চা খাবে? এক ধরনের ভেষজ সুগন্ধী দিয়ে চা বানাতে শিখেছি, ইনডিয়ানরা বানায়। খেয়ে দেখো, ভাল লাগবে। যেদিন ঘুম আসতে চায় না, বানিয়ে খাই।'

'বানান।' একটা চেয়ারে বসল কিশোর। 'খালা, বোধহয় ক্যাচিনা ভূতটাকেই দেখলাম।'

অবাক হলো না ভিকি। যেন এটাই স্বাভাবিক, এমন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। দু-কাপ চা বানিয়ে এনে রাখল টেবিলে। হাতে বানানো কয়েকটা বিস্কুট দিল একটা প্লেটে করে।

চায়ে চুমুক দিল কিশোর। 'বাহ্, সত্যিই তো! দারুণ সুগন্ধ।'

'ভূতটাকে দেখেছ তাহলে?'

'হ্যাঁ। আপনি দেখেছেন।'

আবার মাথা ঝাঁকাল ভিকি, 'দেখেছি। আরও অনেকেই নাকি দেখেছে। লোকে বলে বহুদিন ধরে আছে এটা এ-বাড়িতে। একেক সময় একেক রূপে দেখা দেয়, পূর্ণিমার সময়।'

'ভয় পান না?'

মাথা নাড়ল ভিকি। 'কারও কোন ক্ষতি তো করে না। ভয় পাব কেন? আমার আশঙ্কা অন্যখানে। গুজব ছড়িয়ে গেলে টুরিস্টরা আসবে না।'

'এ বাড়িতে আস্তানা গেড়েছে কেন বলতে পারেন?'

ঘন ঘন কয়েকবার কাপে চুমুক দিল ভিকি। 'এ বাড়ি যে বানিয়েছে, তারই প্রেতাত্মা হয়তো ওটা। স্বাভাবিক মৃত্যু তো হয়নি বেচারার।'

'কেন, কি হয়েছিল?'

'সিঁড়ি থেকে পড়ে মরেছে।'

'খুলেই বলুন না।'

'ওর নাম ছিল ডানকান লেমিল। ভাল আর্টিস্ট ছিল। এখানকার সমস্ত ক্যাচিনা সে-ই এঁকেছিল। শোনা যায়, লেমিল নাকি হোপি ইনডিয়ানদের কাছ থেকে খুব মূল্যবান একটা জিনিস চুরি করেছিল, লুকিয়েছিল এনে এই বাড়িতে। ইনডিয়ানদের সর্দার এসে জিনিসটা ফেরত চাইল, দিতে রাজি হলো না লেমিল। ভয় দেখাল সর্দার, না দিলে পুড়িয়ে মারবে। কিন্তু দিল না লেমিল। সে সময় তার ছবির এক ভক্ত ছিল এ বাড়িতে। যেদিন সর্দার শাসিয়ে গেল তার পরদিন সকালে সিঁড়ির গোড়ায় মৃত পাওয়া গেল লেমিলকে। শরীরের কোথাও কোন ক্ষত নেই। তার ভক্তকেও খুঁজে পাওয়া গেল না, একেবারে গায়েব। লেমিল কিভাবে মরল সেটা এক রহস্য। কেউ বলে ইনডিয়ানদের ভয়ে হার্টফেল করে মরেছে, কেউ বলে তার ভক্তই তাকে সিঁড়ি থেকে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলে রেখে পালিয়েছে। কোনটা ঠিক কে জানে! কোনটাই প্রমাণিত হয়নি।'

'হুঁ, তারপর?'

'তারপর আর কি? ভূতের গল্প চালু হলো। লেমিলের মৃত্যুর জন্যে ভূতকে দায়ী করল কেউ।' ঠাণ্ডা হয়ে আসা বাকি চা-টুকু দুই ঢোকে শেষ করে পিরিচে কাপটা নামিয়ে রাখল কিশোর। 'কি জাতের ভূত? ক্যাচিনা?'

'হতে পারে। আমরা আসার পর থেকে তো ক্যাচিনাই দেখা যাচ্ছে, অন্য কিছু না।'

চুপ করে ভাবল কিশোর। 'আচ্ছা, অভিশাপ যে আছে, কিসের অভিশাপ?'

'ইনডিয়ারনদের। লেমিলের মৃত্যুর জন্যে শেষ পর্যন্ত ইনডিয়ান সর্দারকে দায়ী করে বসল এখানকার কিছু র‍্যাঞ্চার'। রেগে গিয়ে দেশছাড়া করে ছাড়ল সর্দারকে। পালিয়ে মেকিসিকোয় চলে যেতে বাধ্য হলো সে। বিদেশ বিভুঁয়ে গিয়ে একা একা খুব কষ্ট পেয়ে মরেছে বেচারা। তার স্ত্রী অনেক কেঁদেছে। লেমিলকে অভিশাপ দিয়েছে।'

'সে জন্যেই ক্যাচিনা ভূত এসে আস্তানা গেড়েছে এখানে?'

মাথা নাড়ল ভিকি। 'জানি না। শুধু সর্দারই নয়, আরও কিছু হোমড়াচোমড়া ইনডিয়ানও বিপদে পড়ে গিয়েছিল। কেউ লজ্জায় আত্মহত্যা করেছে, কেউ সর্দারের মত দেশছাড়া হয়েছে। তারাও অভিশাপ দিয়েছে লেমিলকে।'

'কিন্তু শুধু এই বাড়িতেই কেন ভূতের আনাগোনা?'

'কারণ এই বাড়িতেই অপঘাতে মরেছে লেমিল, এই বাড়িতেই জিনিসটা লুকিয়েছিল সে, এবং তার মৃত্যুর পরও আর ওটা খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

'তার মানে,' কিশোরের ভুরুজোড়া সামান্য কাছাকাছি হলো, 'বলতে চাইছেন, জিনিসটা এখনও এ বাড়িতেই আছে?'

ছয়

'লোকের তো তাই বিশ্বাস,' ভিকি বলল। 'দু-চার জন বাদে। তারা বলে ভক্ত ব্যাটাই লেমিলকে খুন করে জিনিসটা নিয়ে পালিয়েছে।'

'অসম্ভব না। নাকে বালিশ চাপা দিয়ে দম বন্ধ করে মারলে ক্ষত থাকে না,' বলল কিশোর। 'তা জিনিসটা কি? কোন ধারণা আছে?'

'মূল্যবান কোন পাথর-টাতর হবে।'

'পাওয়া গেলই না, না?' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর।

'না। লেমিল মারা যাওয়ার পর এই বাড়ির ভেতরে-বাইরে তন্ন তন্ন করে খুঁজছে লোকে। পায়নি।...আরেক কাপ চা দেব?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'যাক, অনেক কিছু জানা গেল আপনার কাছে।'

'আমি চাই রহস্যটার একটা সমাধান হোক, যাতে রিসোর্টটা ঠিকমত চলে। মিস্টার উইলসনের কাছে অনেক দিন আছি। ভাল লোক, তার কোন ক্ষতি হোক চাই না।' বিষণ্ন শোনাল মহিলার কণ্ঠ, 'আর, প্লীজ, জুলিয়ানের বদনাম যদি একটু ঘোচাতে পারো। বিশ্বাস করো, ও খুব ভাল ছেলে। ওকে এখান থেকে বের করে দিলে আমার খুব কষ্ট লাগবে। বাপ নেই ছেলেটার, এতিম, সে-জন্যেই তো পরের দয়া চাইতে এসেছে...' গলা ধরে এল ভিকির। ছলছল করে উঠল চোখ।

তাড়াতাড়ি হাত তুলল কিশোর। 'আহাহা, এত অস্থির হওয়ার কি আছে? সাধ্যমত চেষ্টা করব আমরা।'

উঠল কিশোর। শূন্য, নীরব হলরুম দিয়ে ফিরে এল আবার নিজের ঘরে।

পর দিন ঘুম ভাঙতে অনেক বেলা হলো। হাতমুখ ধুয়ে জিনসের প্যান্ট আর গাঢ় লাল ঝলমলে সিল্কের শার্ট পড়ল, এই ওয়েস্টার্ন অঞ্চলের মানানসই পোশাক। বেরোল।

পেছনের বাগানে বসে চা খাচ্ছে মুসা, রবিন আর জিনা। টেবিলে পড়ে আছে শূন্য প্লেটগুলো, নাস্তা শেষ।

'আরিব্বাপ! কিশোর পাশা দ্য গানম্যান,' দেখেই বলে উঠল মুসা। ভুরু নাচাল। 'তা মিয়া, কোমরে পিস্তল কই?'

হাসল সবাই।

মুসার পায়ের কাছে শুয়ে ছিল কুকুরটা, হাসাহাসি শুনে উঠে বসল। কৌতূহলী চোখে তাকাল কিশোরের দিকে।

'আরে, বাঘাটা না?' কিশোর বলল। 'জনির সেই শিকারী কুকুর, টাইগার।'

'হ্যাঁ,' জিনা বলল। 'ভিকিখালা এমন খাওয়ানো খাওয়ায়, চুরি তো দূরের কথা, অন্য কেউ সেধে দিলেও এখন আর কিছু খেতে চায় না। ভাল হয়ে গেছে।...আমাদের খুব খিদে পেয়েছিল, থাকতে পারলাম না, খেয়ে নিয়েছি। শুনলাম, কাল অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থেকেছ—ভিকিখালা বলল—তাই আর ডাকলাম না।'

'ভাল করেছ,' বসতে বসতে বলল কিশোর। 'কি ঘটেছিল, বলেছে?' রাতের বেলা হলরুমের আবছা আলো-আঁধারিতে যা যা ঘটেছে এখন নিজেরই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না সে-সব। রাতে চাঁদের আলোয় পরিবেশ ছিল এক রকম, এখন উজ্জ্বল সূর্যালোকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম হয়ে গেছে। কড়া রোদ, কমলা ফুলে মৌমাছির গুঞ্জন, চোখ ধাঁধানো আলোয় বসে রাতের ব্যাপারটাকে স্বপ্ন মনে হচ্ছে এখন।

'শুধু বলল,' রবিন জানাল, 'রাতে নাকি হলরুমে কি দেখেছ তুমি। রান্নাঘরে বসে চা খেয়েছ, ভিকিখালার সঙ্গে অনেক আলাপ-আলোচনা করেছ।'

'ভূত দেখেছ নাকি?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

চারটে ডিমের ওমলেট আর বড় এক গেলাস কমলালেবুর রস নিয়ে হাজির হলো ভিকি, কিশোরের জন্যে। দিয়ে চলে গেল।

খেতে খেতে গতরাতের কথা সব জানাল কিশোর। শেষে বলল, 'প্রথমে ভেবেছিলাম চোর। তারপর দেখলাম ওটাকে। বিচিত্র আওয়াজ। হেঁড়ে গলায় ইনডিয়ানদের গান গাইল, কিছুই বুঝলাম না।'

'ইনডিয়ান গান?' রবিনের চোখে বিস্ময়।

'তা-ই তো মনে হলো।'

'তোমার সাহস আছে কিশোর,' মুসা বলল। 'আমি হলে যেতাম না। আর ভূত দেখার পর দাঁড়িয়ে থাকা তো অসম্ভব ছিল।'

'কি বুঝলে?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

ভিকির কাছে শোনা গল্পটা আবার শোনাল কিশোর।

মাথা নোয়াল জিনা। 'ক্যাচিনার অভিশাপের কথা আমিও শুনেছি। সেটা বড় কথা নয়। আসল কথা হলো, ওই ভূত, তাড়াতে হবে বাড়ি থেকে। নইলে উইলসন চাচার লালবাতি জ্বলবে।' তিক্ত শোনাল জিনার কণ্ঠ, 'গতবছর বেচে না দিয়ে ভুলই করেছে। ডাক্তার জিংম্যান কিনতে চেয়েছিল।'

'তাই নাকি?' চিবানো থামিয়ে জিনার দিকে তাকাল কিশোর। 'আগে বলোনি তো! সবাই যেখানে ভূতের ভয়ে কাবু, সেখানে কিনতে চায় কোন সাহসে?'

'বলার মত কিছু না। বাড়িটা চায় না, শুধু খেতখামার। অনেক গরু আছে তার, আরও বাড়াতে চায়। চেয়েছিল, তবে এখন চাচা বেচতে চাইলেও ডাক্তার কিনবে কিনা সন্দেহ। আর কিনলেও অনেক দাম দিতে চাইবে। তার মানে, রিসোর্ট চালাতে না পারলে চাচার অবস্থা কাহিল। টুইন লেকসের সব কিছু বেচে দিয়ে এসেছে, সেই টাকা আর জমানো যা ছিল সবই খরচ করেছে এই রিসোর্টের পেছনে। বেশির ভাগ টাকাই গেছে বাড়িটা সারাতে। ওটাই যদি কেউ কিনতে না চায়, শুধু জমিনের জন্যে আর কত দাম পাবে?'

ভারি পরিবেশ হালকা করার জন্যে হাসল মুসা। 'তোমার চাচার কিচ্ছু হবে না, দেখো। আমরা তিন গোয়েন্দা এসে পড়েছি না? পালাতে দিশে পাবে না ক্যাচিনা ভূতের বাচ্চা।'

শুধু রবিন হাসল।

নীরবে খেয়ে চলেছে কিশোর। ভূত-টুতে বিশ্বাস করে না সে। কিন্তু গতরাতে যা দেখেছে, সেটাকে চোখের ভুল বলেও উড়িয়ে দিতে পারছে না।

'তো, আজ সকালটা কি করে কাটাতে চাও?' জিজ্ঞেস করল জিনা। 'মেহমানরা আসবে বিকেলে। তারপর সুপারস্টিশনে রওনা হব আমরা। ভিকিখালা আর ডিউক আঙ্কেলও সঙ্গে যাবে বলেছে।'

'হুঁম। ভালই জমবে।...আচ্ছা, শোনো, জুলিয়ান কোথায়? ওর সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

'ও-তো নেই। সেই ভোরেই বেরিয়ে গেছে। আমি ঘুম থেকে ওঠার আগেই। ভেবেছিলাম, বিকেলে ওকেও সঙ্গে নেব।'

শূন্য প্লেটটা ঠেলে দিয়ে গেলাস তুলে নিল কিশোর। জিনার দিকে তাকাল। 'কোথায় গেছে?'

'বলে যায়নি। ভিকিখালা বলল, সকালে উঠে পিন্টো ঘোড়াটা নিয়ে বেরিয়ে গেছে, মরুভূমিতেই বোধহয়। জন্তু-জানোয়ারের প্রতি ভীষণ আগ্রহ। ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেয় ও সব দেখে দেখে। আগে এসে আমাকে বলত কি কি দেখেছে...' থামল জিনা। 'ইদানীং আর বলে না, আগুন লাগানোর পর থেকে। এড়িয়ে চলে।'

'কোন কোন জায়গায় আগুন লেগেছে, দেখা যাবে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'যাবে না কেন? ওই পাহাড়টা,' হাত তুলে দেখাল জিনা। 'ওই যে, আস্তাবল থেকে মাইলখানেক পুবে, টিলাটক্কর দেখা যাচ্ছে না পাহাড়ের ওপরে? ওখানে। স্মোক সিগন্যাল প্র্যাকটিস করছিল।'

'আর বাকিগুলো?'

'প্রথমটার আধা মাইল দক্ষিণে দুটো পাহাড়ের ঢাল নিচে একসঙ্গে মিশেছে। পাহাড়ের চূড়ায় উঠলে তারপর দেখতে পাবে। পোড়া স্যাগুয়ারো গাছ।'

'তারমানে দুটো জায়গায়ই হেঁটে যাওয়া যাবে?' রবিন বলল।

মাথা ঝাঁকাল জিনা। 'আমিই নিয়ে যেতাম, কিন্তু আজ পারছি না। মেহমানরা আসবে, খাবার লাগবে। ভিকিখালাকে সাহায্য করব। টনি জীপ নিয়ে গেছে ওদের দাওয়াত করতে। নইলে সে যেতে পারত।'

'আমরা একাই পারব,' মুসা বলল।

কিভাবে যেতে হবে ভালমত জেনে নিয়ে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। আস্তাবলের দিকে হাঁটতে শুরু করল। সঙ্গে নিয়েছে কুকুরটাকে। কিছুদূর এগিয়েই দেখতে পেল, মরুভূমি মোটেই মরু নয়, তাতে প্রাণের ছড়াছড়ি। দিন কয়েক আগে বৃষ্টি হয়েছে, তরতর করে বেড়ে উঠেছে লম্বা ঘাসের গুচ্ছ, সবুজ হয়েছে। ঢেউ খেলানো পাহাড়ী ঢালে জন্মে রয়েছে নানা রকম গাছ, ফুল ফুটেছে। হলুদ, লাল, নীল, সাদা ফুলের ছড়াছড়ি, আর কি তার রঙ!

'ওউফ, চোখ জুড়িয়ে যায়,' চলতে চলতে বলল রবিন। 'মরুভূমি যে এত সুন্দর বইয়েই পড়েছি শুধু এতদিন। পড়ে বিশ্বাস হয়নি।'

বিশাল এক খরগোশ দেখে থমকে দাঁড়াল টাইগার। তাড়া করবে কিনা সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই দুই লাফে গিয়ে পিপের মত মোটা দুটো ব্যারেল ক্যাকটাসের

আড়ালে লুকাল খরগোশটা।

ঘেউ ঘেউ করে উঠল টাইগার, তাড়া করতে চাইল। গলার বেল্ট টেনে ধরে ধমক দিল মুসা।

কুকুরের ডাকে চমকে গিয়ে ঝোপ থেকে বেরোল একটা পাখি। দৌড় দিল। ঘাসের গুচ্ছের পাশ কাটিয়ে ছুটে চলল তীব্র গতিতে।

'রোড রানার,' বলল রবিন।

দূরে গিয়ে থামল পাখিটা। কালো পালকে ঢাকা মাথা তুলে ফিরে তাকাল এদিকে। লম্বা কালো লেজে ঝাঁকুনি তুলে আবার ছুটল। একটা আজব ক্যাকটাসের আড়ালে গিয়ে লুকাল। বানরের লেজের মত বাঁকা উদ্ভিদটা, তাতে লাল ফুল ফুটেছে।

'উড়তে পারে না ওই পাখি?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আবার ছুটল রোড রানার।

'পারে। তবে দৌড়াতেই পছন্দ করে। ছোটে কি জোরে দেখছ না?'

মানুষের সাড়া পেয়ে সামনের একটা ঝোপ থেকে আতঙ্কিত চিৎকার করে উড়াল দিল এক জোড়া কোয়েল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার মাটিতে নামল। ঝোপের ভেতর থেকে বেরোল ডজনখানেক বাচ্চা, মুরগীর বাচ্চার মত দেখতে। হলদে আর বাদামী পালকের ছোট ছোট বল যেন। চিঁক্ চিঁক করছে। ঘাসের বীজ খুঁটে খেতে শুরু করল। গলা তুলে সতর্ক চোখে এদিকে চেয়ে রইল মা-বাবা, বিপদ বুঝলে হুঁশিয়ার করবে ছানাদের।

ছুটে গিয়ে ধরার জন্যে পাগল হয়ে উঠল টাইগার। কষে এক থাপ্পড় লাগাল মুসা। 'চুপ! ছিলি তো চোরের শাগরেদ। ভাল হবি কোত্থেকে? আমার সঙ্গে থাকলে বাপু তেড়িবেড়ি চলবে না। কান টেনে ছিঁড়ে ফেলব।'

শান্ত হলো টাইগার। পেছনের দুই পায়ের ফাঁকে ঢুকিয়ে ফেলল লেজ।

পাখিগুলো যাতে ভয় না পায়, সেজন্যে ওগুলোর অনেক দূর দিয়ে ঘুরে এগোল ওরা।

পাহাড়ের ওপরে উঠে আগুন জ্বালানোর চিহ্ন চোখে পড়ল। বেশ কিছু শুকনো ডালপালা পড়ে আছে, আধপোড়া। কয়েকটা পোড়া ম্যাচের কাঠি পাওয়া গেল আশেপাশে। ডালপালাগুলোর বেশির ভাগই বালি চাপা দেয়া।

'আগুন নেভানোর চেষ্টা হয়েছিল,' পোড়া ডালগুলো দেখাল কিশোর। 'জুলিয়ান বোধহয় বালি ঢাকা দিয়েই ভেবেছে আগুন নিভেছে। সে চলে যাওয়ার পর আবার জ্বলে উঠেছে।'

'নেভানোর চেষ্টা তো অন্তত করেছে,' মুসা বলল, 'তারমানে আগুন ছড়াক, এটা ইচ্ছে ছিল না।'

'জ্বালিয়ে ফেলে রেখে গেলেও কিছু হত না,' রবিন বলল। 'আশেপাশে তো কিছু নেই। ধরবে কিসে? বালি তো আর জ্বলে না যে আগুন ছড়াবে।'

'চলো, অন্য জায়গায় যাই,' হাত তুলে দক্ষিণে দেখাল কিশোর।

পাহাড়ের শিরদাঁড়া ধরে চলল ওরা। খানিক দূর এগিয়ে নিচে দেখিয়ে মুসা

বলল, 'ওই যে। পোড়া ক্যাকটাস।'

ঢাল বেয়ে নিচে নামল ওরা। ওধার থেকে উঠে গেছে পাশের পাহাড়ের আরেকটা ঢাল। খড়খড়ে রুক্ষ মাটি, পাথরের ছড়াছড়ি। এখানে ওখানে জন্মে আছে প্রিকলিপার ক্যাকটাস, খালি কাঁটা, হুকের মত কাপড়ে গেঁথে গিয়ে টেনে ধরতে চায়।

'দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথকে তো গিরিপথ বলে,' মুসা বলল, 'দুই ঢালের মাঝখানকে কি বলে? গিরিঢাল?'

'কি জানি,' আনমনে মাথা চুলকাল কিশোর, মুসার কথা ঠিক কানে গেছে বলে মনে হলো না। পোড়া, মস্ত স্যাগুয়ারো ক্যাকটাস গাছটার দিকে এগোচ্ছে। তার মাথায় এখন ভাবনার তুফান।

'বোধহয় শৈলশিরা,' মুসার প্রশ্নের জবাবে বলল রবিন।

গাছের গোড়ায় এসে চারপাশটা ঘুরে ঘুরে দেখল কিশোর। বিড়বিড় করল, 'এখানে আগুন ধরিয়ে লাভটা কি? পাহাড়ের জন্যে কারও চোখে পড়বে না। সিগন্যাল দিলেই বা কি আর না দিলেই কি?'

'সেজন্যেই হয়তো এখানে ধরিয়েছে,' অনুমান করল রবিন। 'দেখা যায়, এমন জায়গায় লাগিয়ে তো হেনস্তা কম হয়নি, তাই এখানে এসেছে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। রবিনের কথা সমর্থন করল কিনা বোঝা গেল না। গাছের গোড়ায় পোড়া ডালপাতা খুঁজছে। কুড়িয়ে এনে জড় করে আগুন ধরানোর কোন চিহ্ন নেই। পোড়া একটা কয়লাও কোথাও পড়ে নেই, একটা ম্যাচের কাঠিও না। কোনখানে মাটিও সামান্যতম পোড়া নেই, শুধু গাছের একেবারে গোড়ায় ছাড়া। সিগন্যাল দেয়ার জন্যে ডালপালা জ্বাললে, আর সেখানে থেকে এসে গাছে আগুন ধরলে, তার চিহ্ন থাকবেই। কিন্তু নেই।

দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। 'কি বুঝছ?'

কেউ জবাব দেয়ার আগেই বড় একটা পাথরের চাঙড়ের দিকে চেয়ে ঘড়ঘড় করে উঠল টাইগার। লম্বা লম্বা ঘাস আর শুকনো এক ধরনের ঝোপ জন্মে আছে পাথরটাকে ঘিরে।

'কি দেখল?' ভুরু কোঁচকাল রবিন।

'খরগোশ-টরগোশ বোধহয়,' ধমক লাগাল মুসা, 'এই, চুপ!'

'আমার ধারণা,' কিশোরের প্রশ্নের জবাবে বলল রবিন, 'সরাসরি গাছে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।'

'কেন?' মুসার জিজ্ঞাসা। 'একটা ক্যাকটাস গাছে আগুন লাগিয়ে কি এমন লাভ হলো কার?'

কাঁধ ঝাঁকাল শুধু কিশোর, জবাব দিল না। নীরব। জোরে জোরে চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে, তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে পোড়া স্যাগুয়ারোর কালো ধ্বংসাবশেষের দিকে।

ঘুরে দাঁড়াল হঠাৎ সে। 'চলো, আর কিছু দেখার নেই।'

ভোঁতা, প্রচণ্ড শব্দ হলো, মাটির তলায় চাপা দেয়া বিস্ফোরকে বিস্ফোরণ ঘটল

যেন। ঘেউ করে লাফিয়ে এসে কিশোরের গায়ে পড়ল টাইগার।

চমকে ফিরে তাকাল কিশোর। এক লাফে সরে গেল।

দুলে উঠেছে পোড়া স্যাগুয়ারোর মস্ত কাঠামো। পড়তে শুরু করল।

সাত

ধুড়ুম করে পড়ল গাছটা। মুহূর্ত আগে কিশোর যেখানে ছিল ঠিক সেখানে। গোড়ায় মস্ত এক খোঁড়ল।

'আরি, কি হলো!' কাঁপছে রবিনের কণ্ঠ। কিভাবে...'

'টাইগার ধাক্কা না দিলে গেছিলাম,' কিশোরও কাঁপছে।

'এক্কেবারে ভূতের আড্ডা!' ভয়ে ভয়ে তাকাল মুসা। 'চলো, ভাগি।'

আর কিছু করার নেই এখানে। ফিরে চলল ওরা।

র‍্যাঞ্চে এসে টনি আর জিনাকে জানাল সব।

'আমারই দোষ,' টনি বলল। 'আগেই বলা উচিত ছিল। এ রকম ঘটতে পারে ভেবে সেদিন গিয়েছিলাম কেটে ফেলতে। উইলসন আঙ্কেলের খবর শুনে তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম, পুরোটা আর কাটা হয়নি। ভেঙে পড়বেই তো।'

'তোমার দোষ নেই,' টনিকে আশ্বস্ত করল কিশোর। 'সে-জন্যে পড়েনি ওটা।'

'তাহলে...?' থমকে গেল মুসা।

'গাছ পড়ার আগে ধুপ করে যে শব্দটা হয়েছিল, নিশ্চয় শুনেছ। বোমা পুঁতে রাখা হয়েছিল গাছের গোড়ায়। পাথরের চাঙরের কাছে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিল লোকটা। ওর গায়ের গন্ধ পেয়েই তখন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল টাইগার।' সবার মুখের দিকেই তাকাল এক এক করে। 'বোমা ফাটানো হয়েছে ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায়, রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে।'

জিনার চোখে শঙ্কা। সেটা গোপন করার জন্যে অন্যদিকে চেয়ে বলল, 'যা হবার হয়েছে। করতে তোর আর কিছু পারেনি তোমার।' জোর করে হাসল। 'যাও, পুলে গিয়ে খানিকক্ষণ দাপাদাপি করে এসো। খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নাও। রাতে জাগতে হবে।'

'মন্দ বলনি,' সাঁতারের কথায় হাসি ফুটল মুসার মুখে।

বিকেলে ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে, কাপড় পরে ঘর থেকে বেরোল তিন গোয়েন্দা। মেহমানরা এসেছে, অপেক্ষা করছে। জিনার চেয়ে বছর দু-য়েকের বড় একটা মেয়ে, নাম শীলা। অন্য চারজন ছেলে, সতেরো থেকে বিশের মধ্যে বয়েস।

পরিচয়ের পালা শেষ হলো।

ঘোড়ায় জিন পরিয়ে তৈরি রেখেছে টনি। আস্তাবলে গিয়ে যার যার ঘোড়া বেছে নিল সবাই।

টাইগারেরও সঙ্গে যাওয়ার খুব ইচ্ছে, লেজ নাড়ছে, ঘেউ ঘেউ করছে। শেকলে বাঁধা, সামনে প্রচুর খাবার থাকা সত্ত্বেও ছুঁয়ে দেখছে না। তাকে নিতে রাজি নয় ভিকি, তাই এই ব্যবস্থা করে রেখে গেছে।

রওনা হলো দলটা।

মুসার পাশে চলছে টনি। কিশোর চলে এল বিল হিগিনসের পাশে। হাসিখুশি তরুণ, মাথায় কালো চুল। অপরিচিত মানুষকে সহজে আপন করে নিতে জানে। চলতে চলতে কিশোরকে আশপাশে অনেক কিছু দেখাল সে, মরুভূমি আর পর্বত সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য জানাল।

'লস্ট ডাচম্যান মাইনে গিয়েছ কখনও?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'গেছি,' হাসল বিল। 'সাত-আট বছর বয়েসে, বাবার সঙ্গে। সোনাও পেয়েছি। না না, চমকে ওঠার কিছু নেই। খুব সামান্যই পেয়েছি। মাত্র দু-চার আউন্স।'

'ডাচম্যান মাইনে!'

'না, মাইনে পেয়েছি বলা যাবে না। সোনার ছোটখাটো দু-চারটা পকেট আর শিরা ওখানে আছে এখনও। শীতকালে বৃষ্টি হলে বন্যার পানিতে ধুয়ে চলে যায় মাটি। বেরিয়ে পড়ে একআধটা পকেট কিংবা শিরা। মাঝেসাঝে কিছু সোনা পাওয়া যায় তখন, খুবই সামান্য। এমন কিছু না।'

স্বর্ণের আলোচনা শুনে পেছন থেকে এগিয়ে এল রবিন। তার পাশাপাশি এল আরেকটা ছেলে, নাম পিটার। কিছুটা লাজুক স্বভাবের। হেসে বলল, 'থাকো কিছুদিন এখানে, একদিন নিয়ে যাব খনি দেখাতে। চাই কি, ভাগ্য ভাল হলে সোনার তাল কিংবা নুড়ি পেয়েও যেতে পারো।'

জিনাও এগিয়ে এল। 'সোনার লোভ না দেখিয়ে কিশোরকে রহস্যের লোভ দেখাও,' হাসল সে। 'বলো না, লস্ট ডাচম্যান মাইনটা খুঁজে বের করে দিতে।'

'সে-কি! ওটা এখনও হারানোই আছে?' বিলের দিকে তাকাল কিশোর। 'এই না বললে, এখানকার সবাই গেছে?'

'তা-তো গেছেই,' শীলাও হাসল। 'খনিটাতে যাওয়ার অন্তত পঁচিশটা ম্যাপ দিতে পারি তোমাকে, পঁচিশ রকমের, এবং সবগুলোই আসল। যেটা ধরেই যাও, খনি পাবে। তবে কেউই সঠিক বলতে পারে না, আসল ডাচম্যান মাইন কোনটা। এমনও হতে পারে, ওই পঁচিশটার কোনোটাই মূল খনিটা নয়।'

'শীলা ঠিকই বলেছে,' বলল আরেক তরুণ, কেন ফেরেট।

'হুঁ, রহস্যেরও খনি দেখছি এই এলাকা,' নিচের ঠোঁটে একবার চিমটি কাটল কিশোর। হাসল, 'কোনটা ছেড়ে কোনটার সমাধান করি? এমনিতেই খুব জটিল একটা রয়েছে হাতে…'

'ভূতের রহস্য?' বিল জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।'

'ও, তোমাদের বলা হয়নি,' জিনা বলল, 'কিশোর কাল রাতে ভূতটাকে দেখেছে।'

রুক্ষ উঁচুনিচু পাহাড়ী পথে চলতে চলতে জমে উঠল ভূতের গল্প। রাস্তা ভাল না, কিন্তু ঘোড়াটার কারণে চলতে তেমন অসুবিধে হচ্ছে না কিশোরের। শান্ত একটা মাদী ঘোড়ায় চেপেছে সে। তবু, কয়েকটা পাহাড় ডিঙিয়ে আরেকটা

পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে যখন একটা উপত্যকা দেখতে পেল—গাছপালায় ঘেরা, ফুলে ছাওয়া, পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ঝর্না, হাঁপ ছেড়ে যেন বাঁচল।

জায়গাটাকে উপত্যকা না বলে চওড়া একটা গিরিপথ বলাই ভাল। দুই পাশেই উঁচু পাহাড়। গিরিপথের এক মুখের কাছে দাঁড়িয়ে আছে র‍্যাঞ্চের জীপ। রান্না চড়ানো হয়ে গেছে। বাতাসে ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে খাবারের সুবাস।

নিচে নেমে ঘোড়া থেকে নামল অশ্বারোহীরা, এগিয়ে গেল। আগুন জ্বেলে রান্না বসিয়েছে ভিকি, তাকে সাহায্য করছেন তার স্বামী স্কুলশিক্ষক ডিউক। বলিষ্ঠদেহী লোক, সুস্বাস্থ্যের কারণে একটু বেঁটে দেখায়, ইনডিয়ানদের মত কুচকুচে কালো চোখ।

আশেপাশে কোথাও জুলিয়ানকে দেখতে পেল না কিশোর। সে কোথায়, ভিকিখালাকে জিজ্ঞেস করতে যাবে, এই সময় গাছের ফাঁকে দেখল সাদা-কালোর ঝিলিক। বন থেকে বেরোল পিন্টো ঘোড়াটা, তাতে বসে আছে জুলিয়ান।

ছেলেটাকে দেখে অস্বস্তি দূর হলো স্বামী-স্ত্রী দু-জনেরই।

এক জায়গায় বাঁধা হয়েছে সবগুলো ঘোড়া, জুলিয়ানও পিন্টোটা নিয়ে গেল ওখানে। কিশোর এগোল সেদিকে।

জুলিয়ানের সঙ্গে সহজ হতে সময় লাগল কিশোরের। খুবই লাজুক স্বভাবের ছেলে। দশটা প্রশ্ন করলে একটার জবাব দেয়।

কিন্তু তার ঘোড়াটার কথা তুলতেই মুখর হয়ে উঠল সে।

'ও আমার,' গর্বের সঙ্গে বলল জুলিয়ান, 'একেবারে আমার। আর কারও না। উইলসন আংকেলের কাছে একটা ঘোড়া চেয়েছিলাম। দিয়ে দিল। খুব সুন্দর।

'চড়তেও পারো ভাল,' বলল কিশোর। 'কে শিখিয়েছে? উইলসন আংকেল?'

'হাতেখড়ি দিয়েছে। বাকিটা শিখিয়েছে ডিউক আংকেল আর টনিভাইয়া। ওরা বলে, আমি নাকি দেখতে একেবারে ইনডিয়ানদের মত।'

নানা রকম প্রশ্ন করে জুলিয়ানকে কথা বলিয়ে নিল কিশোর। তথ্য জোগাড়ের চেষ্টা করছে। সহজ হয়ে এসেছে জুলিয়ান, প্রশ্ন করলেই এখন জবাব দেয়। মিথ্যে বলছে বলে মনে হলো না, আর যদি বলেই থাকে, তাহলে মানতে হবে মস্ত অভিনেতা সে।

জন্তু-জানোয়ারের কথা উঠলে সব চেয়ে বেশি খুশি হচ্ছে জুলিয়ান। হরিণ আর শুয়োর গোষ্ঠীর প্রাণী হ্যাভেলিনার কথা বলতে গিয়ে চকচকে করে উঠল বড় বড় চোখ। পর্বতের ভেতরে, ঝর্নার মাথায় খাঁড়ির ধারে, মরুভূমিতে নাকি প্রায়ই দেখে ওসব জানোয়ার।

'বড় হয়ে ওসব শিকার করব আমি,' বলল জুলিয়ান। 'উইলসন আংকেল বলে, আমার বয়েসেই নাকি তীর দিয়ে হরিণ মেরেছিল সে। তীর-ধনুক আমারও আছে, কিন্তু নিশানা ঠিক না। একদিকে মারলে আরেকদিকে চলে যায়।'

'আংকেল খুব আদর করেন তোমাকে, না?'

'হ্যাঁ, অনেক।'

'সেজন্যেই তো বলি,' চুলার কাছ থেকে বললেন শিক্ষক, 'আংকেলকে বেশি

জ্বালিও না। আরেকটা ব্যাপারে সাবধান করবি, খবরদার, হ্যাভেলিনার ধারে-কাছেও যেয়ো না। লম্বা লম্বা দাঁত, যা ধার। পেট চিরে নাড়ি-ভুঁড়ি বের করে দেবে।'

'আরে দূর, আংকেল যে কি বলো। তুমি একটা আস্ত বোকা। আমি ঘোড়া থেকে নামব নাকি? পেটের নাগাল পাবে কোথায়?'

জুলিয়ানের সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে কিশোরের, বকবক করে চলল।

'খাবার তৈরি,' ডাকল ভিকি। 'এই, তোমরা সবাই এসো।'

খাবারের স্বাদ এত ভাল খুব কমই লেগেছে তিন গোয়েন্দার কাছে। মোটাতাজা কচি একটা আস্ত ভেড়ার কাবাব, ঠ্যাং ওপরে, শিকে গাঁথা অবস্থায় ঝুলছে আগুনের ওপর। মাংস কেটে প্লেটে নিয়ে তার ওপর ঢেলে দেয়া হয়েছে টমেটোর সস। সেই সঙ্গে আছে সীম, দু-ভাবে রান্না হয়েছে। আগুনের ওপর তন্দুরী রুটির মত সেঁকা, আর মেকসিকান পদ্ধতিতে চর্বি দিয়ে ভাজা। তাতে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে পেঁয়াজ আর পনিরের কুচি। বাঁধাকপি আর আলুও আছে। মদের বালাই নেই, তার বদলে বরফ মেশানো পরিষ্কার ঠাণ্ডা পানি। সব শেষে দেয়া হবে ঘরে বানানো অ্যাভোকাডোর জেলি, তাজা কমলা এবং আঙুর।

'কেমন লাগছে?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল জিনা।

'এর নাম যদি ডায়েট কন্ট্রোল হয়, সারা জীবন করতে রাজি আছি আমি,' চিবাতে চিবাতে বলল মুসা।

'ডায়েট কন্ট্রোল কে বলল তোমাকে?' ওপাশ থেকে হাসল ভিকি। 'এ-তো পিকনিক।'

'তাহলে সারাজীবন পিকনিকই করে যাব।'

মুসার কথায় না হেসে পারল না কেউ।

প্রচুর হই-হুল্লোড় আর হাসি-ঠাট্টার মাঝে শেষ হলো খাওয়া।

ঘাসের ওপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ল মুসা।

টনি আর তার বন্ধুরা গেল শুকনো কাঠ-কুটো জোগাড় করার জন্যে।

পাহাড়ী অঞ্চল, তাড়াতাড়ি ডুবে গেল সূর্য। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার এসে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। অগ্নিকুণ্ড তৈরিই আছে, তাতে শুকনো লাকড়ি ফেলতেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। চারপাশে গোল হয়ে বসল সবাই।

জীপ থেকে গিটার বের করে আনল টনি, বাজাতে শুরু করল। স্বপ্নিল চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে শীলা। ব্যাপারটা তিন গোয়েন্দার নজর এড়াল না। কিশোরের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে চোখ টিপল মুসা।

বাজনার তালে তালে মাথা দোলাচ্ছে সবাই। গান শুরু করল জিনা। তার সঙ্গে গলা মেলাল শীলা আর বিল। ডিউক আর ভিকিও বাদ রইল না। রবিন শুরু করতেই তার সঙ্গে যোগ দিল মুসা।

গানটান আসে না কিশোরের, গলা মোটেই ভাল না। শুয়ে পড়ল সে, আকাশের দিকে চোখ। তারা ঝিলমিল করছে, নির্মেঘ রাতে অনেক বড় দেখাচ্ছে তারাগুলোকে। এত কাছে লাগছে, মনে হয় হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। এমন

সুন্দর রাত খুব কমই আসে মানুষের জীবনে, ভাবল সে।

'চাঁদ উঠলে রওনা হব আমরা,' গানের ফাঁকে বলল টনি।

'যে-পথে এসেছি সে-পথে?' দু-হাত নাড়ল মুসা। 'তাহলে বাবা আমি নেই অন্ধকারে খাদে পড়ে কোমর ভাঙতে পারব না।'

'না, অন্য পথে যাব,' মুসার শঙ্কা দূর করল টনি। 'সহজ পথ।'

গান-বাজনা চলছে। তল্পিতল্পা গুছিয়ে নিচ্ছে ভিকি আর তার স্বামী। জীপে তুলছে।

চাঁদ উঁকি দিল পাহাড়ের মাথায়। উঠে বসল কিশোর। এতক্ষণে খেয়াল করল, জুলিয়ান নেই। তার ঘোড়াটাও নেই। কোন ফাঁকে চলে গেছে।

জীপে করে রওনা হয়ে গেল স্বামী-স্ত্রী।

ছেলেমেয়েরা ঘোড়ায় চেপে চলল। র‍্যাঞ্চে ফিরে চলেছে। দ্রুত ঠাণ্ডা হচ্ছে রাতের বাতাস।

'জ্যাকেট এনে ভালই করেছি,' জিনে বাঁধা জ্যাকেটটা খুলে নিতে নিতে বলল রবিন।

'টনি তো বললই তখন, রাতে খুব ঠাণ্ডা পড়বে,' কিশোর বলল।

পাশাপাশি চলেছে তিন গোয়েন্দা, তাদের পাশে জিনা। বলল, 'রাতে ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ে মরুভূমিতে। এমন কি গরমের দিনেও শীতকালের মত ঠাণ্ডা। দিনে আবার দোজখের আগুন জ্বলে।'

আর বিশেষ কোন কথা হলো না। শুকনো একটা নদীর কূল ধরে রুক্ষ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে দলটা।

গভীর চিন্তায় নিমগ্ন কিশোর। ক্যাচিনা ভূতের কথা ভাবছে, জুলিয়ানের রহস্যময় আচরণের কথা ভাবছে, এরই ফাঁকে ফাঁকে মনে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে হারানো সোনার খনির কথা, দি লস্ট ডাচম্যান মাইন। ঘোড়াটা যে ধীরে চলছে, খেয়াল করছে না। পেছনে পড়ল ঘোড়া, পথ থেকে সরে এল। পাহাড়ের ঢালে জন্মে থাকা রসাল সবুজ ঘাসের দিকে নজর।

হঠাৎ শোনা গেল বিচিত্র খড়খড় শব্দ। চমকে উঠে ঘুরে গেল ঘোড়া, আরেকটু হলেই পিঠ থেকে কিশোরকে ফেলে দিয়েছিল। লাগামের দুই মাথার একটা ছুটে গেল তার হাত থেকে, আরেকটা আঁকড়ে ধরে, দুই হাঁটু ঘোড়ার পেটে চেপে কুঁজো হয়ে রইল সে।

আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে গেছে ঘোড়াটা, কোনদিকে যাচ্ছে হুঁশ নেই। হাজার চেষ্টা করেও তাকে পথে আনতে পারল না কিশোর।

পাহাড়ে উঠে পড়েছে ঘোড়া, ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল আরেক পাশে। নামছে না বলে পড়ছে বলাই ঠিক। আলগা পাথরের ছড়াছড়ি, পা আটকাতে পারছে না, পিছলে যাচ্ছে দ্রুত। নিচে খাদ। অন্ধকার। কতখানি গভীর, বোঝা যায় না।

আতঙ্কিত হয়ে রাশ ছেড়ে দিয়ে জিনের শিং আঁকড়ে ধরল কিশোর। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়লে এখন হাড়গোড় আর আস্ত থাকবে না। ভয়ে তাকাতে পারল না নিচের দিকে।

কিছুতেই পা আটকাতে পারছে না ঘোড়াটা। পিছলে পড়ছে, সেই সঙ্গে ঝুরঝুর করে পড়ছে আলগা পাথর আর বালি। পেছনে চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এই মুহূর্তে কোন সাহায্যই করতে পারবে না ওরা। বাঁচামরা নির্ভর করছে এখন ঘোড়ার পায়ের ওপর, কোনমতে যদি পাথরে বা মাটিতে খুর আটকায়, তাহলেই শুধু বাঁচার আশা আছে।

আট

প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগল। হাত ছুটলে ঘোড়ার মাথায় ওপর দিয়ে উড়ে চলে যেত কিশোর।

থেমে গেল ঘোড়া।

জিনের শিং চেপে ধরে রেখে আস্তে মাথা তুলল কিশোর। নাহ্, থেমেছে। খাদে নেমে পড়েছে ওরা। গভীরতা একেবারেই কম খাদটার, এ যাত্রা প্রাণে বাঁচল তাই।

রাশ ধরল আবার কিশোর। ঘোড়াটার মতই ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ছাড়ছে। থরথর করে কাঁপছে সারা শরীর। কাঁপছে ঘোড়াটাও।

'কিশোর, কিশোর?' খাদের কিনার থেকে জিনার ডাক শোনা গেল। 'তুমি ভাল আছো?'

'আছি!' কম্পিত কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে। সামনের একটা পা ঝাড়ছে ওটা। চেঁচিয়ে বলল সে, 'ঘোড়াটাকে দেখা দরকার। পায়ে আঘাত লেগেছে মনে হয়।'

খাদের ঢালু পাড় বেয়ে নেমে এল সবাই।

টর্চ জ্বালল রবিন। আরও দুটো টর্চ জ্বলে উঠল।

ঘোড়াটার দিকে ছুটে এল টনি। পা পরীক্ষা করতে বসল।

'কি হয়েছিল?' জিনা জিজ্ঞেস করল।

'র‍্যাটলস্নেক,' জানাল কিশোর। 'চমকে ভয় পেয়ে ঘোড়াটা দিল দৌড়। থামাতে পারলাম না।' টনির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'কি মনে হয়? সাপে কেটেছে?'

পায়ে হাত বোলাল টনি। 'দাগটাগ তো দেখছি না। হাঁটু গেড়ে পড়ে ছিল। আর এই যে, সামান্য চামড়া ছুলেছে। অন্য কোন জখম নেই।'

'কিন্তু ওটায় আর চড়া যাবে না,' জিনা বলল। 'কারও সঙ্গে ডাবল-রাইড করতে হবে।'

'অসুবিধে নেই,' মুসা বলল। 'আমার সঙ্গেই যেতে পারবে ও।'

বিল এগিয়ে এল। 'সাপটা ছিল কোথায়?'

'দেখিনি,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'খড়খড় শুনলাম। মনে হলো উড়ে এসে পড়ল ঘোড়ার কাছে।'

'উড়ে!' জিভ টাকরায় ঠেকিয়ে বিচিত্র শব্দ করল বিল, মাথা নাড়ল, 'নাহ্,

মানতে পারছি না। মানুষ আর ঘোড়া দেখলে সাপ বরং সরে যায়। একেবারে পায়ের তলায় না পড়লে কামড়ায় না। ওড়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ ডানা নেই, লাফিয়ে এসে পড়তে পারে বড়জোর। ভুল দেখোনি তো? ঘোড়ার পায়ের নিচে পড়েছে আসলে, তাই না?'

'না!'

'দেখি, কেউ একটা টর্চ দাও,' হাত বাড়াল বিল। 'আর আমার ঘোড়াটা ধরো। কোথায় সাপ, দেখে আসি।'

কোমরের বেল্টে ঝোলানো টর্চটা খুলে দিল মুসা।

'সাবধান, বিল,' মুখ ফিরিয়ে বলল টনি। 'দেখেশুনে যেয়ো। মারা পড়ো না।'

জবাব দিল না বিল, হাঁটতে শুরু করেছে।

ঘোড়ার পা ভালমত দেখে উঠে দাঁড়াল টনি। 'না, তেমন খারাপ কিছু না। বেঁচে গেছে।'

'তবে ভয় পেয়েছে খুব,' জিনা বলল, 'দেখছ না, এখনও কেমন করছে? চোখ থেকে ভয় যায়নি।'

অপেক্ষা করছে সবাই। সাপের গল্প শুরু করল একজন, আরেকজন যোগ দিল তার সঙ্গে, দেখতে দেখতে জমে উঠল গল্প। র‍্যাটলস্নেকের সামনে পড়েনি, এমন একজনও নেই ওখানে। সবারই কোন না কোন অভিজ্ঞতা আছে। কোনোটার চেয়ে কোনোটা কম রোমাঞ্চকর নয়।

বিল ফিরে এল।

'কি দেখলে? তিন-চারজনে একসঙ্গে প্রশ্ন করল।

'এই যে তোমার র‍্যাটলস্নেক,' কিশোরের সামনে হাতের মুঠো খুলল বিল। সামান্য নড়াচড়ায়ই খড়খড় করে উঠল জিনিসটা। জোরে নিঃশ্বাস ফেলে পিছিয়ে গেল জখমী ঘোড়াটা, মাথা ঝাড়া দিয়ে টনির হাত থেকে লাগাম ছুটিয়ে পালানোর চেষ্টা করল।

'কি এটা?' এগিয়ে এল মুসা। এক হাতে ধরে রেখেছে ঘোড়ার লাগাম।

রবিন আর বিল, দু-জনের হাতের টর্চের আলোই পড়ল জিনিসটার ওপর।

'র‍্যাটলস্নেকের লেজ,' জবাব দিল বিল। 'বেশ বড় ছিল সাপটা। মারার পর কেটে নেয়া হয়েছে এটা। টুরিস্ট স্যুভনির। পথের ওপর পড়েছিল।'

'কিন্তু…?' কথাটা শেষ না করেই ঝট করে কিশোরের দিকে ফিরল জিনা, বড় বড় হয়ে গেছে চোখ। 'ঘোড়ার ওপর উড়ে এসে পড়েছে?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'ছুঁড়ে দিয়েছে কেউ?' আবছা অন্ধকার থেকে বলল টনি, চোখ দেখা গেল না তার।

'কিশোর,' জিনার কণ্ঠে অস্বস্তি, 'বুঝতে পেরেছ কি বিপদ থেকে বেঁচেছ? ভাগ্য ভাল, খাদটা গভীর নয়। আশেপাশে গভীর খাদও আছে, ওগুলোতে পড়লে…'

'পড়িনি যখন, আর বলে কি লাভ?' জিনাকে থামিয়ে দিল কিশোর। 'আমি পুরোপুরি ভাল আছি, ঘোড়াটার কেবল সামান্য ছুলেছে। এই তো, ব্যস।' উপস্থিত

সবাইকে সব কথা জানাতে চায় না সে, তাই আর ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করল না। কিন্তু নিজেকে প্রশ্ন করল, 'তাকে সরিয়ে দেয়ার আরেকটা চেষ্টা চালানো হলো। কে সেই লোক, যে চায় না রহস্যের সমাধান হোক?'

জিনা, মুসা আর রবিনের মনেও একই প্রশ্ন।

সওয়ারী নিতে পারবে জখমী ঘোড়াটা, গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করে টনি চাপল ওটাতে। তার ঘোড়াটা দিল কিশোরকে। ধীরে ধীরে শুকনো নদীর ধার ধরে আবার চলল কাফেলা। তিন গোয়েন্দাকে সারিয়ে মাঝখানে রাখা হলো, যাতে আর কোনরকম বিপদ ঘটতে না পারে।

র‍্যাঞ্চে ফিরে 'গুডনাইট' জানিয়ে চলে গেল মেহমানরা। জিনা আর টনি আস্তাবলে রাখতে গেল ঘোড়াগুলোকে।

হলরুমে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। নীরবে বসে রইল অনেকক্ষণ। নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটছে কিশোর। এখন তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করলেও ঠিক মত জবাব পাওয়া যাবে না।

কিন্তু অবশেষে আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করে ফেলল মুসা, 'ইচ্ছে করেই ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে, তাই না কিশোর?'

'উঁ!...হ্যাঁ। পাহাড়ের চূড়ায় ছিল লোকটা। আমি যখন পিছিয়ে পড়লাম, দল থেকে আলাদা হয়ে গেলাম, তখন ছুঁড়েছে। এর অর্থ পরিষ্কার।'

'ক্যাচিনা ভূতের কাজ নয় তো?'

'দূর!' হাত নাড়ল রবিন, যেন থাবা মারল বাতাসে। 'এখনও ভূতটুতের ওপর থেকে বিশ্বাস গেল না তোমার...'

'থাকে তো অনেক সময়...' মিনমিন করল মুসা।

মুচকি হাসল কিশোর। 'ভূত যদি হয়েই থাকে এই ক্যাচিনাটা ভাল জাতের। কাল রাতে খালি একটু নাচ দেখিয়েছে, গান শুনিয়েছে। ঘাড় মটকাতে আসা তো দূরের কথা, ভয় পাওয়ানোরও চেষ্টা করেনি।'

'ঠিকই বলেছ,' পেছনের দরজার কাছ থেকে বলে উঠল জিনা, ফিরে এসেছে। 'আমি আর টনিও তাই বলছিলাম।'

'তোমাদের কি ধারণা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ভূতটা ভাল,' টনি বলল, 'কিন্তু মানুষটা খারাপ, যে তোমাকে খুন করতে চায়। বাঁচতে চাইলে তোমার তদন্ত এবার বন্ধ করো।'

'বন্ধ করব কি, শুরুই তো করিনি এখনও।'

'হ্যাঁ, কিশোর, টনি ঠিকই বলেছে,' জিনা বলল। 'আমার ভাল লাগছে না এ সব। চিঠিটাকে গুরুত্ব দাওনি, দাওনি। কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টের চেষ্টার পর পরই থেমে যাওয়া উচিত ছিল। তারপর বিছেটা বেরোনোর পর আমাদেরই বাধা দেয়া উচিত ছিল তোমাকে। তারপর পড়ল পোড়া গাছ, আর আজ তো একটুর জন্যে বেঁচে এলে। অনেক হয়েছে, আর এগোতে দেব না। বেড়াতে এসেছ, বেড়াও, চুটিয়ে আনন্দ করো। রহস্য-টহস্য বাদ। ছুটি শেষ হলে একসঙ্গেই ফিরে যাব আমরা রকি বীচে।'

'হ্যাঁ,' জিনার কথার পিঠে বলল টনি, 'বাদ দাও ওসব তদন্ত-ফদন্ত। রিসোর্টের যা হবার হবে। তুমি ভাল থাকো।'

'ভুল আমারই হয়েছে,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছি, ঝুঁকি তো থাকবেই। আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল আমার। তা না করে একেবারে হাত-পা ছড়িয়ে গা ঢেলে দিয়ে বসে আছি। বিপদে পড়ব না তো কি হবে? ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে এই কাজই ছেড়ে দিতে হবে।'

'এই না হলে পুরুষ,' তর্জনী নাচাল মুসা। 'মরব, সে-ও ভাল, কিন্তু গোয়েন্দাগিরি নেহি ছোড়েঙ্গা...'

মুসার কথায় কান দিল না কিশোর, জিনা আর টনির দিকে চেয়ে বলল, 'তারমানে, বোঝা যাচ্ছে ঠিক পথেই এগোচ্ছি আমি। নইলে এত ভয় কেন? আমাকে সরাতে চায় কেন?'

ঠোঁট বাঁকিয়ে, ভুরু নাচিয়ে, হাত নেড়ে বিচিত্র ভঙ্গি করল টনি। তারপর আর কিছু না বলে চলে গেল।

ভিকির তৈরি গরম চকলেট ড্রিংক খেয়ে অস্বস্তি অনেকখানি দূর হয়ে গেল কিশোরের। নিজের ঘরে এসে কাপড়-চোপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম এল না। মনে নানা ভাবনা, খচখচ করছে কয়েকটা প্রশ্ন। ওপাশ ওপাশ গড়াগড়ি করল কিছুক্ষণ, শেষে 'ধ্যাত্তোরি' বলে উঠে পড়ল। বাথরুমে ঢুকে শাওয়ারের ঠাণ্ডা পানির তলায় ভিজল পুরো দশ মিনিট। গা মুছে নাইট ড্রেস পরে আবার এসে শুলো বিছানায়। গায়ের ওপর কম্বল টেনে দিল।

কয়েক ঘণ্টা পর ভেঙে গেল ঘুম। কানে আসছে গতরাতের সেই অদ্ভুত কণ্ঠের দুর্বোধ্য গান। আজ আর সঙ্গে সঙ্গেই উঠল না, চুপচাপ শুয়ে গান শুনতে লাগল। শব্দগুলো বোঝার চেষ্টা করল। একটাও বুঝল না। উঠে বসল। খালি পায়েই নিঃশব্দে এগোল দরজার দিকে।

আগের দিনের জায়গায়ই ভূতটাকে দেখা গেল। কিশোর অনুমান করল, ওটা মেঘ ক্যাচিনা। কিংবা বলা যায় ধোঁয়া ক্যাচিনা, রঙিন।

একই জায়গায় ভাসল কিছুক্ষণ ক্যাচিনাটা, তারপর ভেসে ভেসে এগোল দেয়ালের দিকে। আগের দিন যেখানে মিলিয়েছিল, ঠিক সেখানে পৌঁছেই অদৃশ্য হয়ে গেল। আজ ভালমত খেয়াল রাখল কিশোর—ঠিক কোথায় মিলায় ওটা।

সুইচ টিপে আলো জ্বালল। এগোল পায়ে পায়ে। বেশ বড় একটা 'মেঘ ক্যাচিনা'র কাছে মিলিয়েছে ভূতটা।

আরও কাছে থেকে ছবিটাকে দেখল সে। বোঝার চেষ্টা করল। কোথাও খুঁত, কিংবা চোখে লাগে এমন কিছু দেখতে পেল না। টর্চ আর ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে খুঁটিয়ে দেখলে কিছু পাওয়া যেতে পারে ভেবে, নিজের ঘরে ফিরে এল কিশোর।

হঠাৎ শোনা গেল জিনার উত্তেজিত চিৎকার, 'আগুন! আগুন! বাংলোয় আগুন লেগেছে!'

নয়

পাজামা খোলার সময় নেই, তাড়াহুড়ো করে তার ওপরই প্যান্ট পরল কিশোর। টান দিয়ে আলনা থেকে একটা সোয়েটার নিয়ে তাতে মাথা গালাল। জুতো পরে দৌড়ে বেরোল ঘর থেকে। রবিন আর মুসাও হলে বেরিয়ে এসেছে।

'কি-কি হয়েছে?' কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল মুসা।

'চলো, দেখি,' বলেই পেছনের দরজার দিকে ছুটল কিশোর।

বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা।

থমকে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।

বাড়ির সবচেয়ে কাছের বাংলোটায় আগুন লেগেছে। দাউ-দাউ করে জ্বলছে ছোট্ট বাড়িটা। বাগানের দুটো হোস পাইপ দিয়ে একনাগাড়ে পানি ছিটিয়ে চলেছে টনি আর ডিউক। কিন্তু কোন কাজই হচ্ছে না।

দ্রুত এপাশ ওপাশ তাকাল কিশোর। আগুনের গর্জন ছাপিয়ে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, 'দমকলকে ফোন করা হয়েছে?'

'করেছি,' জিনা বলল। আস্তাবলের দিক থেকে ছুটে এসেছে। তার পেছনে ভিকি। দু-জনের হাতে ঘোড়ার দানা রাখার চটের বস্তা। 'আসছে। ততক্ষণে আমরা যা পারি করি।'

হাত লাগাল তিন গোয়েন্দা। বস্তাগুলো নিয়ে গিয়ে সুইমিং পুলের পানিতে চুবিয়ে আনল। আগুনের শিখার ওপর ছুঁড়ে ফেলতে লাগল এক এক করে। আরও বস্তা আনতে ছুটল জিনা আর ভিকি।

মোটেও দমছে না আগুন। দ্রুত বাড়ছে, চোখের পলকে ছড়িয়ে যাচ্ছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়।

বাংলোটা বাঁচানো সম্ভব নয় বুঝে আশপাশের বাড়িগুলোর দেয়াল, ছাত ভিজাতে শুরু করল টনি আর ডিউক। যাতে ওগুলোতেও আগুন ছড়াতে না পারে।

আগুন কি আর এত সহজে ঠেকানো যায়। বাংলোর পাশের শুকনো ঘাসে ধরল, লেগে গেল পাতাবাহারের বেড়ায়, ধরতে শুরু করল তার ওপাশের ঝোপঝাড়ে, বুনো ফুলের ডালপাতা আর ক্যাকটাসে। দ্রুত থামাতে না পারলে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়বে মরুভূমিতে।

ভয়ানক এক দুঃস্বপ্ন যেন। একটা শিখা কোনমতে নিভালে আরেক জায়গায় তিনটা জ্বলে ওঠে। পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছে ঘন কালো ধোঁয়া—আস্তাবলের কাছে উড়ে গেল, ভেতরে ঢুকে বিষাক্ত করে তুলল বাতাস, শ্বাস নিতে না পেরে অস্থির হয়ে পা ঠুকে চেঁচামেচি জুড়ল ঘোড়াগুলো। দৌড় দিল জিনা। আস্তাবলের ঝাঁপ খুলে দিতে হবে, তাহলে কোরালে বেরিয়ে যেতে পারবে জানোয়ারগুলো।

ঢং ঢং ঘন্টা বাজিয়ে হাজির হলো দমকল বাহিনীর ছোট একটা গাড়ি, ফায়ার ইঞ্জিন।

কালিঝুলিতে একাকার হয়ে গেছে তিন গোয়েন্দা, দরদর করে ঘামছে। সরে

এল দূরে। তাদের সাধ্যমত করেছে। এবার দমকল বাহিনীর দায়িত্ব।

ফায়ার ইঞ্জিনের সঙ্গে লড়াই করে টিকতে পারল না আগুন, নত হয়ে এল উদ্ধত শির, গর্জন কমছে।

উত্তেজনা প্রশমিত হতেই ক্লান্তি টের পেল তিন গোয়েন্দা। ধপ করে বসে পড়ল পুলের কাছে সাজিয়ে রাখা চেয়ারে।

'ধরল কিভাবে, টনি?' একজন ফায়ারম্যান জিজ্ঞেস করল। হেলমেট আর ইউনিফর্ম পরে থাকায় লোকটাকে এতক্ষণ চিনতে পারেনি ছেলেরা, বিল হিগিনস—তাদের সঙ্গে পিকনিকে গিয়েছিল যে।

মাথা নাড়ল টনি। 'জানি না। ঘুমিয়ে ছিলাম। জিনার চিৎকারে জেগেছি।'

একসঙ্গে জিনার দিকে ঘুরে গেল কয়েক জোড়া চোখ।

কেউ প্রশ্ন করার আগেই জিনা বলল, 'নাকে ধোঁয়া ঢুকেছিল, কিংবা পোড়া গন্ধে ঘুম ছুটে গেছিল। চোখ মেলতেই জানালায় আলো দেখলাম। উঠে দেখি, আগুন। ভয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, সারা রিসোর্টেই আগুন লেগেছে।'

এদিক ওদিক তাকাল বিল। পুবের আকাশ মুক্তোর মত সাদা, মরুর ভোর আসছে। পোড়া জায়গা, লন আর ঝোপঝাড় এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেদিকে চেয়ে বলল, 'ভাগ্য ভাল, সময়মত টের পেয়েছ। শুকিয়ে ঝনঝনে হয়ে আছে সব কিছু, আর খানিকটা সময় পেলেই জ্বালিয়ে ছারখার করে দিত।'

'কফি আর স্যাণ্ডউইচে চলবে তোমাদের?' দরজার কাছ থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করল ভিকি। তার পেছন থেকে বেরোল জুলিয়ান, দু-হাতে দুই ট্রে।

'আরে, খালা, কখন করেছ এ সব?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল জিনা।

'দমকল আসতেই বুঝলাম,' জবাব দিল ভিকি, 'আমার আর দরকার নেই এখানে। জুলিয়ানকে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলাম।'

খুব আগ্রহের সঙ্গে প্লেট নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল সকলেই।

'দারুণ হয়েছে তো স্যাণ্ডউইচ,' মুখভর্তি খাবার, দুই গাল ফুলে উঠেছে মুসার। 'কে বানিয়েছে?'

'জুলিয়ান,' জানাল ভিকি।

স্যাণ্ডউইচের তারিফ করল সবাই। লাজুক হাসি ফুটল জুলিয়ানের মুখে।

ভাজা মাংসের ওপর পনিরের হালকা আস্তরের পুর দেয়া স্যাণ্ডউইচগুলো এই মুহূর্তে বেশি সুস্বাদু লাগার আরেকটা কারণ, প্রচণ্ড উত্তেজনা আর পরিশ্রমে সবাই ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। লড়াই জেতার আনন্দ সবার মনে।

তবে জুলিয়ানের হাসি মুছে গেল খুব তাড়াতাড়ি, যখন একজন ফায়ারম্যান পোড়া বাংলোটা দেখিয়ে বলল, 'ওখানে আগুন ধরাটা দুর্ঘটনা নয়, টনি। বাংলোতে লোক থাকে না যে সিগারেটের আগুন থেকে ধরবে। নাকি গতরাতে তুমি ছিলে ও ঘরে?'

জোরে মাথা নাড়ল টনি। 'না না। ওটার কাজ তো কবেই শেষ, উইলসন আংকেলের অ্যাক্সিডেন্টের আগেই। তারপর আর ওটার কাছে যাওয়ারও সময়

পাইনি। অয়্যারিং বাকি ছিল, আংকেলে এলে করা হত, জানোই তো।'

ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'আগুনটা লাগানো হয়েছে ভাবছেন?'

কেউ কিছু বলার আগেই চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করল জুলিয়ান, 'আবার যেন আমার দোষ দিয়ে বসবেন না! আমি লাগাইনি!' উঠে দাঁড়িয়েছে সে, হঠাৎ ঝাঁকুনিতে হাতের গেলাস থেকে ছলকে পড়ে গেল দুধ। 'আমি আগুন লাগাইনি!'

কেউ কিছু বলল না।

গলা পরিষ্কার করে নিল ভিকি। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই গেলাস রেখে দৌড় দিল জুলিয়ান। কোরাল থেকে বের করে আনল তার সাদা-কালো পিন্টো ঘোড়াটা। জিন-লাগাম ছাড়াই তাতে চড়ে বসল, ইনিডয়ানদের মত। খালি-পিঠে বসে গলা জড়িয়ে ধরে সোজা ছুটল মরুভূমির দিকে।

'ওকে কিছু বলিনি আমি,' ভিকির দিকে চেয়ে অপরাধী-কণ্ঠে বলল কিশোর। 'যাব ওর পিছে? ফিরিয়ে আনব?'

'লাভ নেই,' বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ভিকি। 'ধরতে পারবে না।'

'ওকে দোষ দিয়েছ কেন ভাবল?' কিশোরের দিকে তাকিয়ে নিজেকেই যেন প্রশ্নটা করল রবিন।

'সবাই দেয় তো, তাই,' অস্বস্তি ফুটেছে ডিউকের চোখে। 'সিগন্যাল দেয়ার জন্যে সেই যে পাহাড়ে একবার আগুন জ্বালল, তাতেই হলো কাল। সবাই এখন খালি তার দোষ দেয়। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না এ সব জুলিয়ানের কাজ...' ধরে এল গলা। মাথা ঝাঁকিয়ে যেন আবেগ তাড়ালেন। 'স্যাগুয়ারো ক্যাকটাস আর বেড়ায় আগুন দেয়া এক কথা, আর বাংলোতে আগুন লাগাল সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার।'

'না!' হঠাৎ উঠে দাঁড়াল ভিকি। মুখে বেদনার ছাপ। 'আমিও বিশ্বাস করি না। এ কাজ জুলিয়ান করতেই পারে না। আগুন যখন লাগল, জুলিয়ান তখন বিছানায়। না, সে করেনি...'

'সবাই আমরা খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি,' পরিস্থিতি সহজ করার জন্যে বলল বিল। 'এখনও ওখানে ভীষণ গরম,' পোড়া বাড়িটা দেখাল। 'কাছে যাওয়া যাবে না। বিকেলে এসে খুঁজে দেখব। কিভাবে আগুন লাগল, হয়তো বোঝা যাবে।'

জুলিয়ান-প্রসঙ্গ তখনকার মত ওখানেই থেমে গেল।

কফি আর স্যাণ্ডউইচ শেষ করে, জিনিসপত্র গুছিয়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেল দমকল বাহিনী।

পোড়া জঞ্জাল যতখানি সম্ভব সাফ করায় মন দিল টনি, তাকে সাহায্য করলেন ডিউক। তিন গোয়েন্দা আর জিনাও চুপ করে বসে রইল না।

দিগন্তে দেখা দিল সূর্য। রোদ এসে পড়ল, সোনালি চাদর দিয়ে যেন ঢেকে দিল সব কিছু।

ঘরের দিকে রওনা হলো ক্লান্ত কিশোর। তার সঙ্গে রবিন আর মুসা।

'গোলমালটা কোথায়?' চলতে চলতে আপনমনে বিড়বিড় করল কিশোর।

'কিসের গোলমাল?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'জানো, খুব খারাপ লাগছে,' বন্ধুর দিকে ফিরে বলল কিশোর। 'আমি ভাবছি ওর দুর্নামটা ঘোচাব, আর জুলিয়ান ভাবছে উল্টো। ও ভেবেছে বাংলোয় আগুন লাগানোর জন্য দোষ দিচ্ছি ওকে আমি।'

'তাই কি দিচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

এক মুহূর্ত চুপ থেকে জবাব দিল কিশোর, 'না। ওর দোষ একটাই, বাড়িতে না থাকা। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায় সে-ই জানে। লোকের মনে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক।'

'আমারও দুঃখ হয় ছেলেটার জন্যে,' গম্ভীর হয়ে বলল মুসা। 'বাপ নেই বেচারার, মা থেকেও নেই। ফুপুর কাছে এসে পড়ে আছে···পরের দয়ার মানুষ হওয়ার যে কি যন্ত্রণা···' হঠাৎ বদলে গেল কণ্ঠস্বর, ঝাঁঝাল গলায় বলল, 'কিন্তু ওকে দোষী বানিয়ে কার কি লাভ? শয়তানিগুলো করছে ওর ঘাড়ে দোষ চাপানোর জন্যে।'

'কে-যে করছে সেটাই যদি জানতাম,' বহুদূর থেকে যেন শোনা গেল কিশোরের কণ্ঠ। তারপর ফিরে এল বাস্তবে, 'ঠাণ্ডা হোক, তারপর যাব। পোড়া জায়গায় হয়তো কোন সূত্র মিলবে।'

'যদি সূত্র থাকে,' রবিন যোগ করল।

'হ্যাঁ, যদি থাকে।'

ঘরে এসেই বাথরুমে ঢুকল তিনজনে। ভালমত সাবান মেখে সাফ করল শরীরের কালি, ময়লা আর ঘাম। নতুন কাপড় পরে বেরোল। ভিকি আর জিনার খোঁজে চলল রান্নাঘরে।

রান্নাঘরে নয়, লবিতে পাওয়া গেল জিনাকে।

'টনি কোথায়?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'শহরে গেছে হাসপাতালে। চাচাকে জানাবে সব কথা।'

'জুলিয়ান ফিরেছে?'

'না।'

'গেল কই? অযথা মানুষের কথা শুনছে ছেলেটা।'

'হ্যাঁ,' রাগে জ্বলে উঠল জিনার চোখ। 'শয়তানিটা করছে জানি কোন হারামজাদা···ধরতে পারলে···' দাঁতে দাঁত চাপল সে।

দশ

অর্ধেক রাত ঘুম নষ্ট হয়েছে। তাই সকাল সকাল দুপুরের খাবার দিল ভিকি, যাতে খেয়েদেয়ে সবাই খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে, রাতের ঘুমটা পুষিয়ে নিতে পারে।

বিকেলে যখন ঘুম থেকে উঠল তিন গোয়েন্দা, বাইরে তখনও কড়া রোদ। ভীষণ গরম। সুইমিং পুলে এসে নামল তিনজনেই।

মুসা সাঁতার কাটছে, রবিন পানিতে একবার ডুবছে একবার ভাসছে। কিশোর

দাঁড়িয়ে আছে কোমর পানিতে। সাঁতারের ইচ্ছে বিশেষ নেই, বার বার তাকাচ্ছে পাহাড়ের দিকে। সাদা-কালো পিন্টো ঘোড়া আর ওটার সওয়ারীকে খুঁজছে তার চোখ।

মুসা আর রবিনের আগেই উঠে পড়ল পানি থেকে। তোয়ালে দিয়ে গা মুছে, কাপড় পরে এগোল পোড়া বাংলোর দিকে।

অনেক খোঁজাখুঁজি করল, কিন্তু কোন সূত্র পাওয়া গেল না। খানিক পরে বিল এল, সে-ও কিছু পেল না। 'নাহ্ কিচ্ছু নেই। আর কাঠ যা শুকনো, আগুন লাগলে থাকে নাকি কিছু?···কিন্তু···নাহ্, শিওর হওয়া যাচ্ছে না।'

ওর সঙ্গেই রয়েছে টনি। 'অ্যাক্সিডেন্ট কিনা জানতে চাইছ তো? মোটেই না। কোন সম্ভাবনাই নেই। উইলসন আংকেলও তা-ই বলেছে। কেউ থাকে না ওখানে, সিগারেটের আগুন ফেলা হয়নি। আকাশ পরিষ্কার ছিল, বাজও পড়েনি। আর ইলেকট্রিকের তারই নেই যে ওখান থেকে আগুন লাগবে। ব্যাপার একটাই ঘটেছে, লাগিয়ে দিয়েছে কেউ।'

'কেন লাগাল? মিস্টার উইলসনের সঙ্গে তার কি শত্রুতা?'

'হয়তো সে-লোক চায় না,' কিশোর জবাব দিল, 'এখানে রিসোর্ট গড়ে উঠুক। এছাড়া আর তো কোন কারণ দেখি না।'

ঝট করে কিশোরের দিকে ফিরল টনি।

অন্য দিকে তাকাল কিশোর, পাহাড় আর মরুভূমির দিকে। দূরে দেখা গেল ঘোড়াটা। খুরের ঘায়ে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে ছুটে আসছে।

কাছে এলে বোঝা গেল, পিন্টো ঘোড়াটাই।

'আসছি,' বলে সোজা আস্তাবলের দিকে রওনা হলো কিশোর। ভেতরে ঢুকে জখমী ঘোড়াটার স্টলে এসে দাঁড়াল। হাত বুলিয়ে দিল ওটার আহত পায়ে, বিড়বিড় করে বলল, 'এখনও ব্যথা করছে?'

আস্তাবলে ঢুকল জুলিয়ান। ঘোড়া বাঁধল।

স্টলের ওপর দিয়ে মুখ বাড়াল কিশোর। 'কেমন বেড়ালে? ভাল?'

একবার চেয়েই মুখ ফেরাল জুলিয়ান, মাথা ঝাঁকাল শুধু।

'নতুন কোন ট্র্যাক চোখে পড়েছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'গাড়িতে, কিংবা ঘোড়ায় চড়ে এখান থেকে ছুটে পালাচ্ছে, এমন কারও চিহ্ন?'

বড় বড় চোখ দুটো ফিরল এদিকে। 'কেন?' কণ্ঠে সন্দেহ।

'বাংলোতে আগুন আপনাআপনি লাগেনি, লাগানো হয়েছে। ভাবলাম, লোকটাকে দেখে থাকতে পারো তুমি।'

চুপ করে ভাবল জুলিয়ান। 'পাহাড়ে গিয়েছিলাম আমি। ওদিকে কেউ থাকে না।'

'কিন্তু ট্র্যাক তো চোখে পড়তে পারে? পায়ের ছাপ অনুসরণ করতে ভাল লাগে না তোমার?'

'লাগে,' ফিরে এল লাজুক হাসি। 'জোহান আংকেল শিখিয়েছে, কিন্তু ভাল পারি না এখনও। সে পারে, সামান্য চিহ্নও তার চোখ এড়ায় না।'

'জোহান আংকেল কে?'
'ওই ওদিকে থাকে। ডাক্তারের র‍্যাঞ্চের কাউবয়। তীর-ধনুকও খুব ভাল বানাতে পারে। আমাকে অনেকগুলো বানিয়ে দিয়েছে।'
'সুপারস্টিশনের অনেক গলিঘুপচির খোঁজ নিশ্চয় পেয়েছ তুমি, জোহান আংকেলের দৌলতে?'
'হুঁ,' মাথা কাত করল জুলিয়ান। 'সময় পেলেই আমাকে নিয়ে যায়।'
আস্তাবল থেকে বেরোল দু-জনে।
'কি কি দেখো?'
'অনেক কিছু। ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যায় লোকে, পায়ে হেঁটে যায়। কেউ সোনা খুঁজতে, পুরানো খনিগুলো খোঁড়ে। পবর্তের গহীনে বনের কিনারে বাচ্চা নিয়ে বেরোয় কয়োটেরা। বাচ্চাকে শিকার শেখায়...'
বাড়ির দিক থেকে ভিকির ডাক শুনে থেমে গেল জুলিয়ান। 'ফুপু ডাকছে,' বলে দৌড় দিল সে।
তার পেছনে এগোল কিশোর। সে এখন নিশ্চিত, আগুন জুলিয়ান লাগায়নি। তবে সবার কাছে সেটা প্রমাণ করতে হবে। লোকে সন্দেহ করে, আড়চোখে তাকায়, নিশ্চয়ই খুব খারাপ লাগে ছেলেটার। লাগারই কথা।
সামনে এসে দাঁড়াল টনি। গম্ভীর। 'কি বলল?'
টনির কণ্ঠস্বরে অবাক হলো কিশোর। 'কিসের কথা?'
'সারাদিন কোথায় কাটিয়েছে?'
'পর্বতে। কেন?'
'ডাক্তারের ওখান থেকে লোক এল এইমাত্র। ওদের দুটো ছাউনিতে আগুন লেগেছে। দুপুরের দিকে। ধোঁয়া দেখে আগুন নিভাতে গিয়ে দেখে বাঁচানোর আর কিছু নেই। পুড়ে ছাই। ওই জোহানটা হয়েছে যত নষ্টের মূল, ছেলেটাকে সে-ই প্রশ্রয় দেয়। নিজে এক শয়তান, ছেলেটাকেও শয়তান বানাচ্ছে।'
'কার কথা বলছ?'
'জুলিয়ান, আর কার।'
'ছাউনিতেও সে-ই আগুন লাগিয়েছে ভাবছ নাকি?'
কিশোরের কথায় এমন কিছু রয়েছে, স্বর নরম করতে বাধ্য হলো টনি। 'ভাবতে তো খারাপই লাগছে। কিন্তু অন্য কেউ কেন ফাঁকা পড়ে থাকা ছাউনি পোড়াতে যাবে?'
'জুলিয়ানই বা কেন পোড়াবে?'
থমকে গেল টনি। ভাবল। 'হয়তো ডাক্তারের ওপর রাগ। অ্যাপালুসা চুরির খবর ডাক্তার এসে দিয়েছে তো, সেজন্যে। কিংবা হয়তো ইনডিয়ান ইনডিয়ান খেলছে। খুব নির্জন এলাকা। ভেবেছে, কেউ দেখতে পাবে না।'
'দেখো, এ সবই অনুমান। প্রমাণ ছাড়া কাউকেই দোষী বলতে পারো না।'
'কিন্তু ডাক্তার জিংম্যান রেগে গেছে। মিস্টার উইলসনের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাছাড়া এখানে যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে। গোয়াল আর কোরালের দরজা খুলে গরু

ঘোড়া ছেড়ে দেয়া হয়েছে এতদিন, তেমন গায়ে মাখেনি ডাক্তার, কিন্তু আগুন লাগানো সহ্য করবে না। কেউই করবে না। আর বোধহয় জুলিয়ানকে রাখা যাবে না এখানে।'

কিশোরের বলে ফেলতে ইচ্ছে হলো, 'তুমি রাখা না রাখার কে?' বলল না। ভদ্রতা বজায় রেখে জিজ্ঞেস করল, 'ও কোথায় যাবে?'

'মায়ের কাছে।'

খুব রাগ হলো কিশোরের। বাচ্চা একটা ছেলের বিরুদ্ধে বড়রা এভাবে উঠে পড়ে কেন লেগেছে? চ্যালেঞ্জ করে বসল, 'জুলিয়ান করছে না এ সব, এবং সেটা আমি প্রমাণ করে ছাড়ব।' বলে আর দাঁড়াল না।

রিসোর্টের ভেতরে, আর পাতাবাহারের বেড়ার বাইরে বাকি দিনটা সূত্র খুঁজে বেড়াল তিন গোয়েন্দা। কিছু পেল না।

'পাব কি? মুসা বলল। 'যা ছিল আগুনে পুড়েছে। বাকি যদি বা কিছু ছিল, নষ্ট করেছে ওই দমকল। কাদা বানিয়ে দিয়েছে।'

'বাকিটা নষ্ট করেছি আমরা,' আনমনে বলল কিশোর। 'গতকাল দল বেঁধে গিয়েছি, ঘোড়ার খুরের ছাপ তো আর একটা দুটো নয়। তার ওপর রয়েছে জীপের চাকা। আজ যদি কেউ গিয়েও থাকে ও পথে, ছাপ আলাদা করে চেনার উপায় নেই।'

বাড়ির কাছে চলে এল আবার ওরা।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে। কয়েক গুণ বড় হয়ে ছায়া পড়েছে বাড়িটার। সেই ছায়ায় দাঁড়িয়ে বিচিত্র একটা অনুভূতি হলো কিশোরের, মনে হলো, আড়াল থেকে তার ওপর চোখ রাখা হচ্ছে। বাতাস গরম, তবু গায়ে কাঁটা দিল।

এতই তন্ময় হয়ে ভাবছে কিশোর, ক্যাকটাস ঝাড়ের ভেতর থেকে একটা রোডরানার বেরোনোর শব্দেও চমকে উঠল। একদিকে ছুটে পালাল পাখিটা। কাছেই লম্বা ঘাসের ভেতর ডেকে উঠল কোয়েল। কাছেই আরেকটা পাখি চেঁচিয়ে তার জবাব দিল।

কি ব্যাপার? উত্তেজিত মনে হচ্ছে পাখিগুলোকে।

ক্যাকটাসের ভেতরে নড়ে উঠল একটা ছায়া, পলকের জন্যে।

মুসার শিকারী চোখ এড়াল না সেটা। দুই ধাক্কায় দুই পাশে দাঁড়ানো কিশোর আর রবিনকে ফেলে দিয়ে নিজেও পড়ল ডাইভ দিয়ে।

ধনুকের টংকার শোনা গেল। শিস কেটে ছুটে এল কি যেন। খট করে আওয়াজ হলো। মুখ ঘুরিয়ে দেখল কিশোর, মুহূর্ত আগে সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তার পেছনের গাছটায় বিঁধেছে তীরটা। থিরথির করে কাঁপছে তীরের পালক লাগানো পুচ্ছ।

এগারো

'খবরদার, মাথা তুলবে না!' ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর। 'আস্তে আস্তে সরে যাও

কোনার দিকে। ক্রল করে।'

হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে ওরা, ভয় করছে, এই বুঝি আরেকটা তীর এসে গাঁথল পিঠে।

আর কিছু ঘটল না। নিরাপদে সরে এল বাড়ির কোণে।

সাবধানে মাথা তুলল কিশোর। স্থির চেয়ে রইল ক্যাকটাসের ঝাড়টার দিকে। কোনরকম নড়াচড়া নেই। ছোট একটা পাখি উড়ে এসে বসল একটা ডালের মাথায়। ফুলের মধ্যে ডুবিয়ে দিল চোখা, লম্বা ঠোঁট। মধু খেতে শুরু করল।

'না, নেই কেউ ওখানে,' পাখিটাকে দেখতে দেখতে বলল মুসা। 'চলে গেছে।'

পায়ে পায়ে আবার গাছটার কাছে ফিরে এল ওরা। ডাল থেকে তীরটা খুলে নিল কিশোর।

পেছনের দরজা দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল তিনজনে।

ভিকি রান্না করছে, একা, আর কেউ নেই ঘরে।

ফ্রিজ খুলে তিনটে লেমোনেড বের করে আনল মুসা। দুটো বোতল দু-জনের দিকে ঠেলে দিল। চেয়ার টেনে বসল তিনজনেই।

একবার মুখ ফিরিয়ে চেয়েই আবার রান্নায় মন দিল ভিকি। খুব ব্যস্ত।

এক চুমুকে অর্ধেকটা লেমোনেড শেষ করে ঠক করে বোতলটা টেবিলে নামিয়ে রাখল কিশোর। 'মুসা, বড় বাঁচান বাঁচিয়েছ। আরেকটু হলেই গেছিলাম।'

হাসল শুধু মুসা, কিছু বলল না।

'কার শত্রু তুমি?' কিশোরের দিকে চেয়ে ভুরু নাচাল রবিন।

'সেটা জানতে পারলে তো রহস্যেরই সমাধান হয়ে যেত।'

তন্দুর থেকে বিস্কুট বের করল ভিকি। হাত মুছে এগিয়ে এল টেবিলের কাছে। 'কি আলাপ করছ…' টেবিলে রাখা তীরটা দেখে কুঁচকে গেল ভুরু। 'ওটা কোথায় পেলে?'

কিশোরের মনে হলো, তীরটা ভিকির চেনা। পাল্টা প্রশ্ন করল, 'চেনেন নাকি?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ভিকি, 'জুলিয়ানের। ডাক্তারের র‍্যাঞ্চের কাউবয় বুড়ো জোহান বানিয়ে দিয়েছে। হাতে বানানো দেখছ না? পেছনের পালক লাগানো দেখেই বোঝা যায় অনেক কিছু। ইনডিয়ানদের কাছে বানাতে শিখেছে জোহান।'

'হাতে বানানো যে সেটা তখনই বুঝেছি,' কিশোর বলল।

'পেলে কোথায়?' আবার জিজ্ঞেস করল ভিকি। 'আবার কি ক্যাকটাস গাছে শুটিং প্র্যাকটিস করছিল নাকি?'

'কিশোরকে সই করে মেরেছে,' রবিন বলল। 'ক্যাকটাস ঝাড়ের ভেতর থেকে। লোকটাকে দেখিনি। মুসা ধাক্কা দিয়ে না ফেললে তো গায়েই বিঁধত।'

'কিশোর!' রক্ত সরে গেছে ভিকির মুখ থেকে। 'তু-তুমি নিশ্চয় ভাবছ না…' ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে। তীরটার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল, যেন ওটা বিষাক্ত সাপ।

'না, জুলিয়ান নয়, আমি শিওর। কিন্তু ওর তীর অন্যের হাতে গেল কিভাবে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ভিকি। 'প্র্যাকটিস করতে গিয়ে কয়েকটা হারিয়েছে ঝোপে

আর ক্যাকটাসের ঝাড়ে। ডজনখানেক বানিয়ে দিয়েছিল জোহান। চারটা হারিয়েছে, আটটা থাকার কথা। ক'টা আছে গিয়ে দেখব?'

'দরকার নেই। জুলিয়ান তীর মারেনি আমাকে।' মুসা আর রবিনের দিকে পর পর তাকাল কিশোর, আবার ভিকির দিকে ফিরল। 'আমার মনে হয়, এ কথাটা এখন কাউকে না জানানোই ভাল। চেপে যাব। জিনাকেও বলার দরকার নেই। শুনলেই রেগে হাউকাউ করে সবাইকে শোনাবে।'

'কিন্তু তোমার খুব বিপদ হতে পারে, কিশোর,' প্রতিবাদ করল ভিকি।

'তা হোক। তবু এ-রহস্যের সমাধান না করে আমি ছাড়ব না। টনি যেন এ কথা না শোনে। মিস্টার উইলসনকেও শোনানোর দরকার নেই। বাড়িতে আগুন লাগার কথা শুনেই নিশ্চয় মন খারাপ করে আছেন। দুশ্চিন্তা আরও বাড়িয়ে লাভ নেই। শেষে সবাই মিলে আমাকে তদন্তই করতে দেবে না।'

'তা ঠিক, শুনলে খুব চিন্তা করবেন,' মাথা দোলাল ভিকি। 'হাসপাতাল থেকে চলে আসতে চাইবেন। উচিত হবে না। পুরোপুরি সুস্থ হননি এখনও। কিন্তু কিশোর, তোমারও অহেতুক ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না। জুলিয়ানকে বরং তার মায়ের কাছেই পাঠিয়ে দেব। ধরে নেব, কপাল খারাপ ছেলেটার, থাকতে পারল না এখানে। কিংবা হয়তো আমিই এখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে ওকে নিয়ে শহরে চলে যাব। বাপমরা এতিম ছেলে, ফেলব কোথায়?'

'মায়ের কাছেও পাঠাতে হবে না, আপনাকেও কোথাও যেতে হবে না,' দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করল গোয়েন্দাপ্রধান। 'এ-রহস্যের কিনারা আমি করবই করব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

এক মুহূর্ত চুপ করে কিশোরের মুখের দিকে চেয়ে রইল ভিকি। বুঝল, কিছুতেই এখন আর ওকে ঠেকানো যাবে না। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'ঠিক আছে, যা ভাল বোঝো করো। কিন্তু খুব সাবধানে থাকবে। তোমার কিছু হলে, কোনদিন আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।'

পরের দুটো দিন কিছুই ঘটল না।

অলসভাবে কাটল সময়।

অ্যাপাচি জাংশন দেখতে গেল তিন গোয়েন্দা। সঙ্গে গেল জিনা। নানারকমের দোকান আছে, ছোট ছোট জুয়েলারের দোকানই বেশি। নানারকম ইনডিয়ান অলঙ্কার রয়েছে প্রতিটি দোকানে। জিনার পছন্দে একটা করে চমৎকার বেল্ট কিনল ছেলেরা, রূপার বাকলসে একটা করে নীলকান্তমণি বসানো। যার যার বাড়ির লোকের জন্যে কিছু উপহার কিনল।

এক দোকানে একটা ক্যাচিনা পুতুল দেখে খুব পছন্দ হলো কিশোরের। 'বাহ্, দারুণ তো! চাচীরও পছন্দ হবে। স্যুভনির হিসেবে খুব ভাল, না?'

পুতুলটা বেশ চড়া দামে কিনে নিল সে। ওই দোকান থেকেই রাশেদচাচার জন্যে কিনল একটা সুন্দর ইনডিয়ান পাইপ।

জুলিয়ান, ভিকিখালা আর টনির জন্যেও একটা করে উপহার কিনল ওরা।

জিনা নিজের জন্যেও কিনল একটা রূপার চেন, লকেটের জায়গায় ছোট্ট একটা

পাখি ঝুলছে। একটা কনডর। চোখ দুটো লাল পাথরের, ঝকঝক করে জ্বলছে।
চেনটা গলায় পরে বন্ধুদের দিকে ফিরল জিনা। 'কেমন লাগছে?'
'রাক্ষুসী,' জবাব দিল মুসা।
'কী?' রেগে উঠল জিনা।
'না না, ভুল করেছি,' তাড়াতাড়ি হাত নাড়ল মুসা। মুচকি হেসে বলল, 'ওঝানী। ইনডিয়ান ওঝানী। চুলগুলোকে আরেকটু এলোমলো করো, মুখে রঙ লাগাও...'
'দেখো, ভাল হবে না বলছি।' ভীষণ রেগে গেল জিনা। 'তুমি নিজে কি? তুমি তো একটা ভূত...'
'ঠিক বলেছ,' দু-আঙুলে চুটকি বাজাল মুসা। বিকশিত হলো হাসি।
একটানে গলা থেকে চেনটা খুলে ফেলল জিনা। 'থাক! নেবোই না!'
'না না, নাও, প্লীজ,' হাতজোড় করে অনুরোধ করল মুসা। 'এমনি ঠাট্টা করছিলাম। এখানে এসে তোমার রাগ দেখিনি তো, কেমন যেন অন্য মানুষ অন্য মানুষ লাগছিল। তাই রাগিয়ে দিয়ে আসল রূপ...'
হেসে ফেলল জিনা। 'আমি খুব বদমেজাজী, না? তাই তো এবার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তোমাদের কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করব না।'
'কোন দরকার নেই,' মিটিমিটি হাসছে রবিন। 'রাগ না থাকলে আসল জিনাকে হারাব আমরা। ভদ্র মিস জরজিনা পারকারকে চাই না, আমাদের জিনাকেই দরকার। তোমার যত খুশি দুর্ব্যবহার করো, মেজাজ দেখাও, কিচ্ছু মনে করব না।'
'তোমরা চেনো বলে...'
'যারা চেনে না তাদেরকেও বলে দেব, তোমার স্বভাবই ওরকম। বাইরে তুমি রুক্ষ হলেও ভেতরে তোমার অত্যন্ত কোমল সুন্দর একটা মন আছে। আসলে তুমি খুব ভাল মেয়ে।'
'হয়েছে হয়েছে, আর তেলাতে হবে না,' কৃত্রিম মুখঝামটা দিল জিনা। কিন্তু ভেতরে ভেতরে এত খুশি হয়েছে, রিঙের সঙ্গে ছোট্ট শেকলে ক্যাচিনা পুতুল ঝোলানো তিনটে চাবির রিঙ কিনে ওখানেই উপহার দিয়ে ফেলল তিনজনকে।
'যাক, মাঝেসাঝে ঝগড়া বাধালে লাভই,' বলল মুসা।
'চেনটা আবার তুমি পরো, জিনা, প্লীজ।'
কি ভেবে আবার চেনটা পরল জিনা।
'সত্যি, চমৎকার মানিয়েছে,' বলল ইনডিয়ার সেলসগার্ল, এতক্ষণ উপভোগ করছিল ছেলে-মেয়েদের ঝগড়া। 'কাপড়-চোপড় ঠিকমত পরালে একেবারে ইনডিয়ান বলে চালিয়ে দেয়া যাবে।'
'চুল যে তামাটে?'
'তাতে-কি? কালো করে নিলেই হবে।'
'তা রাগ অভিমান তো অনেক হলো,' হাত তুলল কিশোর। 'বাড়ি-টাড়ি কি যাব আমরা?'
ইনডিয়ান মেয়েটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে দোকান থেকে বেরোল ওরা।

শেষ বিকেলে র‍্যাঞ্চে ফিরল।

গত দু-দিন ধরে নতুন কিছু না ঘটায় কিছুটা হতাশই হয়েছে কিশোর। জাংশন থেকে ফেরার পথে রহস্যগুলোর কথা খালি ভেবেছে। দু-রাত ধরে ক্যাচিনা ভূতটারও দেখা নেই।

ব্যাপারগুলো এতই খচখচ করছে মনে, পেট ভরে খেতে পারল না রাতে। তাস খেলার প্রস্তাব দিল টনি, রাজি হলো না সে। মুসা আর রবিনকে নিয়ে খেলতে বসল টনি, জিনাও এসে যোগ দিল। কয়েক মিনিট খেলা দেখে উঠে পড়ল কিশোর। চলে এল বড় হলরুমটায়, যেখানে ক্যাচিনা পেইন্টিংগুলো রয়েছে। কি এক অদৃশ্য আকর্ষণ যেন তাকে টেনে নিয়ে এল, সেই মেঘ ক্যাচিনাটার কাছে, যেটার ভূত ঢুকে পড়েছে বলে মনে হয়েছিল সেদিন।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল কিছুক্ষণ। ব্যতিক্রমী কিছু চোখে পড়ল না। জানালার কাছে এসে দাঁড়াল।

আকাশের কোণে মেঘ, বৃষ্টির আগমন সঙ্কেতে যেন বাতাস উত্তেজিত।

কালো আকাশ চিরে দিল নীলাভ বিদ্যুৎ, সুপারস্টিশনের উঁচু চূড়া প্রায় ছুঁয়ে তীব্র গতিতে ছুটে হারিয়ে গেল ওপাশে।

থমথমে প্রকৃতিতে আলোড়ন তুলল ভেজা ঝড়ো বাতাস। দোল খেলে গেল জানালা-দরজার সাদা পর্দায়। বহুদূরে, পর্বতের দিক থেকে ভেসে এল বজ্রপাতের চাপা গুমগুম। এরই মাঝে শোনা গেল ঘোড়ার খুরের শব্দ। আবছা আলোয় চকিতের জন্যে ঘোড়াটা চোখে পড়ল কিশোরের, ছুটে চলে যাচ্ছে—সাদা-কালো পিন্টো ঘোড়া।

মুহূর্ত দ্বিধা করেই দরজার দিকে দৌড় দিল কিশোর। বাইরে বেরিয়ে ছুটল আস্তাবলের দিকে। তুফান আসছে, এর মাঝে এই অন্ধকারে কোথায় যাচ্ছে জুলিয়ান? দেখতেই হবে। অন্য কাউকে কিছু বলে আসার সময় নেই।

অন্ধকারে আস্তাবলের ভেতরে কিছু দেখা যায় না। দরজার ঠিক ভেতরের স্টলে যে ঘোড়াটা পেল, তাতেই চড়ে বসল। বের করে নিয়ে এল। আবছা অন্ধকারে যতখানি সম্ভব জোরে ছুটে অনুসরণ করে চলল সামনের ঘোড়াটাকে।

উপত্যকায় পৌঁছে শুকনো একটা চওড়া নালার মধ্যে দিয়ে ছুটল ঘোড়া। গতি কমিয়ে সামনের ঘোড়াটা খুঁজল কিশোর, দেখল না। তারপর হঠাৎই আবার চোখে পড়ল সাদা-কালো ঝিলিক, ক্ষণিকের জন্যে। ওটাও ছুটছে নালা দিয়ে।

'জুলিয়ান, শোনো!' চিৎকার করে ডাকল কিশোর। 'জুলিয়ান!'

জবাবে শুধু ঘোড়ার খুরের শব্দ।

বাতাসের বেগ বাড়ছে, ধুলো উড়ছে। তার সঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে শুকনো পাতা আর কুটো। পড়ছে এসে চোখেমুখে, চোখ খুলে রাখা দায়। খুরের শব্দ শুনে শুনে অনেকটা অন্ধের মত ঘোড়া নিয়ে এগোচ্ছে কিশোর।

বজ্রপাতের গর্জন জোরাল হচ্ছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘনঘন। অনেক সামনে ঘোড়াটাকে ক্ষণে ক্ষণে চোখে পড়ছে সেই আলোয়। আরও কয়েকবার ডাকল কিশোর, কিন্তু সাড়া দিল না পিন্টোর সওয়ারী, ফিরেও তাকাল না।

নামল বৃষ্টি। বাজ পড়ল প্রচণ্ড শব্দে, দু-ভাগ হয়ে গেল যেন আকাশটা। মুষলধারে বৃষ্টি, ফোঁটা ফোঁটা নয়, যেন পানির চাদর। থেমে যাচ্ছে ঘোড়াটা বারবার, খোঁৎখোঁৎ করছে, মাথা ঝাড়ছে। এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে সামনে এগোতে রাজি নয় সে, ফিরে যেতে চায় আস্তাবলের নিরাপদ শুকনো আশ্রয়ে।

ঘোড়াটাকে হাঁটতে বাধ্য করল কিশোর। রেকাবে দাঁড়িয়ে সামনে তাকাল, পানির চাদর ফুঁড়ে অন্ধকারে কয়েক হাতও এগোল না নজর। পিন্টোটাকে দেখা গেল না। খুরের আওয়াজও আর শোনা যাচ্ছে না এখন। ভয়ানক অস্বস্তিতে পড়ে গেল সে! নালা ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল পর্বতের আরও ভেতরে।

থেমে থেমে যাচ্ছে ঘোড়াটা। চলতে খুব অসুবিধে হচ্ছে। তোড়ে নেমে আসছে পানি, শুকনো মাটি এখন পিচ্ছিল কাদা। আরেকবার বিদ্যুৎ চমকাল। সামনের দৃশ্য দেখে কিশোরও চমকে গেল।

সামনে নালাটা মনে হলো শেষ। পিন্টো আর তার সওয়ারী অদৃশ্য। গেল কোথায়!

রাশ টেনে ঘোড়া থামিয়ে পরবর্তী বিদ্যুৎ চমকের অপেক্ষায় রইল কিশোর। ইস্, বোকামি হয়ে গেছে। তাড়াহুড়োয় টর্চ আনতে মনে ছিল না।

বিদ্যুৎ চমকালে মনে হলো যেন দুপুরের আলো। স্পষ্ট চোখে পড়ল সামনের সব কিছু। সামনে নালার দুই পাড় এখানকার চেয়ে অনেক বেশি খাড়া। দুই পাশেই পাহাড়ের ঢাল, তা-ও যথেষ্ট খাড়া।

বৃষ্টি আরও বাড়ল। সামনে এগিয়ে আর লাভ হবে না, পিন্টোটাকে হারিয়েছে। হতাশ হয়ে ঘোড়াকে ওটার ইচ্ছেমত চলতে দিল সে।

গেল কোথায় পিন্টো? গভীর নালা থেকে হঠাৎ করে একেবারে উধাও তো হয়ে যেতে পারে না। ধারেকাছেই লুকিয়ে আছে কোথাও?

'ছিল তো এখানেই,' বিড়বিড় করে ঘোড়াটার সঙ্গে কথা বলল কিশোর। 'ঠিকই অনুসরণ করেছিস। তারপর?'

কিশোরের কথার জবাবেই বুঝি আরেকবার ফোঁস করে উঠল ঘোড়া। হঠাৎ যেন হোঁচট খেয়ে থেমে গেল। বাঁকা হয়ে গেল পেছনদিকে। কাদামাটিতে নাল ঢুকিয়ে দিয়ে পতন রোধ করতে চাইছে। সামনে ঢাল, তারপরে তরাই।

অনেক কষ্টে পিছলে পড়া থেকে রেহাই পেল ঘোড়াটা। হাঁপ ছাড়তে যাবে এই সময় কিশোরের কানে এল একটা অদ্ভুত গমগমে আওয়াজ। বজ্রপাতের নয়। তুমুল বৃষ্টিতে ভরে গেছে নালা। পেছনে তাকিয়ে দেখল কিশোর, দুই পাড় উপচে ভয়ঙ্কর গতিতে ছুটে আসছে পানি, ভাসিয়ে আনছে ঝড়ে উপড়ানো গাছ-পালা ঝোপঝাড়।

বারো

প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে কিশোরের নির্দেশ ছাড়াই খাড়া পাড় বেয়ে ওঠার চেষ্টা শুরু করল ঘোড়াটা। মরিয়া হয়ে উঠল। পিছল মাটি, ভিজে আলগা হয়ে আছে ওপরের অংশ। নাল গাঁথতে চাইছে না তাতে, আর গাঁথলেও খসে যাচ্ছে আলগা মাটি। বাঁশ

বেয়ে ওঠা সেই শামুকের অবস্থা হয়েছে যেন, দুই ফুট ওঠে তো দেড় ফুট নামে।

এসে গেছে পানি। শেষ চেষ্টা করল ঘোড়াটা। পেছনের দুই পা মাটিতে গেঁথে প্রায় লাফ দিয়ে পড়ল সামনে। সামনের দুই পা পাড়ের ওপরের মাটিতে ঠেকলে আরেক ঝাঁকিতে শরীরটা তুলে আনল ওপরে। প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রইল কিশোর। আরেকটু হলে গিয়েছিল পিঠ থেকে পড়ে।

হুড়মুড় করে নিচ দিয়ে চলে যাচ্ছে পানি। তাতে পড়লে আর রক্ষা ছিল না। উড়ে গিয়ে পড়তে হত নিচে।

থরথর করে কাঁপছে ঘোড়া আর মানুষ, কে যে বেশি কাঁপছে বোঝা মুশকিল। ঘোড়ার গলায় গাল চেপে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে কিশোর।

নাক নামিয়ে নিজের দুই হাঁটু শুঁকল ঘোড়া, কেন কে জানে। ব্যথা করছে বোধহয়, কিংবা কিছু একটা হয়েছে। পাহাড়ের ঢাল আর নালার পাড়ের মাঝখান দিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

র‍্যাঞ্চটা কোনদিক কতদূরে আছে জানে না কিশোর, ঘোড়ার ওপরই এখন ভরসা। পথ চিনে যদি বাড়ি ফিরতে পারে। কিন্তু এই অন্ধকারে ঝড়ের মাঝে চিনবে তো?

চলছে তো চলছেই, পথের যেন আর শেষ নেই। কিশোরের মনে হলো, কয়েক যুগ পর যেন হঠাৎ করে থেমে গেল বর্ষণ। পিঠে ভারি ফোঁটার অনবরত আঘাত কমে আসতে মাথা তুলল সে। ভিজে সপসপ করছে কাপড়, গায়ের সঙ্গে মিশে গেছে। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস তীক্ষ্ণ সুচের মত মাংস ভেদ করে গিয়ে লাগছে যেন একেবারে হাড়ে। অবাক হয়ে দেখল, দ্রুত পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে আকাশ, ইতিমধ্যেই পেছনে হয়ে গেছে অনেকখানি। মখমলের মত কালো আকাশে উজ্জ্বল তারা ঝকমক করছে। মেঘের নামগন্ধও নেই। এ সব অঞ্চলের ঝড়বৃষ্টিই এমন, এই আসে এই যায়।

পাহাড়ের মোড় ঘুরতেই সামনে আলো দেখা গেল, গাড়ির হেডলাইট এদিকেই আসছে। কাছে এসে ব্রেক কষল। রিসোর্টের পুরানো একটা জীপ। লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে আগে নামল টাইগার। ঘোড়ার কাছে এসে ঘেউ ঘেউ আর নাচানাচি জুড়ে দিল। ছুঁতে চাইছে কিশোরকে।

'কিশোর!' লাফিয়ে বেরোল মুসা। 'আল্লাহ্‌কে হাজার শোকর, পেলাম তোমাকে! আমরা তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। কোথায় গিয়েছিলে? কি হয়েছিল?'

একে একে নামল রবিন, জিনা, টনি।

কিশোরকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামাল টনি। ঘোড়ার পেছনে চাপড় দিয়ে বলল, 'বাড়ি যা। অনেক কষ্ট করেছিস!'

চলতে শুরু করল ঘোড়াটা।

'পিন্টোটাকে নিয়ে জুলিয়ান যে কোথায় গায়েব হলো,' কিশোর বলল, 'কিছুই বুঝলাম না।'

'জুলিয়ান?' জিনা অবাক। 'ঘরেই তো দেখে এলাম ওকে। বিকেল থেকেই

আছে। ওর ঘোড়াটাও আস্তাবলে। খটখটে শুকনো। শুধু তুমি যেটাকে এনেছ সেটাকেই পাওয়া যাচ্ছিল না।'

'কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখলাম পিন্টোতে চড়ে যাচ্ছে,' জোর প্রতিবাদ করল কিশোর। 'আমার সামনে সামনেই এগোল। তারপর নালার মাথা থেকে উধাও। নিচে তরাইয়েই পড়ে গেল কিনা কে জানে।'

'সত্যি দেখেছ?' টনি জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয়ই।'

'জুলিয়ানকে?'

থমকে গেল কিশোর। ঢোক গিলল। 'চেহারা তো দেখিনি...' অনিশ্চিত কণ্ঠস্বর। 'তাই তো, এ-যে আরেকটা ফাঁদ, ভাবিনি তো! কিন্তু কি করে জানল সে আমি ওকে অনুসরণ করব?'

'হয়তো একটা চান্স নিয়েছে,' রবিন বলল। 'তোমাকে দেখিয়ে আস্তাবল থেকে বেরিয়েছে। পিন্টো দেখে যদি পিছু নাও, এই আশায়। এবং তার ফাঁদে পা দিয়েছ তুমি।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' খানিক আগের তুফানের মতই চালু হয়ে গেছে কিশোরের ব্রেন। 'আমি অনুসরণ করলে, সে আমাকে নিয়ে গেছে এমন এক জায়গায়, যেখানে অন্ধকারে পড়ে মরব। কেউ কিছু সন্দেহ করত না। সবাই ভাবত, একটা দুর্ঘটনা।'

'বাঁচিয়েছে তোমাকে ফ্রান্সিস,' ঘোড়াটার কথা বলল টনি। 'সব চেয়ে ভালটাকেই বেছেছিলে। কয়েকবার ও আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে।'

ভেজা উঁচুনিচু পথ ধরে ঝাঁকুনি খেতে খেতে ছুটে চলেছে পুরানো জীপ। কিশোর একেবারে চুপ, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে। অন্যরাও চুপ করে রইল।

দূরে দেখা গেল র‍্যাঞ্চ হাউসের উজ্জ্বল আলো।

লস্ট ভ্যালির সামনে এসে গাড়ি রাখল টনি।

সবাই নামল।

গরম পানি দিয়ে গোসল সেরে, মাখন মেশানো এক কাপ গরম চকলেট ড্রিংক খেয়ে শুয়ে পড়ল কিশোর।

পরদিন বেলা করে ঘুম ভাঙল তার। বাইরে চমৎকার সকাল, ঝকঝকে রোদ। দেখে মনেই হয় না আগের রাতে ভয়াবহ ঝড় বয়ে গেছে।

রহস্যের সমাধানে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে কিশোর। আর কত? কয়েকবার তার জীবনের ওপর হামলা হয়ে গেল। প্রায় প্রতিটি বারেই ভাগ্যগুণে বেঁচেছে। কোন সূত্র, কোন কূল কিনারা পাচ্ছে না সে। এ-এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। ধারেকাছেই রয়েছে শত্রু, তার ওপর চোখ রাখছে, আঘাতের পর আঘাত হানছে, অথচ সে কিছুই করতে পারছে না। কাকে সন্দেহ করবে?

সেই নালাটার কাছে আবার যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে। হয়তো কোন সূত্র পাওয়া যেতে পারে, যদিও এ-ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে তার। তবু...

'জিনা,' কিশোর বলল, 'পিন্টো ঘোড়াটার খোঁজ নাও। দেখো, আর কোন্ র‍্যাঞ্চে আছে সাদা-কালো রঙের ওই ঘোড়া। আমি আবার নালাটার কাছে

যাব।···তোমরা যাবে?' দুই সহকারীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয় যাব,' দু-জনের একই জবাব।

'তবে,' মুসা যোগ করল, 'র‍্যাটলস্নেক আর ঝড় থেকে দূরে থাকতে চাই।'

'আকাশ পরিষ্কার,' বলল কিশোর। 'ঝড় আসবে না। আর, বেশি ঝোপঝাড়ের মধ্যে নাই বা গেলাম, তাহলেই সাপের কামড় খেতে হবে না।'

'না গেলেই কি, কেউ ছুঁড়ে তো দিতে পারে। যাকগে, চলো যাই আগে, যা হয় হবে।'

'হ্যাঁ। চলো।'

দিনের বেলা উজ্জ্বল সূর্যালোকে অন্যরকম লাগল প্রকৃতি, পরিবেশ গত রাতের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। তাজা বাতাস। মরুভূমির বুনো প্রাণীরা সবাই কাজে ব্যস্ত, ঝড়ে সবারই কিছু না কিছু ক্ষতি হয়েছে, মেরামত করে নিচ্ছে সে-সব।

নালায় পানি প্রবাহের চিহ্ন স্পষ্ট, কোথাও কোথাও এখনও নরম কাদা। পলি জমেছে কিছু জায়গায়। খড়কুটো, আগাছা, জঞ্জাল জমে রয়েছে এখানে সেখানে। পানিতে ভেসে এসেছে, কিন্তু শেষ দিকে স্রোত কম থাকায় আর সরতে পারেনি, আটকে গেছে।

মোড় ঘুরে নালার মাথার কাছে চলে এল ওরা। বাঁয়ে তাকাল কিশোর, ছোট ছোট হয়ে এল চোখ। 'হুঁ, রহস্যময় ঘোড়সওয়ারের রহস্যজনক অন্তর্ধানের জবাবটা বোধহয় মিলল,' আঙুল তুলে দেখাল সে। নালার পাড় থেকে কিছু দূরে পাহাড়ের গায়ে খুব সরু একটা গিরিপথ মত চলে গেছে। 'ঝড়বৃষ্টির মধ্যে···আর এত উত্তেজিত ছিলাম, কাল রাতে চোখে পড়েনি। তাই তো বলি, ব্যাটা গেল কই?'

'যাবে নাকি?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'এতদূর যখন এলাম, যাওয়াই তো উচিত।'

ঘোড়াটা শান্ত, কথা শোনে। সরু গিরিপথে ওটাকে ঢোকার নির্দেশ দিল কিশোর। পেছনে সারি দিয়ে চলল অন্য দুটো ঘোড়া।

ধীরে ধীরে ওপরে উঠেছে গিরিপথ। ঘোড়ার নালে লেগে ঝরে পড়ছে আলগা ছোট পাথর, মাটি। গড়িয়ে গিয়ে জমা হচ্ছে নালায়।

'যে কাল রাতে এখান দিয়ে গেছে, এই এলাকা তার নখদর্পণে,' আশপাশের পাহাড় দেখছে কিশোর। 'ইচ্ছে করেই টেনে এনেছে আমাকে নালার মুখের কাছে। তারপর মারাত্মক বিপদে ঠেলে দিয়ে নির্বিঘ্নে সরে পড়েছে।'

'যাচ্ছি কোথায় আমরা?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

সামনে গিরিপথ শেষ। উল্টোদিকে পাহাড়ের আরেক ঢাল। গিরিপথের মুখ থেকে এঁকেবেঁকে চলে গেছে পায়েচলা আরেকটা পাহাড়ী পথ। পথের ধারে এক জায়গায় কয়েকটা চারাগাছের ছোট্ট ঝাড়। ঘন পাতা গায়ে গায়ে লেগে ছাতার মত হয়ে আছে।

সেগুলো দেখল কিশোর। আনমনে বলল, 'আমি যদি ঝড়ের সময় এ পথে যেতাম, বৃষ্টি নামলে অবশ্যই আশ্রয় নিতাম ওটার তলায়।'

'লোকটা আশ্রয় নিয়েছিল বলতে চাও?' রবিন বলল।

মাথা নেড়ে বলল কিশোর, 'হ্যাঁ।'

গাছের গোড়ায় এসে থামল ওরা। কড়া রোদেও পাতার নিচে বেশ ছায়া। গোড়ার মাটি ভেজা, কোথাও কাদা। রোদ পৌঁছতে পারেনি ওখানে। তাই শুকায়নি।

ঘোড়া থেকে নেমে রাশটা মুসার হাতে ধরিয়ে দিল কিশোর। একজোড়া পায়ের ছাপের দিকে চোখ।

'ঠিকই আন্দাজ করেছ,' মাটির দিকে চেয়ে আছে মুসাও।

'ওদিকে দেখো,' সামনে দেখাল কিশোর, 'পাথুরে। গেছে ওদিকেই, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ছাপ পাওয়া যাবে না। শক্ত মাটি, পড়বেই না ছাপ।'

গাছগুলোর চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখল সে। একটা ডালের দিকে চোখ পড়তেই স্থির হয়ে গেল। মেসকিট ঝাড়ের কাঁটায় আটকে রয়েছে লাল এক টুকরো কাপড়

এগিয়ে গিয়ে কাপড়টা খুলে নিল কিশোর, হাসল। 'যাক, এদ্দিন পরে সলিড কিছু পাওয়া গেল,' কণ্ঠে খুশির আমেজ। 'লাল শার্ট পরেছিল লোকটা। ছিঁড়ে রয়ে গেছে, ঝড়ের মধ্যে বোধহয় খেয়ালই করেনি।'

'দারুণ!' নিজের উরুতে চাপড় দিল মুসা। 'এটা প্রমাণ করবে অনেক কিছু।'

'এত খুশি হয়ো না,' হাত নাড়ল কিশোর। 'যত সহজ ভাবছ তত না। ঝামেলা আছে। কার শার্ট ওটা খুঁজে বের করতে হবে আগে। ছেঁড়া শার্ট তো আর দেখিয়ে বেড়াবে না।'

চুপসে গেল আবার মুসা। 'তাই তো, এটা ভাবিনি।'

ওখানে আর কিছু পাওয়া গেল না।

'চলো,' বলল কিশোর, 'আর থেকে লাভ নেই।'

রিসোর্টে ফিরে এল ওরা। কোরালে ছেড়ে দিল ঘোড়াগুলো।

'জুলিয়ানের রহস্যটার সমাধান হলে বাঁচি,' পেছনের বাগানের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল রবিন। 'আসল রহস্য তো বাকিই রয়েছে।'

'হ্যাঁ, ক্যাচিনা ভূত,' মুসা বলল।

'জুলিয়ানের রহস্যের সঙ্গে ভূত রহস্যের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, তাই বা কি করে বলি? দেখা যাক কি হয়?' বলল কিশোর।

বাইরে কাউকে দেখা গেল না, কিছুটা অবাকই হলো ওরা।

রান্নাঘরে ঢুকল। কাজ করছে ভিকি আর জিনা। জিনা একবার মুখ তুলে চেয়েই আবার নামিয়ে নিল, ভিকি তাকালই না। দু-জনেরই মুখ থমথমে।

তাজ্জব ব্যাপার তো!

'অ্যাই যে, জিনা,' ডেকে বলল মুসা, 'সাংঘাতিক একখান সূত্র পেয়েছে কিশোর। গতরাতের লোকটা যে জুলিয়ান নয়, প্রমাণ করা যাবে।'

এদিকে তাকাল ভিকি। হাসি ফুটল না মুখে। গালে পানির দাগ, অনেক কেঁদেছে বোঝা যায়।

'কি ব্যাপার? জানতে চাইল কিশোর।

'পেয়েছ, ভাল। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে,' আবার ফুঁপিয়ে উঠল ভিকি।

ছুটে চলে গেল রান্নাঘর থেকে।

তেরো

'কি হয়েছে?' জিনাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'শেরিফ এসেছিল,' জিনারও চোখ ছলছল করে উঠল। 'ঘন্টাখানেক আগে, জুলিয়ানকে খুঁজতে। বলল, গতকাল নাকি কিছু অলঙ্কার চুরি গেছে। আর পিন্টো ঘোড়ায় চড়ে একটা ছেলেকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে ওই এলাকায়।'

'তাতেই কি প্রমাণ হয়ে গেল জুলিয়ান চুরি করেছে? শোনো, কাল রাতে আমিও একজনকে পিন্টো ঘোড়ায় চড়তে দেখেছি। আর সেটা যে জুলিয়ান নয়, তা-ও প্রমাণ করতে পারব।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল জিনা। 'কেউ বিশ্বাস করবে না তোমার কথা।'

'করবে না মানে?' এমন একটা ভঙ্গি করল মুসা, যেন যে বিশ্বাস করবে না তাকে এখনি ধরে ধোলাই দেবে। 'প্রমাণ আছে আমাদের কাছে।'

'সেটা অন্য কেস। জুলিয়ানকে বাঁচাতে পারবে না।'

'কেন?' ভুরু নাচাল রবিন।

'চোরাই একটা বেল্টের বাকলস পাওয়া গেছে আমাদের আস্তাবলে। জুলিয়ানের স্যাডল ব্যাগে।'

'শুধু বাকলস? আর কিছু?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না, আর কিছু না। শেরিফ বলল, জুলিয়ানকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। ওকে বলতে বাধ্য করবে, চোরাই মাল কোথায় লুকিয়েছে।'

'বোকা নাকি সব এ দেশে?' বিরক্তিতে নাক কুঁচকালো কিশোর। 'চিলে কান নিল বলল একজন, আর সবাই ছুটল চিলের পেছনে। শেরিফেরও তো মাথামোটা মনে হচ্ছে। কি কি অলঙ্কার চুরি গেছে?'

'অনেক। বেশি দামীগুলোর মধ্যে আছে দুটো হার, পাথর বসানো, একই রকম দেখতে। গোটা তিনটে ব্রেসলেট আর দুটো আঙটি।'

'চুরি হয়েছে কোত্থেকে?'

'এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে, একটা ক্যারাভান থেকে। টুরিস্ট। ক্যারাভান নিয়ে বেড়াতে এসেছে।'

'কিন্তু বারো বছরের একটা ছেলে এত দামী জিনিস দিয়ে কি করবে? ওই জিনিস বিক্রিও করতে তো পারবে না। কেন করতে যাবে অহেতুক?'

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলে চুপ হয়ে গেল জিনা, বলল না।

'শেরিফের কাছে বোধহয় আমাদের একবার যাওয়া দরকার,' আবার বলল কিশোর। 'হয়তো বোঝাতে পারব গতরাতে কি ঘটেছে...'

'টনি না ফিরলে যেতে পারছি না, স্টেশন ওয়াগনটা নিয়ে গেছে,' জিনা বলল। 'শেরিফ আসার আগেই গেছে শহরে।'

'জীপটা?'

'ওটা নিয়ে বাজারে গিয়েছিল ডিউক আংকেল আর ভিকিখালা। শেরিফ এসে জুলিয়ানকে ধরে নিয়ে গেল। ফিরে এসে সব শুনে খালাকে নামিয়ে দিয়েই জীপ নিয়ে ছুটেছে আংকেল। শেরিফের পিছু পিছু।'

'অফিসে ফোন করি তাহলে?'

'পাওয়া যাবে না,' মাথা নাড়ল জিনা। 'অফিসে যাবে না। ক্যারাভানে যাবে শেরিফ। জুলিয়ানকে চিনতে পারে কিনা ওরা, দেখবে। বাকলসটাও দেখাবে।'

'ওরা চিনবে না জুলিয়ানকে,' দরজার কাছ থেকে বলল ভিকি খালা। 'আগে কখনও দেখলে তো। সাফ বলে দেবে, জুলিয়ান চোর নয়।'

'নিশ্চয়ই বলবে,' সান্ত্বনা দিল কিশোর, যদিও দ্বিধা আছে তার মনে। 'জুলিয়ান চোর হতেই পারে না।'

আবার কাঁদতে শুরু করল ভিকি। 'ডিউকের সঙ্গে আমারও যাওয়া উচিত ছিল। কি ভুলটাই না করলাম।' জোরে কেঁদে উঠল সে। 'বাচ্চা ছেলে, কি যে ভয় পাবে· ধমক দিলে, উল্টো-পাল্টা কি বলে বসে···হায় হায়, ছেলেটাকে বুঝি আর বাঁচাতে পারলাম না!'

'অযথা অস্থির হচ্ছেন,' বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর। 'দেখবেন, কিছুই হবে না ওর।'

একটা চেয়ারে নেতিয়ে পড়ল ভিকি।

রবিন গিয়ে চায়ের পানি বসাল। ভিকির কাছ থেকে শেখা সুগন্ধী দেয়া চা বানিয়ে আনল। আগে ভিকিকে দিল এক কাপ।

'হায় হায়, আমি কি করব রে!' কপাল চাপড়াল ভিকি। 'ওর মায়ের কাছে আমি কি জবাব দেব?'

'কিছুই জবাব দিতে হবে না,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'ওকে ছাড়িয়ে নেবই আমরা। শেরিফ তো আসবে আবার। না এলে আমরাই যাব ওর কাছে। আশা করি, বোঝাতে পারব।'

কান্না থামাল ভিকি। চা খেয়ে শান্ত হলো অনেকখানি। তারপর উঠে গিয়ে লাঞ্চের জোগাড় শুরু করল।

পিন্টো ঘোড়াটার খোঁজ নিয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'নিয়েছিলাম,' জানাল জিনা। 'ধারেকাছে যে ক'টা র‍্যাঞ্চ আছে, সবারই আছে পিন্টো। কাল রাতে কেউ নাকি বেরোয়নি।'

'বেরোলেও কি আর স্বীকার করবে?' হতাশার হাসি হাসল মুসা।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ঘোড়া বেশি থাকায় কাজ জটিল হয়ে গেল আরও, আন্দাজে কাকে সন্দেহ করব?'

'কিচ্ছু ঢুকছে না আমার মাথায়!' মাথা ঝাড়া দিল জিনা। 'কে বেচারাকে ফাঁসাতে চায়? কেন?'

'আজ হোক কাল হোক, জেনে যাবই সেটা,' বলল কিশোর।

টেবিলে খাবার দিল ভিকি। টনি, ডিউক আর জুলিয়ানের জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ওরা। কেউ এল না। শেষে খেতে বসে গেল। রান্না ভাল, খাবারও

ভাল, কিন্তু রুচি মরে গেছে সবারই। এমনকি মুসাও বিশেষ কিছু মুখে তুলতে পারল না। ভিকি আরেক কাপ চা খেল, ব্যস।

খাওয়ার পর থালাবাসনগুলো ছেলেমেয়েরাই ধুয়ে রাখল।

আবার অপেক্ষার পালা। গড়িয়ে চলেছে মিনিটগুলো, সময় যেন কাটতেই চায় না।

দুপুরের পর জীপের শব্দ শোনা গেল। ডিউক এসেছেন। বসার ঘরে ছুটে গেল সবাই।

'জুলিয়ান কই? নিয়ে এলে না কেন?' স্বামীকে ঢুকতে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল ভিকি।

বিষণ্ন, থমথমে হয়ে আছে শিক্ষকের মুখ। শুধু কালো চোখদুটোয় বেদনা। 'শেরিফ নিয়ে আসবে। আমাকে চলে আসতে বলল, তোমাকে বোঝাতে।'

সামান্য স্বস্তি যা ফিরে এসেছিল, দূর হয়ে গেল আবার ভিকির মুখ থেকে। ককিয়ে উঠল, 'বিশ্বাস করো ডিউক, ও চুরি করেনি! করেনি!'

'আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কি এসে যায়, বলো? ওরা ওকে চিনতে পেরেছে। ক্যারাভানের কাছে নাকি ঘুরঘুর করছিল, তার কিছুক্ষণ পরেই চুরি যায় গহনাগুলো।'

'ঘুরঘুর করেনি,' প্রতিবাদ করল ভিকি। 'আমাকে তো বলেছে কালই, ওপথে পাহাড়ে গিয়েছিল। আর ঘুরঘুর করলেই কি প্রমাণ হয়ে গেল সে-ই চুরি করেছে? কেউ নিতে দেখেছে?'

'ওর স্যাডল ব্যাগে বাকলস পাওয়া গেছে।'

ছিটকে সরে এল ভিকি। কড়া চোখে তাকাল স্বামীর দিকে।

'তুমিও বিশ্বাস করো এ সব? জুলিয়ান গহনা চুরি করেছে?'

দীর্ঘ এক মুহূর্ত স্ত্রীর চোখে চোখে তাকিয়ে রইলেন শিক্ষক। 'করতে তো চাই না, ভিকি। কি বলব, বলো?'

কেউ আর কিছু বলার আগেই বাইরে গাড়ির শব্দ হলো।

জুলিয়ানকে নিয়ে ঘরে ঢুকল শেরিফ।

ছুটে এল ছেলেটা। ফুপুকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। তাকে থামানো দূরে থাক, তার সঙ্গে যোগ দিল আরও ভিকি।

কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল শেরিফ। 'জিনিসগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছে বলল না, এত চেষ্টা করলাম। ওরা বলেছে, গহনাগুলো ফেরত পেলেই খুশি। চার্জ তুলে নেবে। কালই চলে যাচ্ছে ওরা। এর মাঝে বের করে দিলে বেঁচে যাবে জুলিয়ান।'

'কসম খোদার, ফুপু,' কাঁদতে কাঁদতে বলল জুলিয়ান, 'আমি চুরি করিনি। কোথায় আছে জানি না!'

'করিসনি যে সে-তো জানিই আমি,' আরও জোরে ভাইপোকে জড়িয়ে ধরল ভিকি। চিবুক ধরে মুখটা তুলে জিজ্ঞেস করল, 'খিদে পেয়েছে? খেয়েছিস কিছু?'

মাথা নাড়ল জুলিয়ান।

'ভাল মানুষকে চোর বলে ধরে নিয়ে যায়, আর খাওয়া দেবে ওরা,' শেরিফের দিকে তির্যক দৃষ্টি হেনে জুলিয়ানকে নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল ভিকি।

এগিয়ে গেল কিশোর। নিজের পরিচয় দিল।
'গোয়েন্দা, হাহ্!' বিদ্রূপ ছড়িয়ে পড়ল শেরিফের মুখে।
গম্ভীর হয়ে গেল কিশোর। পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে দিল। 'এই যে এটা দেখুন। তাহলেই বুঝবেন।'
লস অ্যাঞ্জেলেসের পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচারের লেখা সার্টিফিকেট দেখে নরম হয়ে গেল শেরিফ। 'ডোন্ট মাইণ্ড। চোর-ছ্যাঁচোরদের নিয়ে থাকতে থাকতে বদমেজাজী হয়ে গেছি।'
শেরিফকে সব খুলে বলল কিশোর। মাঝে মাঝে কথা ধরিয়ে দিল মুসা আর রবিন। রহস্যময় চিঠিটা দেখাল কিশোর।
'হুঁম,' গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল শেরিফ। 'তো, তুমি বলছ ছেলেটাকে কেউ ফাঁদে ফেলেছে?'
'তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাল রাতে পিন্টো ঘোড়া নিয়ে এসেছিল যে লোকটা, সে-ই স্যাডল ব্যাগে বাকলস রেখে গেছে, আমি শিওর। এসেছিলই এ জন্যে।'
'কিন্তু জুলিয়ানকে বিপদে ফেলে কার কি লাভ?'
'সেটাই তো বুঝতে পারছি না। তাহলে তো রহস্যেরই সমাধান হয়ে যেত এতক্ষণে।'
'তা ঠিক। তোমার কথায় যুক্তি আছে, কিশোর পাশা, কিন্তু ছেলেটাকে তো ছাড়তে পারি না। সন্দেহের অভিযোগে আটক করতে হয়েছে। ওরা গহনা ফেরত না পেলে, চার্জ না তুললে কিছুই করতে পারছি না।'
শেরিফকে অনুরোধ করে লাভ নেই, বুঝতে পারল কিশোর। ভাবনায় পড়ে গেল। হাতে সময় আর মাত্র কয়েক ঘন্টা, এর মাঝে রহস্যের সমাধান না করতে পারলে খুব অসুবিধে হবে জুলিয়ানের।
'আপনার মিসেসকে একটু ডাকুন তো, প্লীজ,' ডিউকের দিকে চেয়ে বলল শেরিফ। 'কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করি।'
উঠতে যাচ্ছিলেন শিক্ষক, হাত তুলে বাধা দিল মুসা। 'আপনি বসুন। আমিই যাই।'
ভিকিকে ডেকে আনল মুসা।
'তুমি গিয়ে রান্নাঘরে বসো,' মুসাকে অনুরোধ করল শেরিফ। কেন, বুঝতে পারল মুসা। জুলিয়ানকে পাহারা দিতে বলছে।
আবার এসে রান্নাঘরে ঢুকল সে। আরে, জুলিয়ান কই? অর্ধেকটা স্যাণ্ডউইচ পড়ে আছে প্লেটে, দুধের গেলাসটায় তিন ভাগের একভাগ দুধ। শেষ করেনি।
ছুটে জানালার কাছে চলে এল মুসা। বাগানের শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে জুলিয়ান, আস্তাবলের দিকে ছুটছে।
পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে মুসাও দৌড় দিল।
সে আস্তাবলের কাছে যাওয়ার আগেই ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে গেল জুলিয়ান।
ছুটে আস্তাবলে ঢুকল মুসা। সামনে যে ঘোড়াটা পেল সেটাতেই জিন পরিয়ে

এক লাফে চড়ে বসল।

অনেক এগিয়ে গেছে পিন্টো। ওটাকে ধরা সহজ হবে না। যতটা জোরে সম্ভব ঘোড়া ছোটাল মুসা।

চলতে চলতে একটা প্রশ্ন জাগল মনে। কোথায় যাচ্ছে জুলিয়ান? দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল মুসা। জুলিয়ানকে ধরার চেষ্টা করবে না, পিছে পিছে গিয়ে দেখবে ছেলেটা কোথায় যায়।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে অনুসরণ করে চলল মুসা। ইতিমধ্যে দু-একবার পেছনে ফিরে তাকিয়েছে জুলিয়ান। একই গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

ছোট ছোট পাহাড়ের সারি পেরিয়ে এল ওরা। রিসোর্টের সীমানার খুঁটি দেখা যাচ্ছে। আর কিছুদূর গেলেই শুরু হবে সুপারস্টিশন মাউন্টেইন।

পর্বতের ছায়ায় পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামল জুলিয়ান। চারপাশে পাহাড়ে ঘেরা গোল একটা উপত্যকায় টেনে নামাল ঘোড়াটাকে। প্রচুর সবুজ ঘাস আছে ওখানে। তারপর পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল ওপরে।

জুলিয়ানের দেখাদেখি মুসাও তার ঘোড়া বাঁধল গোল উপত্যকায়। পিছু নিল।

চূড়ায় উঠে ফিরে তাকাল জুলিয়ান। ঠোঁটে আঙুল রেখে কোনরকম শব্দ না করতে ইশারা করল মুসাকে। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

মানুষের কণ্ঠ কানে এল মুসার। ওপাশে নিচে কারা যেন কথা বলছে। শাবল-কোদালের আওয়াজ। মাটি খুঁড়ছে মনে হয়।

চোদ্দ

এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল মুসা, তারপর বাকি কয়েক ফুট প্রায় ছুটে পেরোল। চূড়ায় এসে হুমড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ল জুলিয়ানের পাশে।

নিচে একটা গিরিখাদ। বড় বড় পাথরের চাঙড় পড়ে রয়েছে। ঝোপঝাড় আর গাছপালা এত ঘন, ভাল করে না তাকালে খাদটা চোখে পড়ে না।

দু-জন লোক কথা বলছে আর কাজ করছে। একজন লম্বা, লালচে চুল। অন্যজন তার চেয়ে বেঁটে, কালো চুল। গিরিখাদের এক দিকের দেয়াল খুঁড়ছে ওরা। আরেক দিকে খানিকটা উঁচুতে খোলামত জায়গায় একটা কাঠের কেবিন।

ওদের একটা ঘোড়া দেখে চমকে গেল মুসা। সাদা-কালো পিন্টো, অবিকল জুলিয়ানের ঘোড়াটার মত দেখতে।

নীরবে পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। আবার চোখ ফেরাল খাদের দিকে। কয়েক মিনিট দেখে জুলিয়ানকে ইশারা করল মুসা, সরে আসার জন্যে। এ পাশে কয়েক ফুট নেমে এল, কথা বললে যেন লোকগুলো শুনতে না পায়।

'কে ওরা?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল মুসা।

'বোধহয়, প্রসপেক্টরস।'

'রিসোর্ট এলাকার মধ্যে?' জুলিয়ানও অবাক হলো।

চারপাশে তাকিয়ে দেখল মুসা। ল্যাণ্ডমার্ক দেখা যায়। প্রথম যেদিন টনি আর

জিনার সঙ্গে বেরিয়েছিল, সেদিন ওই চিহ্ন চিনিয়েছে ওরা। 'হ্যাঁ, রিসোর্ট এলাকা। ওই যে চূড়াটা, ওখান পর্যন্ত সীমানা।'

'সোনা খুঁজছে বোধহয় ব্যাটারা,' ক্লান্ত হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল জুলিয়ানের ঠোঁটে। 'পেলে তো একটা কাজের কাজই করে ফেলবে।'

'আগে কখনও ওদেরকে দেখেছ এখানে?'

নার্ভাস ভঙ্গিতে নড়ল জুলিয়ান, চোখ সরিয়ে নিল। ঘুরিয়ে জবাব দিল, 'দেখতে এসেছি কয়েকবার।'

'ওরা দেখেছে তোমাকে? কিছু গোপন করছে জুলিয়ান, বুঝতে পারল মুসা।

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল জুলিয়ান। 'একবার। এখানে না। ওদিকে আরেকটা উপত্যকা আছে, চারপাশে পাহাড়, ওখানে। ঘোড়া নিয়েই নামলাম, দেখতে গেলাম কি করছে। রেগে গেল ওরা, লম্বুটা তো গুলিই করে বসল। সরে গেছি আগেই, তাই লাগেনি। তারপর বেশ কিছুদিন আর যাইনি ওদিকে।'

'গুলি করেছে?' বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা।

মাথা ঝাঁকাল জুলিয়ান। 'আমি কিচ্ছু করিনি। খালি দেখতে গিয়েছিলাম, কসম।'

'আমি বিশ্বাস করছি তোমার কথা। ওদিকেও কি সোনাই খুঁজছিল?'

আবার মাথা ঝাঁকাল জুলিয়ান। 'প্রসপেক্টররা পাহাড়ে যা করে, তা-ই করছিল। বহুবার লুকিয়ে দেখেছি।'

চুপ করে কিছু ভাবল মুসা। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল, 'আজ কোথায় যাচ্ছিলে? কাউকে কিছু না বলে চুরি করে যে পালিয়ে এলে?'

পাতলা চোয়ালদুটো দৃঢ়বদ্ধ হলো। আবার সরিয়ে নিল চোখ। 'ঘুরতে যাচ্ছিলাম।'

চুপ করে রইল মুসা। অপেক্ষা করছে।

'পালিয়ে যাচ্ছিলাম,' অবশেষে স্বীকার করল জুলিয়ান। 'আর ফিরে যাব না রিসোর্টে।'

'সেটা কি ঠিক হবে? তোমার ফুপা-ফুপুর কথা ভাবলে না। ওরা তোমাকে কত ভালবাসে।'

'ফুপা আমাকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেবে। ভাবছে, আমি চোর। শেরিফ বলেছে, আমি খুব খারাপ ছেলে। কসম খেয়ে বলেছি, আমি চুরি করিনি। কোত্থেকে ফিরিয়ে দেব?' বড় বড় চোখ দুটোতে অশ্রু টলমল করে উঠল। 'হয়তো পিন্টোকেও কেড়ে নেবে আমার কাছ থেকে। এসব তো অন্যায়। ওকে কেন কেড়ে নেবে আমার কাছ থেকে, বলো? ও তো আমার, চুরি করে আনিনি।'

ছেলেটার দুঃখ বুঝতে পারছে মুসা। 'কিন্তু পালিয়ে যে যেতে চাইছ, এতে তো সন্দেহ আরও বাড়বে ওদের। কদ্দিন ওদের চোখ এড়িয়ে বাঁচতে পারবে?'

চুপ করে রইল জুলিয়ান। জবাব দিতে পারল না।

এই প্রসঙ্গ বাদ দিল মুসা। জানাল, আগের রাতে কি ঘটেছে, কি করে আরেকটা পিন্টো ঘোড়াকে অনুসরণ করে নালায় গিয়ে মরতে বসেছিল কিশোর।

গিরিখাদের পিন্টোটার কথা উল্লেখ করে জুলিয়ান বলল, 'বোধহয় ওটাই।'

হাসল মুসা। 'আমারও তাই ধারণা।' 'আচ্ছা, এখান থেকে কোথাও যায় না ওরা? সরে না?'

'সরে। কেন?'

'ওই কেবিনটায় ঢুকে দেখতে চাই। সব গোলমালের মূলে ওরা হলে, ওখানে কিছু সূত্র পাবই। আমি না বুঝলেও, কিশোরকে বললে বুঝবে, কেন তোমাকে ফাঁসাতে চাইছে ওরা।'

'এক কাজ করলেই পারি,' দুষ্টু হাসি ফুটল জুলিয়ানের ভেজা চোখের তারায়। 'আমাকে তাড়া করুক ওরা! এই সুযোগে তুমি নেমে ঢুকে পড়ো কেবিনে।'

মাথা নাড়ল মুসা। 'ভীষণ রিস্কি হয়ে যাবে···' কথা শেষ করতে পারল না সে, তার আগেই ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করেছে জুলিয়ান।

বাধা দেয়ার সুযোগই পেল না মুসা। এক লাফে ঘোড়ায় চড়ে ছুটল জুলিয়ান। এদিকে ফিরে হেসে হাত নাড়ল।

দ্বিধা করছে মুসা। কেবিনে ঢুকতে তাকে বাধ্য করল জুলিয়ান। মস্ত ঝুঁকি নিয়েছে সে, এখন আর পিছিয়ে আসা চলবে না মুসার।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল মুসা, আবার উঠে এল চূড়ায়। উপুড় হয়ে শুয়ে তাকিয়ে রইল নিচের দিকে।

গিরিপথের মত একটা জায়গা দিয়ে ঢুকতে হয় গিরিখাদে। পথের মুখে দেখা দিল জুলিয়ান। কেউ দেখল না তাকে। তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে চেঁচিয়ে উঠল সে। কি বলল, স্পষ্ট বোঝা গেল না দূর থেকে। তবে 'চোর' আর 'সোনা' এই দুটো শব্দ কানে এল।

হাত থেকে বেলচা ফেলে কোরালের দিকে দৌড় দিল লোকদুটো। দেখতে দেখতে জিন পরিয়ে চেপে বসল ঘোড়ায়। জুলিয়ানকে তাড়া করল।

ওরা গিরিপথে অদৃশ্য হতেই উঠে পড়ল মুসা। দ্রুত গাছের আড়ালে আড়ালে নেমে চলে এল গিরিখাদের পাড়ে।

খাদের দেয়ালে অসংখ্য গর্ত, বোঝা গেল, লোকগুলোই খুঁড়েছে। ভালমত দেখার সময় নেই, একবার নজর বুলিয়েই কেবিনের কাছে চলে এল সে।

দরজার কব্জায় তেল পড়েনি বহুদিন, ঠেলা দিতেই কিচকিচ করে উঠল। ঢুকে আবার দরজা বন্ধ করে দিল মুসা। আসবাবপত্র তেমন কিছু নেই। একমাত্র জানালাটার কাছে রয়েছে একটা টেবিল আর দুটো টুল। দুটো চারপায়া, খাড়া করে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে দেয়ালের সঙ্গে। আনাড়ি হাতে তৈরি একটা শেলফে রান্নার সরঞ্জাম আর খাবার। বেশির ভাগই টিনজাত খাদ্য।

দরজার পাশে পড়ে আছে একটা ট্রাংক। ওটার দিকেই এগোল মুসা। ডালা তুলেই স্থির হয়ে গেল।

এলোমেলোভাবে ফেলে রাখা কাপড়ের ওপর পড়ে আছে অনেকগুলো গহনা।

কোন সন্দেহ নেই, চোরাই মাল। এগুলোই চুরি করে আনা হয়েছে ক্যারাভান থেকে। দুটো একরকম হাড় দেখেই বোঝা গেল সেটা। ব্রেসলেট আছে তিনটে, দুটো আঙটি এবং আরও কিছু গহনা।

সাবধানে গহনাগুলো সরিয়ে রেখে কাপড়ের তলায় খুঁজতে শুরু করল মুসা। রঙচটা জিনসের একটা প্যান্ট টান দিতেই তলায় পাওয়া গেল লাল শার্ট, পিঠের কাছে খানিকটা জায়গা ছেঁড়া, কাপড়ই নেই। ওই শার্টের ভেতরেই পেঁচানো আরও দুটো জিনিস পাওয়া গেল, একটা চিনতে পারল, আরেকটা পারল না। তবে দুটোই যে রিমোট কমাণ্ডার, এটা বুঝতে অসুবিধে হলো না।

সরুটা বোমা ফাটানোর যন্ত্র; আর চ্যাপ্টা, অপেক্ষাকৃত বড়টা কোন্ যন্ত্রের কমাণ্ডার, চিনল না। তবে জটিল কোন ইলেকট্রনিক যন্ত্রের হবে, সন্দেহ নেই।

তাহলে এই ব্যাপার।

বসে পড়ে ভাবতে শুরু করল মুসা। কি করবে এখন? জিনিসগুলো নিয়ে যাবে পোঁটলা বেঁধে? নাকি শুধু শার্ট আর গহনাগুলো নেবে? সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন। ইস্ এখন কিশোর এখানে থাকলে ভাল হত। সঠিক কাজটা করতে পারত সে।

মুসার মনে হলো, জিনিসগুলো যেখানে রয়েছে সেখানে থাকলেই ভাল। নিজের চোখে এসে দেখে যাক শেরিফ। কিন্তু আরেকটা সমস্যা আছে। জুলিয়ানকে ধরতে না পারলে হুঁশিয়ার হয়ে যাবে দুই চোর। জিনিসগুলো এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে পারে। লোকজন নিয়ে ফিরে এসে তখন হয়তো আর কিছুই দেখাতে পারবে না মুসা। লজ্জায় পড়বে।

হঠাৎ, বাইরে শব্দ শোনা গেল। ঘোড়ার নালের শব্দ। দ্রুত এগিয়ে আসছে।

'সেরেছে!' লাফিয়ে উঠে জানালার কাছে ছুটে গেল মুসা। ধূলিধূসরিত জানালার নোংরা কাঁচে নাক ঠেকিয়ে বাইরে তাকাল। সর্বনাশ! লোক দু-জন ফিরে আসছে। জুলিয়ান নেই সঙ্গে।

'বিপদে পড়া গেল, রিকি,' লম্বা লোকটা বলল। 'গেল কই বিচ্ছুটা?'

'আস্ত কয়োটের বাচ্চা,' গাল দিল বেঁটে। 'কি করি এখন বল তো?'

কোরালের দিকে চলেছে দু-জনে। 'ওর কথা কেউ বিশ্বাস করবে না,' বলল বটে, কিন্তু জোর নেই গলায়। 'সকালে নাকি শেরিফ ওকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, চুরির দায়ে। একেই বলে কপাল, চুরি করলাম আমরা, আর ফাঁসল কিনা...' হা হা করে হাসল লোকটা।

কুৎসিত হাসিতে যোগ দিল না রিকি। আরও গম্ভীর হয়ে বলল, 'অত হেসো না, পেক। ওই তিনটে বিচ্ছুর কথা ভুলে যেয়ো না, রকি বীচ থেকে যেগুলোকে দাওয়াত করে আনা হয়েছে। হেলাফেলা করো না ওদের। বসের কাছে শুনলাম, ওরা ডেঞ্জারাস। একবার যার পেছনে লেগেছে, তার সর্বনাশ করে ছেড়েছে।'

'কি করতে বলো তাহলে?' প্রশ্ন করল পেক। 'বিচ্ছুটা যে আবার এসেছিল, এখানে আমাদের খুঁড়তে দেখেছে, বসকে বলব? যাব র‍্যাঞ্চে?'

মাথা নাড়ল রিকি। 'না, আজ রাতে তো আসবেই বস এখানে, বলল না? খোঁড়া কদ্দূর হয়েছে দেখতে। সঠিক জায়গাটা খুঁড়ে পাইনি আমরা এখনও।'

'তবে কাছাকাছি পৌঁছেছি। নুড়িদুটো পেলাম, সেটাই প্রমাণ।'

'সেটা আমারও মনে হচ্ছে। কবে থেকেই তো বলছি এই গর্তে এসে খুঁজতে, তুমি আর বসই তো রাজি হচ্ছিলে না। পানিতে ধুয়ে মাটি সরে গেলে শিরা থেকে

গড়িয়ে পড়বে সোনার নুড়ি, এটা তো সহজ কথা। আর গড়িয়ে একটা দিকেই পড়ে জিনিস, নিচের দিকে।'

'সে-তো আমিও জানি। আমার প্রশ্ন হলো, খনিটা আছে কোথায়? ওটা খুঁজে না পেলে এত কষ্ট সব···দাঁড়াও, আরও খুঁড়ব। আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত দেখি কি পাওয়া যায়।'

'খিদে পেয়েছে আমার,' বলল রিকি। 'চলো, আগে খেয়ে নিই।'

কোরালে ঘোড়া রেখে কেবিনের দিকে রওনা হলো দু-জনে। কথা বলছে এখনও। কিন্তু সে সবে কান নেই আর মুসার। আটকা পড়েছে। বেরোতে গেলেই এখন ওদের চোখে পড়বে। দরজা ছাড়া বেরোনোরও আর কোন পথ নেই। আর খাবার বের করার জন্যে এখন ঘরে ঢুকলেই হবে সর্বনাশ।

কিছুটা এগিয়ে মোড় নিল রিকি আর পেক। খাদের দিকে চলল। ব্যাপার কি? নতুন কিছু চোখে পড়ল নাকি? ওদিকে যাচ্ছে কেন?

খানিক পরেই বোঝা গেল, কেন গেছে। ওখানেই খাবার রেখেছে, খাদের নিচে পাথরের ওপর। যাক, একটা ভয় আপাতত গেল। খাবারের জন্যে আর ঘরে ঢুকতে আসবে না ওরা।

তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে আবার বেলচা তুলে নিল দু-জনে। খুঁড়তে শুরু করল।

জানালার কাছে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল সে। ঢোকার সময় তো ঢুকেছে, এখন বেরোয় কিভাবে? দরজা কিংবা জানালা যেদিক দিয়েই বেরোক, ওদের চোখ এড়াতে পারবে না। কিন্তু এখানে কতক্ষণ বসে থাকবে? আর থাকাটাও যে নিরাপদ, তা-ও নয়। একসময় না একসময় কেবিনে ঢুকবেই ওরা, দেখে ফেলবে ওকে।

পনেরো

সারা ঘরে আরেকবার চোখ বোলাল মুসা। ট্রাংকের কাপড় আবার আগের মত করে ভরে গহনাগুলো রেখে দিল তার ওপর। ডালা নামিয়ে রাখল।

তারপর এসে একটা টুলে বসে ভাবতে লাগল, কিন্তু বেরোনোর কোন উপায় দেখল না।

তাহলে এ ঘরেই কোথাও লুকিয়ে থাকতে হবে। ছোট্ট ঘর। লুকানোর জায়গা নেই। কয়েকটা কম্বল অবহেলায় স্তূপ হয়ে পড়ে আছে এককোণে। আশা হলো তার। ওগুলোর নিচে লুকালে হয়তো চোখে পড়বে না কারও। লুকিয়ে থাকবে, তারপর লোকগুলো ঘুমিয়ে পড়লে কোন এক সুযোগে বেরিয়ে যেতে পারবে।

লুকানোর জায়গার মোটামুটি একটা ব্যবস্থা করে জানালার কাছে ফিরে এল মুসা। দু-জনের কাজ দেখতে লাগল বসে বসে। আর কিছু করার নেই। অলস ভঙ্গিতে পাহাড়ের গা খুঁচিয়ে চলেছে ওরা। সোনা! হ্যাঁ, এখানকার সমস্ত গোলমালের মূলে ওই সোনার খনি।

ডাক্তার জিংম্যানের নামটা বার বার ঘুরেফিরে আসছে মনে। মিস্টার উইলসনের সম্পত্তি কেন কিনতে চেয়েছিল সে, এখন বোঝা যাচ্ছে।

এক ঘন্টা কাটল, আরও এক ঘন্টা। খোঁড়ায় বিরাম নেই রিকি আর পেকের। মাঝে মাঝে একটা পুরানো মেসকিটের ছায়ায় বসে জিরিয়ে নিচ্ছে। গাছটার পাশেই ছোট একটা ঝর্না। তৃষ্ণার্ত চোখে ওটার দিকে তাকাচ্ছে মুসা। গরমে, বদ্ধ এই নোংরা ঘরে বসে থেকে থেকে ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছে তার। গলা শুকিয়ে কাঠ।

সূর্য অস্ত যাওয়ার আগের ক্ষণে লম্বা লম্বা ছায়া পড়ল উপত্যকায়। কাজ থামাল লোকগুলো। শাবল-বেলচা ফেলে দিয়ে পা বাড়াল কেবিনের দিকে।

দুরুদুরু করতে লাগল মুসার বুক। তাড়াতাড়ি উঠে এগোল লুকিয়ে পড়ার জন্যে।

কম্বলের তলায় অন্ধকারে ঢুকে গেল।

ঘরে ঢুকল দুই প্রসপেক্টর। খাবারের টিন খুলতে খুলতে আলোচনা চালাল। বেশির ভাগই জুলিয়ানের কথা। ওরা অসতর্ক থেকেছে বলে বস যে ভীষণ বকবে, সে জন্যে অস্বস্তি বোধ করছে।

দম বন্ধ হয়ে আসছে মুসার, এই গরমে কম্বলের মধ্যে থাকাটা এক ভয়ানক অস্বস্তির ব্যাপার। আর যখন পারে না সে, অসহ্য হয়ে উঠেছে, তখন বেরোল লোকগুলো। সঙ্গে সঙ্গে একদিক ফাঁক করে নাকমুখ বের করে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

বাইরে আগুন জ্বালানোর শব্দ। রান্নার ব্যবস্থা হচ্ছে। একটু পরেই শিকে গাঁথা ঝলসানো মাংসের সুগন্ধ এসে কেবিনেও ঢুকল। জিভে পানি এসে গেল মুসার, মোচড় দিয়ে উঠল পেটের ভেতর। দুপুরে প্রায় কিছুই খায়নি, প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। কিন্তু করবেটা কি? বাইরে অবশ্য এখন অন্ধকার, কিন্তু তবু বেরোতে পারবে না, চোখে পড়ে যাবেই। দরজার কাছেই বসেছে ওরা।

কম্বলের তলায় অসহ্য লাগছে। ঘামছে। বেরিয়ে হাত-পা ঝাড়া দেয়ার লোভটা সামলাতে পারল না। আর বেরোতে গিয়েই বাধাল বিপত্তি। তার রাইডিং বুটে বেধে গেল কম্বলের ছেঁড়া একটা জায়গা, খেয়াল করল না সে। লাগল হ্যাঁচকা টান। হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়ল একটা চারপায়ার ওপর। দড়াম করে পুরো বাড়ি কাঁপিয়ে পড়ল চারপায়াটা।

সঙ্গে সঙ্গে হই-চই শোনা গেল বাইরে। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা।

দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল মুসা।

লণ্ঠন হাতে ঢুকল একজন। দেখে ফেলল মুসাকে।

'রিকি,' হাসি হাসি গলায় চেঁচিয়ে ডাকল পেক, 'দেখে যাও এসে। একটা ছুঁচো।'

'মেরে ফেলো। মাড়িয়ে দাও পা দিয়ে···'

'আরে ওই ছুঁচো না, মানুষ ছুঁচো। জলদি এসো।'

রিকি ঢুকল। 'বাহ্, চমৎকার···'

কথা শেষ হলো না তার। ঘরে ঢুকল আরেকজন।

ডাক্তার জিংম্যান! উইলসনের নিকটতম প্রতিবেশী এবং বন্ধু।

'পিচ্চি হোমস্টার সহকারী না এটা?' বলল ডাক্তার। 'হুঁম। তো মিয়া, এখানে কি মনে করে? তোমার দোস্ত তো চিঠিকেও কেয়ার করল না, বিছেকেও ভয় পেল না। সাহস থাকা ভাল। তবে বেশি সাহস···'

'তিন বিচ্ছুর একটা নাকি এটা, বস?' জিজ্ঞেস করল রিকি।

'আবার জিজ্ঞেস করে, গাধা কোথাকার! চেনো না? তীর ছোঁড়ার সময় কি চোখ বুজে ছিলে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। এটাই তো ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল অন্য দুটোকে। নইলে সেদিন পালের গোদাটা যেত। না মরলেও আধমরা তো হতই।'

'হতে তো কত কিছুই পারত, কম সুযোগ মিস করেছ? এটা করলে ওটা করলে, সব ফুস আর ফাস! নালায় টেনে আনলে, এত নিরালা জায়গা, একলা পেলে, তা-ও কিছু করতে পারলে না,' কর্কশ শোনাল জিংম্যানের কণ্ঠ।

'সেটা কি আমার দোষ? পানি আসা পর্যন্ত থাকলই না, উঠে চলে গেল।'

'যাতে না যেতে পারে সে রকম ব্যবস্থা করতে পারতে।'

এত অভিযোগ শুনতে ভাল লাগল না রিকির, সে-ও রেগে গেল। 'আমাকে এক বলো কেন? সুযোগ তো তুমিও পেয়েছ। ধাক্কা দিতে গিয়েছিলে গাড়িকে, পেরেছ? ঠিক নেমে চলে গেল পথের পাশে···'

'দূর,' বিরক্ত হয়ে হাত নাড়ল পেক, 'শুরু করল ঝগড়া! অহেতুক তর্ক না করে এটাকে কি করব, তাই বলো।'

ভুরু কুঁচকে ভাবল এক মুহূর্ত জিংম্যান। 'আপাতত হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখো। পরে ভেবেচিন্তে একটা দুর্ঘটনা ঘটানো যাবে। ঢুকে যখন পড়েছে, বেরোতে আর দিই কি করে?' মুসার হাত চেপে ধরল সে। সহকারীদের বলল, 'দড়ি আনো।'

লম্বা শ্বাস টানল মুসা। অপেক্ষা করছে। আড়চোখে দেখল, দরজার কাছ থেকে সরে আসছে পেক। দড়ি আনতে ঘরের কোণে গেল রিকি। এই-ই সুযোগ! চোখের পলকে বুট তুলে গায়ের জোরে লাথি মারল ডাক্তারের বাঁ পায়ের হাঁটুর ওপর।

'আঁউ!' করে উঠল ডাক্তার। ঢিলে হয়ে গেল আঙুল।

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল মুসা। মাথা নিচু করে ছুটে গেল পেকের পেট সই করে। তার নিগ্রো-খুলির বদনাম আছে। রবিন তো বলে, তার মাথায় আছড়ে পাকা নারকেল ভাঙা যায়, এত শক্ত। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। তার মাথার গুঁতো যে একবার খেয়েছে, সহজে ভুলবে না।

সেই অভিজ্ঞতা পেকেরও হলো। গুঁতো খেয়ে 'বাপরে'! বলে চেঁচিয়ে উঠে ধাক্কা খেল গিয়ে হাঁটু চেপে ধরে রাখা বসের গায়ে। তাকে নিয়ে পড়ল মেঝেতে। হাত থেকে পড়ে ভাঙল লণ্ঠন, আলো নিভে গেল।

দরজার দিকে দৌড় দিল মুসা। লাফিয়ে এসে নামল চৌকাঠের বাইরে।

ক্যাম্পফায়ারের আলোতে নাচছে ঝোপঝাড় আর গাছের ছায়া। দেখার সময় নেই, মাথা নিচু করে ছুটছে মুসা। ছোট ঝর্নাটার ধার দিয়ে এসে ঢুকল একটা ঘন ঝোপে। থামল। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক। ফিরে তাকাল। সাময়িক মুক্তি পেয়েছে বটে, কিন্তু এই পাহাড়ের ফাঁদ থেকে বেরোতে পারবে কিনা সন্দেহ।

বেরিয়ে এসেছে তিন বদমাশ।

'গিরিপথের মুখ আটকাও! আগুনে আরও লাকড়ি ফেলো! টর্চ আনো! ওকে পালাতে দেয়া যাবে না!' চিৎকার করে একের পর এক নির্দেশ দিয়ে চলল জিংম্যান।

খুব সাবধানে ঝোপের ভেতরে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল মুসা। বৃষ্টিকে ধন্যবাদ, ডালপাতা ভিজিয়ে রেখেছে। শুকনো নয়, ফলে খড়খড় শব্দ হচ্ছে না। অন্ধকার সয়ে এসেছে চোখে। সামনে দেখল পাথুরে পাহাড়ের ঢাল। এগোল সেদিকে। বড় পাথরের চাঙড়ের আড়াল, নিদেনপক্ষে একটা গর্ত পেলেও লুকিয়ে পড়া যায়।

ভাগ্য ভাল বলতে হবে, দুটোই পেল একসঙ্গে। চ্যাপ্টা একটা পাথর কাত হয়ে আছে, একদিকে সামান্য উঁচু, তার নিচে পেয়ালা-আকৃতির ছোট একটা গর্ত। কোনমতে জায়গা হবে শরীরটা। আর কোন বিকল্প নেই। ওর মধ্যে শরীর ঢুকিয়ে দিল সে। মাথা রইল এক পাড়ে ঠেকে, অন্য পাড়ে পা। পেছনটা গর্তের তলায়। মাটি গরম, মরুর ঠাণ্ডা রাতে বেশ আরাম লাগল এই উষ্ণতায়। তাপমাত্রার কি দ্রুত ওঠানামা এ সব অঞ্চলে, ভাবলে অবাক লাগে। এই তো, খানিক আগে গরমে কম্বলের নিচ থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে হাঁসফাঁস করছিল, আর এরই মধ্যে আবহাওয়া এতটাই শীতল হয়ে গেল, গরম এখন ভাল লাগছে।

ওকে গরুখোঁজা খুঁজছে তিনজন লোক। তাদের চেঁচামেচি আর নানারকম আওয়াজ স্পষ্ট কানে আসছে। তারপর হঠাৎ সব নীরব হয়ে গেল। বড় বেশি নীরব। কিছু একটা ঘটেছে।

আস্তে মাথা তুলল মুসা। কানে এল ঘোড়ার নালের খটাখট আর কুকুরের ঘেউ ঘেউ। তার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকল কেউ।

কিশোর! লাফ দিয়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়ল মুসা। ছুটল আবার ঝোপের ভেতর দিয়ে।

সবাই এসেছে। কিশোর, রবিন, জিনা টনি, মিস্টার ডিউক, শেরিফ, সব্বাই। টাইগারও রয়েছে ওদের সঙ্গে। কুকুরটা আগে এগিয়ে এল। লেজ নাড়তে নাড়তে চেটে দিল মুসার হাত। তাতে মন ভরল না, লাফিয়ে উঠে তার বুকে দুই পা তুলে দিয়ে গাল-নাক চাটতে শুরু করল।

'আরে থাম, থাম,' আলতো ধাক্কা দিয়ে টাইগারের মুখ সরিয়ে দিল মুসা।

টনি, মিস্টার ডিউক আর শেরিফ গিয়ে ঘিরে ধরল তিন অপরাধীকে। টনির হাতে রাইফেল, শেরিফের হাতে পিস্তল।

'বাঁধুন ওদের,' চেঁচিয়ে বলল মুসা। 'পালাতে দেবেন না। যত নষ্টের মূল এই তিন ব্যাটা।'

'জানি,' বলল কিশোর। 'ঘণ্টাখানেক আগে রিসোর্টে পৌঁচেছে জুলিয়ান। তোমার বিপদের কথা জানাল। শেরিফকে ফোন করলাম। তারপর ছুটে এলাম এখানে।'

'জুলিয়ান কই?'

'পাহাড়ের ওপাশে,' হাত তুলে দেখাল রবিন। 'ঘোড়াগুলো পাহারা দিচ্ছে।'

শেরিফ জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছিল, মুসা?'

'এটা রিসোর্টের এলাকা না?' পাল্টা প্রশ্ন করল মুসা।
'হ্যাঁ।
'তাহলে অনেকগুলো অপরাধের অভিযোগে এদের গ্রেপ্তার করতে পারেন আপনি। অনধিকার চর্চা থেকে খুনের চেষ্টা, সবই করেছে ওরা এখানে। চুরি চামারিও করেছে।'
সমস্ত প্রমাণ স্বচক্ষে দেখল শেরিফ। আর কোন আশা নেই দেখে অপরাধ স্বীকার করল ডাক্তার জিংম্যান। জানাল, জুলিয়ানকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যেই ওরা নানারকম অন্যায় করে সেই দোষ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে। জুলিয়ানের ওপর মিস্টার উইলসনকে খেপিয়ে তোলার জন্যে বাংলোতেও আগুন দিয়েছে রিকি, অবশ্যই বসের নির্দেশে।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'ওটাই আসল লস্ট ডাচম্যান মাইন, তাই না?'
'হ্যাঁ, ওখানেই কোথাও আছে খনিটা,' জবাব দিল টনি। 'ভালমত খুঁজলে বেরিয়ে পড়বে।'
'সোনা আছে?'
'থাকতে পারে। সে সম্ভাবনা আছে বলেই ঝুঁকি নিয়ে এত সব কুকর্ম করেছে ওরা,' জিংম্যান আর তার দুই সহকারীকে দেখাল টনি।
'এ-ব্যাপারে কিছু বলার আছে?' জিংম্যানকে জিজ্ঞেস করল শেরিফ।
'কি আর বলব,' হতাশ কণ্ঠে বলল ডাক্তার। 'পাইনি কিছু। তবে এখানেই আছে কোথাও। গত বছর দুটো নুড়ি পেয়েছিলাম, বেশ বড়। বুঝলাম, আছে কিছু এখানে। সে জন্যেই কেনার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। আরও আগেই যদি জানতাম, তাহলে কি আর উইলসন এত দূর থেকে এসে দখল করতে পারে? আমিই তো তার আগে কিনে নিতাম।'
'যদি সোনা না থাকে? শিওর তো না,' বলল জিনা।
'তাতে কি? জায়গাটার আসল দামই দিতে চেয়েছিলাম। ঠকা হত না আমার।'
'জুলিয়ান না কি যেন নাম, ছেলেটার পিছে লাগা হলো কেন? জিজ্ঞেস করল শেরিফ।
'আমার এই দুই গর্দভ করেছে সর্বনাশটা। ওদেরকে কতবার বলেছি, হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করতে, রিসোর্টের লোকজনের ওপর চোখ রাখতে, কানই দেয়নি। ওদেরকে এখানে খুঁড়তে দেখে ফেলেছিল ছেলেটা।'
'দেখলে কি হয়েছে?' প্রশ্ন করল কিশোর।
'গিয়ে বলে দিতে পারত আমরা এখানে সোনার খোঁজ করছি সে যাতে কিছু বলে কাউকে বিশ্বাস করাতে না পারে, সে চেষ্টা করা হয়েছে।'
'এখান থেকে তাড়িয়ে দিয়ে, না?' এক ঘুসিতে জিংম্যানের দাঁত কয়টা ফেলে দেয়ার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে দমন করলেন শিক্ষক।
'রিসোর্ট এলাকায় বাইরের লোককে খুঁড়তে দেখেছে। কই, কখনও বলেনি তো জুলিয়ান?' জিনা অবাক।

'ও ভেবেছিল ওরা প্রসপেক্টর,' জবাব দিল মুসা। 'পাহাড়ে অনেকেই সোনা আর মূল্যবান পাথরের জন্যে ও রকম খোঁড়াখুঁড়ি করে, বিশেষ করে এই অঞ্চলে। অনেককে দেখেছে জুলিয়ান। তাছাড়া, ও জানতই না যে এটা রিসোর্টের জায়গা। সাধারণ প্রসপেক্টর মনে করেছিল রিকি আর পেককেও। তবে বদমেজাজী প্রসপেক্টর, যারা মানুষ দেখলেই গুলি করে। সে জন্যে ওদের কাজ লুকিয়ে লুকিয়ে দেখত।'

'হুঁ। অপরাধ করে কেউ পার পায় না,' বিড়বিড় করল শেরিফ। 'এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে কি লাভ? চলো, সবাই। মিস্টার ডিউক, চলুন?'

'হ্যাঁ, চলুন। ভিকি ওদিকে অস্থির হয়ে থাকবে। দেরি দেখলে নিজেই না বেরিয়ে পড়ে...'

কিশোরের পাশাপাশি চলতে চলতে বলল রবিন, 'আরেকটা রহস্য কিন্তু বাকি রয়ে গেল। ক্যাচিনা ভূতের রহস্য।'

'অ্যাঁ!' ফিরে তাকাল কিশোর। 'ও, ওটারও সমাধান করে ফেলেছি।'

'এই,' রবিন বলল, 'আমার কথা শুনছ তো?'

'হ্যাঁ, তোমার কথার জবাবই তো দিলাম। র‍্যাঞ্চে চলো, দেখাব।'

আসামী নিয়ে চলে যেতে চাইল শেরিফ, কিশোর বাধা দিল, 'আর একটু, শেরিফ। বেশিক্ষণ আটকাব না। আরেকটা মজার জিনিস দেখে যান।'

সবাইকে নিয়ে হলরুমে এল সে, ক্যাচিনা পেইন্টিংগুলো যে ঘরে রয়েছে। চমৎকার একটা শো দেখাবে যেন, এমন ভঙ্গিতে ছোটখাটো একটা বক্তৃতা দিল। ভাল অভিনেতা সে, জমিয়ে ফেলল মুহূর্তে। আরাম করে চেয়ারে বসল সবাই। শো দেখবে।

ট্রাংকে যে দুটো কমাণ্ডার পাওয়া গেছে, তার একটা শেরিফের কাছ থেকে চেয়ে নিল কিশোর। যেটা মুসা চিনতে পারেনি।

'এই যে, এবার ভূত দেখতে পাবেন,' বলেই টিপে দিল কমাণ্ডারের একটা সুইচ, মেঘ ক্যাচিনাটাকে লক্ষ্য করে।

কয়েক মুহূর্ত কিছুই ঘটল না। তারপর শুরু হলো মৃদু গুঞ্জন। বাড়ল আওয়াজ। দুর্বোধ্য ইনডিয়ান গান আরম্ভ হলো। সড়সড় করে এক পাশে কয়েক ইঞ্চি সরে গেল ফ্রেমে বাঁধানো মেঘ, ক্যাচিনার ছবিটা। কালো একটা ফোকর বেরিয়ে পড়ল।

'আলো নিভিয়ে দাও,' চেঁচিয়ে বলল কিশোর। 'জলদি!'

উঠে গেল মুসা আর রবিন। পটাপট নিভে গেল সমস্ত আলো। ঘর অন্ধকার।

দেখা দিল বেগুনী আলো। মেঘের মত ভেসে ভেসে এগিয়ে এল ঘরের মাঝখানে। ঘুরে ঘুরে রূপ বদলাচ্ছে।

খানিকক্ষণ নাচ দেখিয়ে ধীরে ধীরে আবার দেয়ালের দিকে রওনা হলো ভূত, ছবিটার কাছে গিয়ে মিলিয়ে গেল।

'হয়েছে। আলো জেলে দাও এবার,' অনুরোধ করল কিশোর।

জ্বলে উঠল আলো। সবাই একসঙ্গে কথা বলে উঠল। নানারকম প্রশ্ন। ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছে। কালো ফোকরটা দেখা যাচ্ছে না আর, ছবিটা আগের

জায়গায় সরে এসে ঢেকে দিয়েছে।

'আস্তে, আস্তে,' হাত তুলল কিশোর। মুচকি হাসল। 'এক এক করে জিজ্ঞেস করো, নইলে কারটার জবাব দেব? রবিন, মুসা, টনি, তোমরা এসো তো। সাহায্য করো আমাকে। সব প্রশ্নের জবাব পাবে এখনই।'

স্ক্রু-ড্রাইভার, হাতুড়ি, ফাইল, প্লায়ার্স নিয়ে কাজে লাগল কিশোর। ছবিটাকে খুলে আনল দেয়াল থেকে। পেছনে দেয়ালে বেশ বড় একটা চৌকোণা খোপ। তাতে কয়েকটা যন্ত্র বসানো। একটা সকলেই চিনল। ছোট একটা টেপ রেকর্ডার, বিল্ট-ইন-মাইক্রোফোন। অন্যটা বেশ বড় আর ভারি।

জিংম্যানের দিকে ফিরল কিশোর, 'ডাক্তার সাহেব, এটা হলগ্রাম প্রোজেক্টর, তাই না?'

আস্তে মাথা ঝাঁকাল ডাক্তার।

'এগুলো এখানে বসিয়েছিলেন কেন? ভূতের গুজব ছড়িয়ে পড়লে টুরিস্ট আসবে না, রিসোর্ট বন্ধ হয়ে যাবে, মিস্টার উইলসন সব কিছু বেচে দিয়ে চলে যেতে বাধ্য হবেন। আর আপনি কিনে নেবেন সব, এই তো ইচ্ছেটা ছিল?'

আবার মাথা ঝাঁকাল জিংম্যান।

'আরে, এ তো দেখছি মহা-শয়তান লোক!' চোখমুখ কালো করে ফেলেছে শেরিফ। 'কাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করতাম এতদিন! যে হাসপাতালে ছিলে, সেখানেও শয়তানি করে এসেছ নাকি এ রকম? এখন তো আমার মনে হচ্ছে, চাকরি তুমি ছেড়ে আসনি, তোমাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ভেবো না, খোঁজ-খবর আমি ঠিকই নেব।' রাগে ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ছাড়ছে সে। 'তা সাহেব, ওই হলগ্রাম না কি গ্রাম ওটাও কি হাসপাতাল থেকেই চুরি করেছ?'

জবাব দিল না জিংম্যান। মুখ নিচু করে রইল।

'আমার মনে হয় হাসপাতাল থেকেই এনেছে,' আস্তে করে বলল কিশোর। 'ডাক্তার মানুষ তো। ডাক্তারদেরই জিনিস ওটা। খুব কাজে লাগে।'

'এবার উঠি,' শেরিফ বলল। 'মিস্টার ডিউক, টনি, তোমাদেরকেও একটু কষ্ট করে আমার সঙ্গে যেতে হবে, প্লীজ। তিনটে শয়তানকে একা আমি নিয়ে যেতে পারব না।'

'এক্ষুণি উঠি কি?' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ভিকি। 'বসুন বসুন, খাবার তৈরিই রেখেছি। বেড়ে দিতে যতক্ষণ লাগে।'

'মুসাও উঠল। বাড়াবাড়ি সহ্য হবে না আমার,' হাত নাড়ল সে, 'নিজেই নিতে পারব, সারাটা দিন উপোস। ওই দু-ব্যাটা যখন কাবাব বানাচ্ছিল না...আহ্!' সত্যি সত্যি তার জিভ থেকে গড়িয়ে পড়ল এক ফোঁটা পানি।

****

গুহামানব

প্রথম প্রকাশ: মার্চ, ১৯৮৯

'অমন করছেন কেন?' শোনা গেল উদ্বিগ্ন নারীকণ্ঠ।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনছে কিশোর পাশা।

বিকেলের ঘন কুয়াশা, প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ের যানবাহন চলাচলের শব্দকে যেন চেপে ধরে কমিয়ে দিয়েছে। পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ড আর রাস্তার ধারের বাড়িগুলোর মাঝখানে ভারি হয়ে ঝুলছে কুয়াশার চাদর। কিশোরের ওপরও পড়ছে যেন এর চাপ। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মাঝে বড় একা একা লাগছিল তার, মনে হচ্ছিল সমস্ত দুনিয়ায় এতক্ষণ সে-ই ছিল একমাত্র মানুষ।

এই সময় কথা বলে উঠল কে যেন, জুতোর আওয়াজ এগিয়ে এল ইয়ার্ডের দিকে।

দুটো ছায়া দেখা গেল, দু-জন মানুষ। ধূসর আলোয় চেহারা অস্পষ্ট। ঝুঁকে হাঁটছেন একজন প্রৌঢ়, পা টেনে টেনে, জুতোর তলা ঘষা লাগছে রাস্তায়। অন্যজন তরুণী, লম্বা চুল এসে পড়ে মুখের অনেকখানি ঢেকে দিয়েছে।

'এই যে, একটা বেঞ্চ!' স্যালভিজ অফিসের কাছে এসে সঙ্গীকে বসিয়ে দিতে দিতে বলল মেয়েটা, 'চুপ করে বসুন। তখুনি বলেছিলাম, আমি ড্রাইভ করি, আমাকে দিন। শুনলেন না।'

'কি হয়েছে?' এগিয়ে এল কিশোর।

কপালে হাত রেখে ঘোলা চোখে তাকালেন ভদ্রলোক। আমরা...' মেয়েটার হাত ধরলেন। 'জিজ্ঞেস করো...আমরা কোথায়...'

'হারবারভিউ লেন,' কিশোরকে বলল তরুণী। 'হারবারভিউ লেনটা খুঁজছি আমরা।'

'আরও সামনে যেতে হবে আপনাদের, সানসেট পেরিয়ে তারপর...' বলল কিশোর। 'উনি কি অসুস্থ নাকি? ডাক্তার ডাকতে হবে...'

'না!' বলে উঠলেন ভদ্রলোক। 'না না, লাগবে না! এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে।'

তাঁর দিকে ঝুঁকল কিশোর।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। ঘামছেন। 'খুব দুর্বল লাগছে!' কপাল টিপে ধরলেন। 'মাথাব্যথা করছে। আশ্চর্য! আগে কখনও করেনি!'

'ডাক্তার ডাকছি,' আবার বলল কিশোর।

জোর করে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। 'না না, লাগবে না, সেরে যাবে...'

দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে আবার বসে হেলান দিলেন অফিসের দেয়ালে। ভারি, খসখসে হয়ে উঠেছে শ্বাস-প্রশ্বাস। কুঁচকে গেল কপাল। 'উফ্ ব্যথা!'

তাঁর হাত ধরল কিশোর। ঠাণ্ডা, ঘামে ভেজা। চোখ স্থির, পাতা পড়ে না।

হঠাৎ যেন বড় বেশি নীরব হয়ে গেল ইয়ার্ডের ভেতরটা।

ভদ্রলোকের কপালে হাত রেখেই ফুঁপিয়ে উঠল মেয়েটা।

আবার পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। এগিয়ে এলেন মিসেস মারিয়া পাশা, কিশোরের মেরিচাচী।

'কি হয়েছে রে, কিশোর?'

'বোধহয়, মারা গেছেন ভদ্রলোক!'

প্রচুর আলো, সাইরেনের আওয়াজ, মানুষের হুড়াহুড়ি। কুয়াশার মধ্যে পুরো ব্যাপারটাই অবাস্তব লাগছে কিশোরের কাছে, এখানে নয়, যেন অন্য কোনখানে ঘটে চলেছে ঘটনাগুলো, দূর থেকে দেখছে সে। মেরিচাচীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে সোনালিচুল মেয়েটা।

ইয়ার্ডের গেটের কাছে লোকের ভিড়।

স্ট্রেচারে করে লাশটা অ্যাম্বুলেন্সে তোলার সময় নীরব হয়ে গেল সবাই।

তারপর আবার সাইরেনের তীক্ষ্ণ চিৎকার।

অ্যাম্বুলেন্সের পেছনে চলল ইয়ার্ডের গাড়ি। ড্রাইভ করছেন মেরিচাচী। তাঁর আর কিশোরের মাঝে বসেছে মেয়েটা।

পুরো ব্যাপারটা এখনও স্বপ্ন মনে হচ্ছে কিশোরের কাছে।

তবে হাসপাতালে পৌঁছে ঘোর কেটে গেল, আবার যেন ফিরে এল বাস্তবে। উজ্জ্বল আলোকিত করিডরে লোকজনের চলাফেরা। বড় একটা বসার ঘরের বাতাস সিগারেটের ধোঁয়ায় ভারি।

কিশোর, মেরিচাচী আর মেয়েটা বসল বসার ঘরে। পুরানো ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টানো ছাড়া কিছু করার নেই।

অনেক, অনেকক্ষণ পর এলেন একজন ডাক্তার।

'সরি,' মেয়েটার দিকে চেয়ে বললেন, 'কিছু করতে পারলাম না।...আপনার কিছু হয়?'

মাথা নাড়ল মেয়েটা।

'ময়না তদন্ত করতে হবে,' বললেন ডাক্তার। 'না করে উপায় নেই। এটা একটা অস্বাভাবিক কেস, পথে হঠাৎ মারা যাওয়া। সামনে তখন কোন ডাক্তারও ছিল না। যা বুঝলাম মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে মারা গেছে। কাটলে বোঝা যাবে। ওর আত্মীয়স্বজনকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

আবার মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'জানি না। রিসার্চ সেন্টারের ওরা জানতে পারে। ফোঁপাতে শুরু করল। একজন নার্স এসে সরিয়ে নিল তাকে।'

বসে আছে কিশোর আর মেরিচাচী।

অনেকক্ষণ পর ফিরে এল মেয়েটা। 'সেন্টারে ফোন করে এলাম। ওরা

আসছে।'

কৌতূহল হচ্ছে কিশোরের, কিসের 'সেন্টার'? কিন্তু জিজ্ঞেস করল না কিছু।

'চা খাওয়া দরকার,' মেরিচাচী বললেন। উঠে, মেয়েটার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন কফিশপে।

কিশোর গেল পেছনে।

নীরবে চা খাওয়া চলল কিছুক্ষণ।

'খুব ভাল মানুষ ছিলেন,' অবশেষে নিচু গলায় বলল মেয়েটা। চেয়ে আছে হাতের খসখসে চামড়ার দিকে। নখের মাথা ক্ষয়া, কোন কোনটা ভাঙা। জানাল, ভদ্রলোক ডাক্তার ছিলেন, জিনেটিসিস্ট। কাজ করতেন গ্যাসপার রিসার্চ সেন্টারে। প্রজনন বিদ্যায় এক্সপার্ট, নানারকম জন্তু-জানোয়ারের ওপর পরীক্ষা চালাতেন। মেয়েটাও ওখানেই কাজ করে।'

'সেন্টারটার নাম শুনেছি,' কিশোর বলল। 'উপকূলের ওদিকে, তাই না? স্যান ডিয়েগোর কাছে?'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। 'পাহাড়ের মাঝে ছোট একটা শহরে। মরুভূমির দিকে একটা পথ গেছে, ওই পথের কিনারে।'

'জানি। শহরটার নাম সাইট্রাস গ্রোভ।'

এই প্রথম হাসল মেয়েটা। 'তুমি জানো, কিন্তু অনেকেই জানে না। সেন্টারটার নাম শুনে থাকলেও শহরের নাম জানে না অনেকে।'

'কিশোর অনেক পড়াশোনা করে,' বললেন মেরিচাচী। 'যা পড়ে মনেও রাখে। আমিই তো ওই শহরটার নাম শুনিনি। প্রতিষ্ঠানটার নামও না। কি হয় ওখানে?'

'বৈজ্ঞানিক গবেষণা,' কিশোর বলল।

কৌতূহলী চোখে তার দিকে তাকাল মেয়েটা।

'প্লাস্টিকের জিনিস বানানোর ফ্যাক্টরি ছিল ডেনি গ্যাসপারের,' আবার বলল কিশোর। 'কোটি কোটি টাকা কামিয়েছিলেন ব্যবসা করে। ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছে ছিল তাঁর, কিন্তু কোনদিন হতে পারেননি। তাই, মৃত্যুর আগে উইল করে গেছেন, তাঁর টাকা যেন বিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যবহার করা হয়, মানুষের উন্নতির জন্যে।'

'এসবও জানে!' অবাক হয়ে মেরিচাচীর দিকে তাকাল মেয়েটা। হাসলেন মেরিচাচী। 'বললাম না, অনেক পড়াশোনা ওর।'

'ভাল, খুব ভাল। ও হ্যাঁ, এখনও নামই তো বলা হয়নি আমার। লিলি অ্যালজেডো।'

'শুনিনি।'

'শোনার কথাও না। আমি বিখ্যাত কেউ নই।'

'আমি মারিয়া পাশা। ও আমার ছেলে, কিশোর।'

হেসে সামান্য মাথা ঝাঁকাল লিলি।

'হ্যাঁ, গ্যাসপার রিসার্চ সেন্টারের কথা বলো। কিসের গবেষণা হয় ওখানে?' জিজ্ঞেস করলেন মেরিচাচী।

'জন্তু-জানোয়ারের,' জবাব দিল লিলি। 'সাদা ইঁদুর, শিম্পাঞ্জী, ঘোড়া এ

সব।'

'ঘোড়া? ল্যাবরেটরিতে ঘোড়া রাখে!'

'ল্যাবরেটরিতে না, আস্তাবলে। ওখানে রেখেই পরীক্ষা চালানো হয়। আইসোটোপ ব্যবহার করে কি কি সব পরীক্ষা করতেন ডাক্তার কুডিয়াস। ক্রোমসম নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। অনেক চালাক বানিয়ে ফেলা হয়েছে একটা ঘোড়াকে। অঙ্ক করতে পারে।'

হাঁ হয়ে গেলেন মেরিচাচী।

কিশোরও অবাক।

'না না, তেমন জটিল অঙ্ক না,' বলল লিলি। 'প্রথমে দুটো আপেল সামনে রেখে, পরে আরও তিনটা রাখলে, পাঁচবার মাটিতে পা ঠোকে ওটা। তার বেশি কিছু পারে না। ডাক্তার কুডিয়াস বলতেন, ঘোড়ার খুলির আকৃতি নাকি ভাল না, বুদ্ধিমান হওয়ার উপায় নেই। শিম্পাঞ্জীর খুলি অনেক ভাল, অনেক জটিল বিষয়ও তাই শিখে ফেলে।'

'জানোয়ারকে লেখাপড়া শিখিয়ে ওদেরকে দিয়ে কি করাতে চেয়েছিলেন ডাক্তার?'

'না, কিছু করাবেন না। আসলে, ঘোড়া কিংবা শিম্পাঞ্জীকে কথা বলানোর চেষ্টাও তিনি করছেন না। তিনি চাইছেন মানুষের উন্নতি করতে। কিন্তু সেটা করার জন্যে জানোয়ারের ওপরই তো আগে গবেষণা চালাতে হবে, তাই না? মানুষ কি আর হাসপাতালের গিনিপিগ হতে রাজি হবে?'

কেঁপে উঠলেন মেরিচাচী।

মুখ নামাল লিলি। 'আপনারা অনেক করেছেন। আমি এখন সামলে নিতে পারব। ডাক্তার রুডলফ আর মিসেস গ্যারেট এসে পড়বেন···'

'ওঁরা না আসা পর্যন্ত আমরা থাকছি,' শান্তকণ্ঠে বললেন মেরিচাচী।

লম্বা, কঙ্কালসার, ধূসর চুলওয়ালা একজন মানুষ ঢুকলেন কফিশপে। ডাক্তার রুডলফ, পরিচয় করিয়ে দিল লিলি। তাঁর সঙ্গে এসেছে একজন মোটাসোটা মহিলা, বয়েস ষাটের কাছে, চোখের পাতায় নকল পাপড়ি লাগিয়েছে, মাথায় আগুনরঙা নকল চুল। মিসেস গ্যারেট। লিলির হাত ধরে নিয়ে গেল মহিলা। ডাক্তার রুডলফ গেলেন ডাক্তার কুডিয়াসকে পরীক্ষা করছেন যে ডাক্তার তাঁর খোঁজে।

আনমনে মাথা নাড়লেন মেরিচাচী। 'আজব মানুষ! জন্তু-জানোয়ারের সিসটেমে গোলমাল করে দিয়ে···' আবার কেঁপে উঠলেন তিনি। 'কিশোর, ওই কঙ্কাল ডাক্তারটা কি কাজ করে বলে তোর মনে হয়?'

'কোন ধরনের গবেষণা।'

ভ্রূকুটি করলেন মেরিচাচী। 'গবেষণা না ছাই! বদ্ধ উন্মাদ ওরা! শেষে না ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বানিয়ে বসে! ভাল হবে না। ন্যাচারাল জিনিসকে বদলে দিতে গিয়ে ভাল করবে না, দেখিস, বিপদ ডেকে আনবে; সারা দুনিয়ার জন্যে!'

দুই

ডাক্তার ক্লডিয়াসের মৃত্যু সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত হলো ফলাও করে। স্ট্রোক হয়ে মারা গেছেন বিজ্ঞানী। তাঁর জীবনের কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণীও ছাপা হলো। সব শেষে বলা হলো, জাহাজে করে তাঁর লাশ দেশে নিয়ে যাওয়া হবে কবর দেয়ার জন্যে।

হপ্তাখানেক বাদেই এক যুগান্তকারী আবিষ্কার করে বসল গ্যাসপার সেন্টার। ঝাঁকে ঝাঁকে রিপোর্টার ছুটে গেল সাইট্রাস গ্রোভ শহরে। সেন্টারের একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ, ডাক্তার জর্জ হ্যারিসন নাকি ওই শহরের সীমান্তে পাহাড়ের গুহায় এক প্রাগৈতিহাসিক জীবের কঙ্কাল আবিষ্কার করেছেন।

'দারুণ তো!' খবর পড়ে বলে উঠল কিশোর।

পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহালক্কড়ের জঞ্জালের নিচে চাপা পড়েছে একটা পুরানো মোবাইল হোম ট্রেলার। তাতে তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টার।

মে মাসের এই বিকেলে হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসেছে তিন গোয়েন্দা।

'কি দারুণ?' জিজ্ঞেস করল সহকারী গোয়েন্দা মুসা আমান।

'সাইট্রাস গ্রোভের গুহামানব,' খবরের কাগজটা নামিয়ে রেখে বলল কিশোর। 'আসলে মানুষ কিনা, বোঝা যায়নি এখনও। বয়েস কত, জানা যায়নি, তবে অনুমান করা হচ্ছে অনেক পুরানো। ডাক্তার হ্যারিসনের মত ওটা হোমিনিড। মানুষ, কিংবা মানুষের মত জীব। মানুষের আদিপুরুষ হবে হয়তো।'

বুকশেলফের ওপরে রাখা ছোট টেলিভিশন সেটটা অন করল মুসা।

ছবি ফুটতেই পর্দা জুড়ে দেখা গেল একটা হাসিখুশি মুখ। ওর নাম এলান ফিউজ। বলল, 'আজ টেলিভিশনে আমাদের অতিথি হয়ে এসেছেন ডাক্তার জর্জ হ্যারিসন। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় সবচেয়ে পুরানো গুহামানবের কঙ্কাল খুঁজে পেয়েছেন তিনি।'

সরে গেল ক্যামেরার চোখ। মোটা একজন মানুষকে দেখা গেল, গোলগাল চেহারা, ছোট করে ছাঁটা চুল। পাশে বসে আছে ভুঁড়িওয়ালা, বেঁটে আরেকজন। গায়ে কাউবয় শার্ট, কোমরে চওড়া বেল্ট, তাতে কারুকাজ করা চকচকে বাকলস্। পায়ে হাইহীল বুট।

'ডাক্তার হ্যারিসনের সঙ্গে এসেছেন মিস্টার কিংসলে ম্যাকস্বার,' আবার বলল এলান ফিউজ। 'ব্যবসা করেন। সাইট্রাস গ্রোভে তাঁর জমিতেই কঙ্কালটা পাওয়া গেছে।'

'রাইট!' রুক্ষকণ্ঠে বলে উঠলেন বিজ্ঞানী। 'ব্যবসায়ীই। লোকের গলা কেটে টাকা নেয়।'

অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি বলল এলান ফিউজ, 'ডাক্তার হ্যারিসন এখন আমাদেরকে ফসিলটার কথা কিছু বলবেন।...কোথায় পেয়েছেন, স্যার? কিভাবে?'

চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন প্রত্নতত্ত্ববিদ। 'নেহাত ভাগ্যের জোরেই পেয়েছি

বলা যায়। হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। বৃষ্টি সবে থেমেছে তখন। পথের ধারে একফালি জমি, তার পরে পাহাড়। বৃষ্টিতে ঢালের মাটির আস্তর ধুয়ে উঠে গেছে, একটা গর্তের ভেতর থেকে সাদামত কি যেন বেরিয়ে আছে দেখলাম। অন্ধকার হয়ে এসেছে তখন···'

'তোমার আগেই আমি দেখেছি,' বাধা দিলে বলল ম্যাকস্বার। 'আমি দেখার পর···'

'স্পষ্ট দেখা যায় না,' ম্যাকস্বারের কথা না শোনার ভান করে আবার আগের কথার খেই ধরলেন ডাক্তার, 'আলো দরকার। টর্চ আনতে গেলাম সেন্টারে।'

'এসে দেখলে শটগান হাতে দাঁড়িয়ে আছি আমি,' বলল ম্যাকস্বার। 'ভাগ্য ভাল, বেশি গোলমাল করোনি, নইলে···'

লম্বা করে শ্বাস টানলেন হ্যারিসন। ধৈর্য রাখতে কষ্ট হচ্ছে। 'ওর জায়গা, তাই ওকে সঙ্গে নিয়েই গেলাম। মুখের ঠিক ভেতরেই পড়ে আছে ওটা, কাদায় দেবে আছে বেশির ভাগ। খুলি দেখেই বুঝলাম···'

'পুরানো!' চেঁচিয়ে উঠল ম্যাকস্বার। 'অনেক পুরানো! হাজার হাজার বছর আগের!'

'খুলিটার কাছেই ছিল অন্যান্য হাড়, প্রায় পুরো কঙ্কালটাই ছিল,' বলে চললেন হ্যারিসন। 'ভালমত পরীক্ষা করে দেখতে পারিনি এখনও। তবে, আফ্রিকায় যেসব পুরানো ফসিল পাওয়া গেছে, সেগুলোর সাথে অনেক মিল আছে।'

'কঙ্কালটা কি মানুষের?' জিজ্ঞেস করল ফিউজ।

কপালে ভাঁজ পড়ল বিজ্ঞানীর। 'আধুনিক মানুষের সঙ্গে অনেক মিল আছে বটে। তবে, পুরোপুরি মানুষ বোধহয় বলা যায় না। আমেরিকায় এ যাবৎ যত হোমিনিড পাওয়া গেছে তার মধ্যে এটা সবচেয়ে পুরানো।'

সামনে ঝুঁকলেন হ্যারিসন। 'বলা হয়, আজকের আমেরিকান ইনডিয়ানরা আদিম মংগোলিয়ান যাযাবরদের বংশধর। বরফ যুগের শেষ দিকে সাইবেরিয়া আর আলাসকা থেকে এসেছিল ওরা। আট থেকে দশ হাজার বছর আগে। বেশির ভাগ সাগরের পানিই জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল সে-সময়, সমুদ্র সমতল ছিল অনেক নিচে। সাইবেরিয়া আর আলাসকার মাঝে দূরত্ব এত কমে গিয়েছিল, পা বাড়ালেই এক দেশের মানুষ আরেক দেশে ঢুকে পড়তে পারত। আর তা-ই করেছিল এশিয়ান যাযাবরেরা। শিকার করতে করতে চলে এসেছিল নতুন দেশে। শিকার পাওয়া যেত বেশি, তাই আর ফিরে যায়নি ওরা, ছড়িয়ে পড়ে বিশাল অঞ্চলে। কেউ কেউ চলে যায় একেবারে দক্ষিণ আমেরিকার শেষ মাথায়।

'এসবই অবশ্য বিজ্ঞানীদের অনুমান। কেউ কেউ অন্য কথাও বলেন। বরফ যুগের আগে থেকেই নাকি আমেরিকায় মানুষ ছিল। কেউ তো আরও বাড়িয়ে বলে আনন্দ পান। বলেন মানুষের আদি জন্ম এই আমেরিকাতেই, পরে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে গেছে। দেশ ত্যাগ করে চলে গেছে ইউরোপ, এশিয়ায়।'

'সাইট্রাস গ্রোভে পাওয়া ফসিলটা কি প্রমাণ করে?' জিজ্ঞেস করল ফিউজ।

'এখুনি কিছু বলা যাবে না। কত পুরানো, তা-ই জানা হয়নি। আমাদের এই

কঙ্কালটা···'

'এখানে আমাদের কথাটা আসছে কিভাবে? ওটা তো শুধু আমার,' গোঁয়ারের মত বলে উঠল ম্যাকস্বার। 'আমার জায়গায় পাওয়া গেছে। সন্দেহেরও কিছু নেই, ওটা মানুষেরই কঙ্কাল। লাখ লাখ বছর ধরে পড়ে আছে,' এই একটু আগে যে হাজার হাজার বলেছে, বেমালুম ভুলে গেছে।

'পাগল নাকি!' আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না হ্যারিসন, ধমকে উঠলেন।

'পাগলের কি আছে?' গলা আরও চড়াল ম্যাকস্বার। 'বিজ্ঞানীদের সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু আমি শিওর, এই আমেরিকাতেই প্রথম মানুষের জন্ম হয়েছিল। গুহায় যে পড়ে আছে, হয়তো ওটাই প্রথম মানুষ, ওরই বংশধর আমরা। গার্ডেন অভ ইডেন হয়তো সাইট্রাস গ্রোভের ধারেকাছেই কোথাও মাটির তলায় চাপা পড়ে আছে। ব্যাকারসফিল্ড, কিংবা ফ্রেজনোতে···'

'অ্যাই, তুমি থামবে?' হাত নাড়লেন হ্যারিসন।

'কেন, ঠিক কথাই তো বলছি···'

'ঠিক!' চেয়ার নিয়ে ঘুরে ম্যাকস্বারের মুখোমুখি হলেন ডাক্তার। 'কি করে জানলে, ঠিক? স্টাডিই তো করলাম না···'

'করার দরকারও নেই। আর করতে দিচ্ছে কে তোমাকে? যেখানে পাওয়া গেছে ওটা, সেখানেই থাকবে, যেভাবে পাওয়া গেছে, সেভাবে। মাইক্রোস্কোপের তলায় রাখা তো দূরের কথা, ছুঁতেও দেব না তোমাকে। তবে হ্যাঁ, লোকে দেখতে চাইলে অবশ্যই দেখাব।'

'সর্বনাশ! ফসিল নিয়েও ব্যবসা করবে নাকি? শো দেখাবে? আমিও সেটি হতে দিচ্ছি না। কত পুরানো হাড় ওগুলো···'

'অনেক অনেক পুরানো, সেটা বুঝতে আর স্টাডি করার দরকার হয় না। দেখেই বলে দেয়া যায়। আমার ওই গুহায়ই জন্মেছিল প্রথম মানুষ, সভ্যতার সূচনা হয়েছিল। আমাদের সবারই আদিপিতা ওই মানুষটি। তাকে দেখার অধিকার সব মানুষেরই আছে।'

'পয়সা লোটার মওকা পেয়েছ তো, এছাড়া কি বলবে, চামার কোথাকার!' রাগে ফেটে পড়লেন হ্যারিসন। 'কি বলছ বুঝতে পারছ?'

'পারছি।' সরাসরি ক্যামেরার চোখের দিকে তাকাল ম্যাকস্বার। 'ওটা পৃথিবীর প্রথম মানুষ, বাবা আদমের হাড়, নিশ্চয় আপনারাও বুঝতে পারছেন। আপনাদের সবারই দেখার অধিকার আছে। আমার গুহায় সবাই আমন্ত্রিত। তবে দয়া করে একটু ধৈর্য ধরুন, একটু সময় দিন আমাকে, জায়গাটাকে ঠিকঠাক করে রেডি করে ফেলি। তারপর গুহার মুখ খুলে দেব সবার জন্যে। ক্যালিফোর্নিয়ার সবচেয়ে দর্শনীয় জায়গা হবে···'

'চামারের বাচ্চা চামার!' চেঁচিয়ে উঠে দু-হাত বাড়িয়ে ম্যাকস্বারের ওপর ঝাঁপ দিলেন হ্যারিসন।

দ্রুত সরে গেল ক্যামেরা। এরপর কি ঘটল, টেলিভিশনের দর্শকেরা আর দেখতে পেল না। তবে নানারকম শব্দ ভেসে এল স্পীকারে। কি ঘটছে স্টুডিওতে,

বুঝতে অসুবিধে হলো না কারও।

পর্দায় দেখা দিল এলান ফিউজ। 'প্রিয় দর্শকবৃন্দ, চমৎকার এই অনুষ্ঠানটি এখানেই শেষ করছি। আরও অনেক কথা জানার ছিল ডাক্তার হ্যারিসনের কাছে, সময়ের অভাবে তা সম্ভব হলো না। এখন দেখবেন ফার্নিচারের রঙের ওপর একটি বিশেষ প্রতিবেদন...'

সুইচ অফ করে দিল মুসা। 'খাইছে! কাণ্ডটা কি করল? কিশোর, কে জিতেছে বলে মনে হয়? হ্যারিসন নাকি ম্যাকম্বার?

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কিশোর বলল, 'ম্যাকম্বার খুব বাজে লোক। হাড়গুলো সরাতে না দিলে...'

'রাখতে পারবে?' বাধা দিয়ে বলল রবিন।

'কেন পারবে না? গুহাটা যদি তার সম্পত্তি হয়? স্পষ্ট বোঝা গেল, দু-জনের মাঝে আগে থেকেই খারাপ সম্পর্ক ছিল। নইলে হ্যারিসনকে দেখে শটগান আনতে যাবে কেন ম্যাকম্বার? হ্যারিসনও বদমেজাজী। শেষ পর্যন্ত দু-জনের মাঝে কি যে হয় বলা যায় না।'

'রক্তারক্তি কাণ্ড,' মুসা বলল।

'হলে অবাক হব না। ম্যাকম্বার চাইবে কঙ্কাল দেখিয়ে পয়সা কামাতে, আর হ্যারিসন চাইবে তুলে নিয়ে গিয়ে ল্যাবরেটরিতে ঢোকাতে। একজন লোভী, আরেকজন বদমেজাজী। খুনখারাপিও হয়ে যেতে পারে।'

তিন

সেদিনের ওই বিচিত্র সাক্ষাৎকারের পর টেলিভিশনে আর একবারও এলেন না ডাক্তার হ্যারিসন। তবে কিংসলে ম্যাকম্বারকে কয়েকবারই দেখা গেল। শো-এর ব্যাপারে কথা বলল। সংবাদপত্র রেডিও, টেলিভিশন, যেখান থেকে যে গেল, সবাইকেই সাক্ষাৎকার দিল সে। বসন্ত গিয়ে গ্রীষ্ম এল। জুলাইয়ের মাঝামাঝি নাগাদ দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার প্রায় প্রতিটি মানুষই জেনে গেল ম্যাকম্বারের গুহামানবের কথা। এরপর শুরু হলো 'শো'-এর বিজ্ঞাপন। জানানো হলো, আগস্টের শুরুতে সাধারণ দর্শকদের জন্যে খুলে দেয়া হবে গুহামুখ।

জুলাইয়ের শেষ দিকে আরও অনেকের মত তিন গোয়েন্দাও সাইট্রাস গ্রোভে যাওয়ার জন্যে তৈরি হলো।

হ্যানসনকে খবর দিল কিশোর।

এক সুন্দর সকালে ইয়ার্ডের গেটে এসে দাঁড়াল রাজকীয় রোলস রয়েস। চড়ে বসল তিন গোয়েন্দা।

একটানা দুই ঘণ্টা দক্ষিণে চলল গাড়ি। তারপর পুবে মোড় নিয়ে উঠে এল পাহাড়ী পথে। পথের ধারে কোথাও কমলা বাগান, কোথাও ঝোপঝাড়। খোলা মাঠ আর তৃণভূমি আছে, তাতে চরছে গরু।

আরও আধ ঘণ্টা পর সেন্টারডেল নামে ছোট একটা শহরে ঢুকল গাড়ি। শহর

পেরিয়ে ওপাশে আবার পথ। দুই ধারে ঝোপঝাড়, জঙ্গল, মাঠ—মাইলের পর মাইল একই দৃশ্য। অবশেষে একটা সাইনবোর্ড দেখা গেল। তাতে ইংরেজিতে লেখা:

সাইট্রাস গ্রোভে স্বাগতম

খুবই ছোট শহর, মাত্র কয়েকটা ঘর। একটা সুপারমার্কেট, দুটো পেট্রোল স্টেশন, একটা গাড়ির দোকান, আর একটা ছোট মোটেল আছে নাম—রেস্ট-আ-বিট। শহরের সুইমিং পুলের পাশ কাটাল গাড়ি। পুরানো, ধুলোয় ঢাকা একটা রেল স্টেশনের ধার দিয়ে এসে পড়ল পুরানো শহরের মাঝখানে। পথের একধারে একটা পার্ক, আরেক ধারে কিছু দোকানপাট। একটা ব্যাংক, হার্ডওয়্যারের দোকান, ওষুধের দোকান, আর পাবলিক লাইব্রেরি দেখা গেল। শহরটা ছোট বটে, কিন্তু লোকে লোকারণ্য। মোটেলের কপালে নিওন সাইনে 'নো ভ্যাকান্সি' লেখা। সাইট্রাস গ্রোভ কাফের সামনে লম্বা লাইন, খাবার কেনার জন্যে অধীর হয়ে আছে লোকে।

'এ সবই ওই গুহামানবের কল্যাণে,' বলল রবিন। 'কি ভিড় দেখেছ?'

হ্যামবার্গার শপের দিকে চেয়ে হাসল কিশোর। 'মনে হচ্ছে এই খেয়েই থাকতে হবে।' থামতে বলল হ্যানসনকে। দিন সাতেক পরে এসে আবার এই জায়গা থেকেই তুলে নিতে বলল।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল হ্যানসন।

একজন দোকানদারকে জিজ্ঞেস করে, ম্যাকম্বারের বাড়িটা কোথায় জেনে নিল কিশোর।

সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল বাড়িটা। সামনে গাড়িবারান্দা, ছোট লন। এককালে সুন্দর থাকলেও এখন তেমন কিছু নেই। দেয়ালে রঙ করা হয়নি অনেকদিন, জানালার পর্দা পুরানো। কিছু কিছু পাল্লার শার্সি উধাও। অযত্নে বেড়ে উঠেছে বাগানের ঘাস।

'আমি তো ভেবেছিলাম বড়লোক,' রবিন বলল। 'মনে করেছি, হার্ডওয়্যার আর গাড়ির দোকানটা ওরই।'

'হলেই বা কি?' কিশোর বলল। 'যা শহর, লোক আছে কয়জন, আর বেচাকেনাই বা কি হবে?'

গাড়িবারান্দায় একটা নোটিশ, তাতে লেখা রয়েছেঃ যারা রাতে থাকার জায়গা চায় তারা যেন বাড়ির পাশ দিয়ে ঘুরে এগোয়।

নির্দেশ পালন করল ছেলেরা। দেখল, একটা পথের ধার থেকে শুরু হয়েছে মাঠ, তার ওপাশে বন। মূল বাড়িটার কাছে একটা গোলাঘর, বয়েসের ভারে ধুঁকছে, বিবর্ণ। মাঠের ধারে পাহাড়। পাহাড়ের কোলে চমৎকার একটা নতুন বিল্ডিং। ছিমছাম, সুন্দর, আধুনিক। একটা জানালাও নেই। ডাবল ডোর দরজার ওপরে সাইনবোর্ড:

গুহামানবের গুহায় স্বাগতম।

'বাহ্!' মুসা বলল। 'মাল কামানোর বেশ ভাল ব্যবস্থা হয়েছে।'

'কিছু চাই?' পেছনে নরম গলায় কথা শোনা গেল। দেখেই চিনল কিশোর। 'আরে, লিলি অ্যালজেডো, আপনি।'

'ও, কিশোর। তোমরাও দেখতে এসেছ।...তা তোমার মা কেমন আছেন?'

হাসল কিশোর। 'ভাল।'

কথা শুনেই বোধহয়, বাড়ির পেছনের দরজা খুলে বেরোল একজন মোটা খাটো মহিলা, পাতলা চুল। 'কে রে, লিলি?...কি চায়?'

'জেলডা আন্টি, ও কিশোর পাশা,' পরিচয় করিয়ে দিল লিলি। 'ওর কথাই বলেছিলাম। ওরা সাহায্য না করলে খুব বিপদ হত সেদিন রকি বীচে।'

মুসা আর রবিনের পরিচয় দিল কিশোর।

'গুহামানব দেখতে এসেছে,' লিলি বলল, 'আন্টি, ওদের থাকার ব্যবস্থা করা যায় না?'

মহিলার পেছনে উঁকি দিল আরেকজন। কিংসলে ম্যাকস্বার।

আবার পরিচয় করানোর পালা।

'তোমাদের কথা লিলির কাছে শুনেছি,' বলল ম্যাকস্বার। 'জায়গা দিতে পারলে খুশিই হব। কিন্তু বাড়িতে তো হবে না। অবশ্য গোলাঘরের মাচায় শুতে পারো। ঘরের পেছনে অনেক জায়গা, ব্যবহার করতে পারবে। একটা পানির কলও আছে ওখানে।' কুঁচকে এল লোকটার ধূর্ত চোখের পাতা। 'ভাড়াও খুব কম নেব তোমাদের কাছ থেকে। একরাতের জন্যে, এই দশ ডলার। কি বলো, অ্যাঁ? তিনজনের জন্যে।'

'কি বলছ, আংকেল!' চেঁচিয়ে উঠল লিলি।

'তুমি চুপ করো মেয়ে,' বলেই স্ত্রীর দিকে তাকাল ম্যাকস্বার। চোখ সরিয়ে নিল জেলডা।

'দশ ডলারে এখানে কোথাও থাকার জায়গা পাবে না,' আবার বলল ম্যাকস্বার।

'বনের মধ্যে গিয়ে থাকলেই তো পারি?' কিশোরের দিকে চেয়ে বলল রবিন। 'পয়সাও লাগবে না...'

'না না, সেটা উচিত হবে না,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল ম্যাকস্বার। 'জায়গাটা নিরাপদ না। যখন তখন আগুন লাগে। শুকনো মৌসুম। দাবানলের ভয় আছে।'

মানিব্যাগ থেকে দশ ডলারের একটা নোট বের করে বাড়িয়ে ধরল কিশোর। 'নিন। আজ রাতের ভাড়া।'

'গুড,' নোটটা নিয়ে পকেটে ভরল ম্যাকস্বার। কণ্ঠে খুশির আমেজ। 'লিলি, যাও তো, পানির কলটা দেখিয়ে দিয়ে এসো।'

'দেখো ছেলেরা, সাবধান থাকবে,' হুঁশিয়ার করল মিসেস ম্যাকস্বার। 'ঘরে আগুনটাগুন লাগিয়ে দিয়ো না আবার।'

'সিগারেট খাও নাকি?' জিজ্ঞেস করল ম্যাকস্বার।

'না,' মুখ গোমড়া করে জবাব দিল মুসা। 'এই কিশোর, এদের বিরক্ত করছ কেন? বনে না থাকি, পার্কে গিয়েও তো...'

'পার্কে থাকা নিষেধ,' বাধা দিয়ে বলল ম্যাকস্বার। মুচকি হেসে ঘরে ঢুকে গেল

সে।

ছেলেদের নিয়ে চলল লিলি। রাগে, লজ্জায় লাল হয়ে গেছে গাল। 'খুব খারাপ লাগছে আমার। দেখো, কালও যদি থাকো, টাকা দেবে না। আমার কাছে কিছু আছে। চাইতে এলে ভাড়াটা আমিই দিয়ে দেব আংকেলকে।'

'আরে, রাখুন তো। ওসব ভেবে মন খারাপ করবেন না,' কিশোর বলল। 'টাকাটা কোন ব্যাপার না।'

'কিন্তু আংকেল যখন এরকম ছ্যাঁচড়ামি করে না, আমার খুব খারাপ লাগে,' তিক্ত কণ্ঠে বলল লিলি। 'কিছু বলতেও পারি না···আমাকে মানুষ করেছে ওরাই। কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে আমার বাবা-মা। আমার তখন আট বছর বয়েস।'

বিষণ্ণ কণ্ঠে কিশোর বলল, 'আপনার আর আমার অনেক মিল। আমার বাবা-মাও কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে।'

'তাই নাকি? তাহলে মেরিআন্টি···'

'আমার চাচী। নিঃসন্তান। মায়ের আদর দিয়ে মানুষ করছে আমাকে। অপরিচিত কারও কাছে আমাকে ছেলে বলেই পরিচয় দেয়।'

'ও!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিলি। 'তাহলে তো মা-ই!'

ছেলেরা ভাবছে, ম্যাকব্বার দম্পতি কি যত্ন নেয় না এতিম মেয়েটার? তার শীর্ণ হাত-পা, রুক্ষ চুল, রক্তশূন্য চেহারা···'

গোলাঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল লিলি। পেছনে তিন গোয়েন্দা।

ধুলোয় মলিন ঘরের মাঝে ঝকঝকে নতুন একটা পিকআপ ট্রাক আর একটা ফোরডোর সিডান কার, বড় বেমানান। ঘরের কোণায় কোণায় জমে আছে জঞ্জাল, পুরানো হলদেটে খবরের কাগজের স্তূপ, বাক্স। ওয়ার্কবেঞ্চের ওপরে আর আশেপাশে পড়ে রয়েছে মরচে ধরা যন্ত্রপাতি—করাত, হাতুড়ি, বাটাল, এসব।

পেছনের দেয়ালের কাছ থেকে মাচায় উঠে গেছে কাঠের সিঁড়ি।

চালার নিচের অন্ধকার, গুমোট মাচায় উঠে এল ছেলেরা। একধারে জানালা একটা আছে বটে, তবে ধুলো আর মাকড়সার জালে এমনই মাখামাখি, আলো আসার পথও নেই। ধাক্কা দিয়ে পাল্লা খুলল কিশোর। হুড়মুড় করে এসে ঢুকল বাইরের তাজা, ঠাণ্ডা বাতাস।

'তোয়ালে-টোয়ালে কিছু লাগবে?' নিচ থেকে জিজ্ঞেস করল লিলি।

'না,' মুসা জবাব দিল। 'দরকারী জিনিস সব নিয়ে এসেছি আমরা।'

মইয়ের গোড়ায় দাঁড়িয়েই আছে লিলি। যেতে ইচ্ছে করছে না যেন। আবার বলল, 'একটু পরেই সেন্টারে যাব আমি। জানোয়ারগুলো দেখতে চাইলে তোমরাও আসতে পারো।'

ওপর থেকে মাচার ফোকর দিয়ে মুখ বের করে বলল কিশোর, 'আর্কিওলজিস্ট ভদ্রলোককে চেনেন নিশ্চয়। গুহামানবকে যিনি পেয়েছেন?'

'ডাক্তার হ্যারিসন? চিনি। দেখা করতে চাও? বাড়ি থাকলে ওনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি।'

'তাহলে তো খুব ভাল হয়। কঙ্কালটার বয়েস কত জানা গেছে? কি করে গুহায়

এল?'
মুখ বাঁকাল লিলি। 'সবাই ওটার কথা জানার জন্যে পাগল। বিচ্ছিরি দেখতে। নিশ্চয় গরিলার মত ছিল চেহারা।...খবরদার! গুহার ধারেকাছে যেয়ো না। শটগান নিয়ে পাহারা দেয় আংকেল। রান্নাঘরের দরজার পেছনে লুকিয়ে বসে থাকো। গুলি খেয়ে মরবে শেষে।'
'তাই নাকি?'
'হ্যাঁ। ভীষণ বদরাগী লোক।...ওই গুহামানব নিয়ে কিছু একটা ঘটবে এখানে, বলে দিলাম, দেখো। খুব খারাপ কিছু!'

চার

ম্যাকস্বারের বাড়ি থেকে আধ মাইল দূরে একটা পাহাড়ের ওপর ছোটবড় কিছু বাড়ির সমষ্টি গ্যাসপার রিসার্ট সেন্টার। ঘন সবুজ লন। কাঁটাতারের বেড়া নেই, এ ধরনের সেন্টার সাধারণত যেমন থাকে। তবে পাথরের গেটপোস্ট আছে, তাতে শক্ত পাল্লা। লিলির পেছন পেছন গাড়িপথ ধরে বাড়ির গেটে এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।
গেট খুলে ভেতরে ঢুকল ওরা। সদর দরজায় কোন পাহারা নেই। পাল্লায় টোকা দেয়ারও প্রয়োজন মনে করল না লিলি, ঠেলা দিয়ে খুলে ফেলল।
কোন এনট্রি হল নেই। বড় একটা লিভিং রুমে সরাসরি এসে ঢুকল ওরা। ঘরেই আছেন জর্জ হ্যারিসন। পায়চারি করছিলেন, ওদের দেখে থামলেন।
তিন গোয়েন্দার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল লিলি।
ভ্রূকুটি করলেন ডাক্তার। 'ও, তোমরাও ভণ্ডামী দেখতে এসেছ?'
'গুহামানবকে দেখতে স্যার,' জবাব দিল মুসা।
'কি যে কাণ্ড! পাগল হয়ে গেছে লোক!' আবার পায়চারি শুরু করলেন হ্যারিসন। 'দলে দলে আসবে। মাড়িয়ে শেষ করে দিয়ে যাবে সবকিছু। পাহাড়ের নিচে নিশ্চয় আরও ফসিল আছে। আমার বন্দুক থাকলে...'
'সব্বাইকে গুলি করে মারতে,' বলল শান্ত একটা কণ্ঠ।
ঘুরে তাকাল ছেলেরা।
লম্বা, বিষণ্ণ চেহারার একজন লোক ঘরে ঢুকেছেন। কঙ্কালসার দেহ। কিশোর চিনল, রকি বীচ হাসপাতালে দেখেছে। সেদিন পরেছিলেন মলিন একটা ধূসর স্যুট। আজ পরনে রঙচটা খাকি হাফপ্যান্ট আর পোলো শার্ট। ফায়ারপ্লেসের ধারে একটা আর্ম-চেয়ারে বসে তাকিয়ে রইলেন নিজের হাড়সর্বস্ব হাঁটুর দিকে।
'ডাক্তার রুডলফ,' লিলি বলল, 'কিশোর পাশার সঙ্গে নিশ্চয় পরিচয় আছে?'
অবাক হলেন ডাক্তার। 'আছে কি?'
'রকি বীচ হাসপাতালে যেদিন মারা গেলেন ডাক্তার ক্লডিয়াস,' লিলি মনে করিয়ে দিল, 'আমাকে সাহায্য করেছিল ও। আপনি যখন ঢুকলেন তখনও ছিল। মনে নেই?'
'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে,' হাসলেন ডাক্তার। হাসলে তাঁর বয়েস কম মনে

হয়। 'কেমন আছ?'

'ভাল,' মাথা কাত করল কিশোর।

'ডাক্তার রুডলফও আর্কিওলজিস্ট,' লিলি জানাল। 'একটা বই লিখছেন।'

আবার হাসলেন ডাক্তার।

'ক্রুঅাল ম্যানও তো আপনারই লেখা, তাই না?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ওপরে উঠে গেল রুডলফের ভুরু। 'তুমি ওটা পড়েছ।'

'হ্যাঁ। লাইব্রেরিতে পেয়েছিলাম। দারুণ লেখা, তবে মন খারাপ হয়ে যায়। এভাবে সব সময়ই যদি মানুষকে মানুষের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে হয়...'

'খুব খারাপ, তাই না?' কিশোরের বাক্যটা শেষ করলেন রুডলফ। 'জন্ম থেকেই আমরা নিষ্ঠুর, পৈশাচিকতা ভালবাসি। সেটাই আমাদের, মানে মানুষের বৈশিষ্ট্য। বড় মগজ থাকায় আর সোজা হয়ে হাঁটতে পারি বলে এসব করার সুবিধে হয়েছে।'

'ফালতু কথা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন ডাক্তার হ্যারিসন। 'ভায়োলেন্স মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়, জন্ম থেকে নিষ্ঠুর হয় না মানুষ। সব তালগোল পাকিয়ে ফেলছ তুমি।'

'তাই নাকি?' বাঁকা চোখে সহকারীর দিকে তাকালেন রুডলফ। 'বেশ, ডেনি গ্যাসপারের কথাই ধরা যাক। মানুষের উন্নতি চাইতেন তিনি, তাঁর কারণেই সৃষ্টি হয়েছে এই গ্যাসপার সেন্টার; কিন্তু তাই বলে কি তাকে নিষ্ঠুর বলা যাবে না? নিশ্চয় যাবে। রীতিমত খুনী ছিলেন। বিগ-গেম হান্টার ছিলেন। শিকার মানেই খুন, আর খুন মানেই পৈশাচিকতা, কিংবা ভায়োলেন্স, যা-ই বলো।' ম্যানটেলপিস-এর দিকে দেখালেন। সেখানে সাজিয়ে রাখা হয়েছে শিংওয়ালা একটা জন্তুর স্টাফ করা মাথা, মৃত চোখদুটো চেয়ে আছে জানালার দিকে। কয়েকটা বুককেসের ওপরের দেয়ালে সাজানো রয়েছে বাঘ, পুমা আর একটা বিশাল জলমহিষের মাথা। ভালুক, সিংহ আর চিতার চামড়া আছে কয়েকটা। 'এখন যুগ পাল্টেছে, তাই মানুষের পরিবর্তে জন্তু শিকার করে তার মাথা কিংবা চামড়া এনে ঘরে সাজিয়ে রাখা হয়। বহুকাল আগে কি হত? অন্য কোন শিকার না পাওয়া গেলে মানুষ মানুষকেই মারত। আমরা যেমন মুরগীর ঠ্যাঙ চুষি, তেমনি করে মানুষের হাড় চুষত সে-কালের মানুষেরা।'

'সব গুবলেট করে ফেলছ!' খেঁকিয়ে উঠলেন হ্যারিসন।

'তারমানে ঠিকই বলছি,' হাত তুললেন রুডলফ। 'তোমার রেগে যাওয়া মানেই, নিজের যুক্তির স্বপক্ষে জবাব খুঁজে না পাওয়া।'

ঠিক এই সময় ঘরে ঢুকলেন টাকমাথা, ছোটখাটো একজন মানুষ। 'আবার শুরু করেছ! নাহ্, তোমাদের নিয়ে আর পারা গেল না। মানুষ নিষ্ঠুর হোক বা না হোক তাতে কি এসে যায়?'

আগন্তুকের পরিচয় দিল লিলি, 'ইনি ডাক্তার এনথনি রেডম্যান, ইমিউনোলজিস্ট। অনেকগুলো সাদা ইঁদুর আছে ওঁর।...স্যার, এদেরকে ওগুলো দেখাতে চাই। দেখাব?'

'দেখাও, তবে হাত দিতে পারবে না,' অনুমতি দিলেন ডাক্তার রেডম্যান।

'না, দেব না।'

আরেকটা হলরুমে ঢুকল ছেলেরা।
'ওঅর্করুম, ল্যাবরেটরি, সব জায়গায়ই যাওয়া যায় এখান থেকে। ওই যে,' একটা দরজা দেখাল লিলি, 'ওটার ওপাশে ডাক্তার রেডম্যানের ল্যাবরেটরি।'
দরজা ঠেলে ছোট একটা ওয়াশরুমে ঢুকল ওরা। চারটে সার্জিক্যাল মাস্ক বের করে একটা নিজে নিয়ে বাকি তিনটে তিনজনকে দিল লিলি। 'পরে নাও।' মাস্ক মুখে লাগিয়ে ভারি একজোড়া রবারের দস্তানা পরে নিল সে।
দেখাদেখি তিন গোয়েন্দাও মুখোশ পরল।
আরেকটা দরজা ঠেলে বড় একটা ঘরে এসে ঢুকল ওরা। রোদের আলোয় আলোকিত। দেয়াল ঘেঁষে রাখা আছে সারি সারি কাঁচের খাঁচা। ভেতরে অসংখ্য সাদা প্রাণী ছুটাছুটি করছে।
'বেশি কাছে যেয়ো না,' সাবধান করল লিলি, 'ছুঁয়ো না।' ইঁদুরগুলোকে খাওয়ানোয় মন দিল সে।
'এগুলো বিশেষ ধরনের ইঁদুর,' খানিক পরে আবার বলল। 'ওদের ইমিউনিটি নষ্ট করে দিয়েছেন ডাক্তার রেডম্যান...'
'এক মিনিট,' হাত তুলল মুসা। 'ইমিউনিটিটা কি?'
'এক কথায় ব্যাখ্যা করা যাবে না,' বলল রবিন। 'রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা জাতীয় কোন ব্যাপার।'
'হ্যাঁ,' বলল লিলি। 'অনেকটা তাই। ছুঁলে ওগুলোর মধ্যে রোগ সংক্রমণ ঘটতে পারে, খুব সহজে। ইনফেকশন প্রতিরোধের ক্ষমতা প্রায় নেই বললেই চলে এখন ওদের।'
'হুঁ,' মাথা দোলাল মুসা। 'তারমানে রোগে ধরলেই মরবে?'
'কয়েকটা ইতিমধ্যেই মরেছে,' লিলি জানাল। 'জীবদেহে একধরনের বিশেষ কোষ তৈরি হতে থাকে, যেগুলো রোগজীবাণু খেয়ে ফেলে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ওই কোষই দেহের ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে। ওই ইমিউন রিঅ্যাকশন থেকেই তখন বাতে ধরে মানুষকে, পাকস্থলীতে ঘা হয়, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে পাগলামি রোগেও ধরে।'
'খাইছে!' আঁতকে উঠল মুসা। 'আল্লারে! কি সাংঘাতিক!'
'ইমিউনিটি না থাকলে বসন্ত রোগ ঠেকাতে পারব না আমরা,' রবিন বলল, 'হাম হবে...'
'জানি,' বলল লিলি। 'সেজন্যেই ইমিউনিটি নিয়ে গবেষণা করছেন ডাক্তার রেডম্যান, যাতে ইচ্ছেমত ইমিউন কন্ট্রোল করতে পারি আমরা, রিঅ্যাকশন না হয়, অন্য রোগে আক্রান্ত না হই...'
'চমৎকার আইডিয়া!' কিশোর বলল। 'বই-টই লিখছেন নাকি?'
'এখনও না। তবে ইচ্ছে আছে। ডাক্তার রুডলফ লিখছেন, ডাক্তার হ্যারিসনও লিখছেন তাঁর ঘরে কেবিনেটে বন্দি মানুষটাকে নিয়ে।'
'কেবিনেটে বন্দি?' ভুরু কোঁচকাল রবিন।
'মানুষের ফসিল,' বুঝিয়ে বলল লিলি। 'আফ্রিকায় পেয়েছিলেন হাড়গুলো।

জোড়া লাগিয়ে লাগিয়ে আস্ত কঙ্কাল বানিয়ে ফেলেছেন।'

'এখানকার গুহায় পাওয়া গুহামানবকে নিয়েও তাই করতে চান বোধহয়?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ,' লিলির কণ্ঠে অস্বস্তি, 'কিন্তু ম্যাকম্যার আংকেল দিতে রাজি না।

ইঁদুরগুলোকে খাওয়ানো শেষ হলে আবার ওয়াশরুমে ফিরে এল ওরা। মাস্ক গ্লাভস খুলে সিংকের পাশে একটা ঢাকনাওয়ালা পাত্রে ফেলল লিলি। তিন গোয়েন্দাও তাদের মাস্ক খুলে রাখল। তারপর এসে ঢুকল আবার হলরুমটায়।

'এবার শিম্পাঞ্জীগুলো দেখবে, চলো,' লিলি বলল।

একটা করিডরের শেষ মাথায় ডাক্তার ক্লডিয়াসের ল্যাবরেটরি। রেডম্যানের ঘরটার চেয়ে বড়। জানালার কাছে একটা খাঁচায় দুটো শিম্পাঞ্জী গম্ভীর হয়ে বসে আছে। খাঁচার ভেতরে নানারকমের খেলনা রয়েছে। ছোট একটা ব্ল্যাকবোর্ড আছে, রঙিন চক দিয়ে ওটাতে লেখে ওরা।

লিলিকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল শিম্পাঞ্জী দুটো। খাঁচার ফাঁক দিয়ে হাত বের করল বড়টা।

'আরে রাখ, রাখ, খুলছি!' এগিয়ে গিয়ে খাঁচার দরজা খুলে দিল লিলি। শিম্পাঞ্জীটা বেরিয়ে এসে তার হাত ধরল।

'ভাল আছিস?' জিজ্ঞেস করল লিলি। 'রাতে ভাল ঘুম হয়েছে?'

চোখ বুজে মানুষের মতই মাথা কাত করে সায় জানাল শিম্পাঞ্জীটা। তারপর দেয়ালঘড়ি দেখিয়ে এক আঙুল দিয়ে বাতাসে একটা অদৃশ্য চক্র আঁকল।

'ও, অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিস।'

তিরিঙ করে মস্ত এক লাফ দিয়ে হাততালি দিল জানোয়ারটা।

দ্বিতীয় শিম্পাঞ্জীটাও বেরিয়ে এসে একটা টেবিলে উঠে বসেছে।

'এই, খবরদার!' ধমক দিল লিলি।

তাকের ওপর রাখা কেমিক্যালের বোতলগুলোর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ওটা। কয়েকবার তাকিয়ে সেদিকে লিলির কোন আগ্রহ না দেখে, লাভ হবে না বুঝতে পেরে টেবিল থেকে খালি একটা বীকার নিয়ে লাফ দিয়ে নামল মাটিতে। খেলতে শুরু করল।

রেফ্রিজারেটর থেকে ফল আর দুধ বের করল লিলি, তাক থেকে বড় বাসন নামাল।

'তোমার কথা বোঝে ওরা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'বোঝে। ইঙ্গিতে অনেক কিছু বোঝাতেও পারে। ডাক্তার ক্লডিয়াস শিখিয়েছেন। বোবা ইস্কুলে যেভাবে সাইন ল্যাংগোয়েজ শেখানো হয়, তেমনি।'

'ডাক্তার সাহেব তো নেই,' রবিন বলল। 'এখন এগুলোর কি হবে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিলি। 'জানি না। বোর্ডের মেম্বাররা আগামী মাসে মিটিঙে বসে ঠিক করবেন। কয়েকটা শিম্পাঞ্জী ইতিমধ্যেই মরে গেছে। অনেক দাম দিয়ে কিনে আনা হয়েছিল ওগুলোকে।' ছলছল করছে তার চোখ।

টেবিলে খাবার দিল লিলি। ছোট চেয়ারে উঠে বসে খেতে শুরু করল

শিম্পাঞ্জীগুলো।
খাওয়া শেষ হলে ওগুলোকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে আবার খাঁচায় ভরল লিলি। চেঁচামেচি, বাদপ্রতিবাদ অনেক করল ওরা, বড়টা তো লিলির হাতই আঁকড়ে ধরে রাখল, খাঁচায় বন্দি থাকতে রাজি নয়।
'থাক,' কোমল গলায় বলল লিলি, 'আমি আবার আসব।'
একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে কিশোর, ল্যাবরেটরিতে ঢোকার পর লিলির আচরণ অন্যরকম হয়ে গেছে। অথচ ম্যাকক্সারের বাড়িতে থাকার সময় মনমরা হয়ে থাকে।
'ডাক্তার কুডিয়াসকে মিস করছে ওরা,' লিলি বলল। 'আমিও। এখানে ঢুকলে তাঁর জন্যে খারাপ লাগে। খুব ভাল মানুষ ছিলেন। হাসিখুশি। অসুস্থ হয়েও হাসি যায়নি মুখ থেকে।'
'আগে থেকেই অসুস্থ?' কিশোর ধরল কথাটা। 'আমি তো ভেবেছিলাম, রকি বীচে হঠাৎ করেই স্ট্রোকটা হয়েছে।'
'হঠাৎ করেই হয়েছে। তবে কিছু কিছু লক্ষণ দেখা দিয়েছিল এখানে থাকতেই। চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়তেন। হয়তো শিম্পাঞ্জীগুলো তখন বাইরে রয়েছে, জিনিসপত্র তছনছ করছে, খেয়াল করতেন না। সেদিন তাঁর সঙ্গে আমার যাওয়ার কারণই ছিল এটা। বুঝতে পারছিলাম, একা এতটা পথ যেতে পারবেন না।'
'কেন গিয়েছিলেন রকি বীচে?' এমনি, সাধারণ কথাচ্ছলেই প্রশ্নটা করল কিশোর, কিছু ভেবে নয়।
কিন্তু চমকে উঠল লিলি, লাল হয়ে গেল গাল।
'ইয়ে···তিনি···আমি জানি না,' আরেক দিকে মুখ ফেরাল লিলি। দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করল।
চট করে একে অন্যের দিকে তাকাল মুসা আর কিশোর।
'ব্যাপার কি?' নিচু গলায় বলল মুসা।
নাক কুঁচকাল কিশোর। 'মিথ্যে বলছে।' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার। 'কিন্তু কেন? কি লুকানোর চেষ্টা করছে?'

পাঁচ

লিভিংরুমে ফিরে দেখা গেল, বিজ্ঞানীদের একজনও নেই। সোফার কভার ঝেড়ে, সোজা করছে মোটা এক মহিলা। কালোচুল এক তরুণ জানালা-দরজার কাঁচ মোছায় ব্যস্ত।
'অ, লিলি,' মহিলা বলল। 'তোমার বন্ধু নাকি? ভাল।'
মহিলাকে চিনল কিশোর। মিসেস গ্যারেট। মাথায় এখন একটা ছাই-সোনালি উইগ। তবে চোখের পাপড়ি আগেরগুলোই আছে।
ছেলেদের সঙ্গে মহিলার পরিচয় করিয়ে দিল লিলি।
'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে,' কিশোরের সঙ্গে হাত মেলাতে মেলাতে বিচিত্র শব্দ করল মিসেস গ্যারেট, ছানাকে আদর করার সময় মুরগী যেমন কঁক-কঁক করে

অনেকটা তেমনি। 'তুমি সেই ছেলেটাই তো। খুব ভাল ছেলে। মানুষের খারাপ সময়ে যে উপকার করে সে-ই তো ভাল মানুষ। জানো, তখন হাসপাতালে হালের কথা খুব মনে পড়ছিল। ও, হাল কে চেনো না? হাল গ্যারেট, আমার স্বামী, শেষ স্বামী। ওর মত মানুষই হয় না।'

বকবক করে চলল মিসেস গ্যারেট।

কয়েক মিনিটেই জানা হয়ে গেল ছেলেদের, মোট তিনজন স্বামী বদল করেছে মহিলা। প্রথমজন ছিল বীমার দালাল, দ্বিতীয়জন চিত্রপরিচালক, আর তৃতীয়জন, তার পছন্দের মানুষ এবং শেষ স্বামী—একজন পশুচিকিৎসক।

'সব মানুষই ভাল হয় না,' বলে গেল মিসেস গ্যারেট, 'সবাই বাঁচে না বেশিদিন। আমার স্বামীদের বেলায়ও তাই হয়েছে। কম বয়েসে মারা গেল। তারপর এসে এখানে হাউজকীপারের চাকরি নিলাম। ডাক্তারগুলোকে প্রথম প্রথম খুব ভয় পেতাম, একেকজনের একেক রকম স্বভাব, অদ্ভুত। আবলতাবল বকে, আর সুযোগ পেলেই বসে বসে গালে হাত রেখে ভাবে। বলো দেখি কি কাণ্ড! তবে একবার ওদের স্বভাব বুঝে ফেললে আর কোন অসুবিধে নেই। বলে একটা করে আরেকটা। ডাক্তার রুডলফের কথাই ধরো। মুখে নিষ্ঠুরতা, পৈশাচিকতা, খুন এ সব ছাড়া আর কোন পথ নেই। অথচ একটা মাছি মারতে পারবে না, মারলে কেঁদে বুক ভাসাবে। ডাক্তার হ্যারিসন হয়েছে তার উল্টো। খুনটুন এসব কথা শুনলেই আঁতকে ওঠে। অথচ যা বদমেজাজী, মানুষ খুন করতেও হাত কাঁপবে বলে মনে হয় না।...লিলি, ওকে তোমার আংকেলের সামনে বেশি যেতে দিও না। কখন যে কি ঘটাবে কে জানে।'

'আমি বুঝি,' মিনমিন করে বলল লিলি।

কাজে মন দিল আবার মিসেস গ্যারেট।

ভেজা ব্রাশ বালতির পানিতে ফেলে ঘুরে দাঁড়াল তরুণ। লিলিকে বলল, 'আমার সঙ্গে পরিচয় করালে না?' এগিয়ে এল।

লজ্জা পেল লিলি। 'ও, হ্যাঁ, কিশোর, ওর নাম বিল উইলিয়ামস। সেন্টারে কাজ করে, আমার মত।'

হেসে হাত বাড়িয়ে দিল বিল। 'হাই। পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।...লিলি, গতরাতের জন্যে আমি লজ্জিত। টায়ার পাংচার হয়ে আটকে গিয়েছিলাম...আমার জন্যে বেশি অপেক্ষা করোনি তো?'

'ওসব কথা থাক,' বলে ছেলেদের নিয়ে আরেকটা দরজার দিকে রওনা হলো লিলি।

লাইব্রেরিতে ঢুকল ওরা। তারপর ছোট একটা চৌকোণা ঘর পার হয়ে বেরিয়ে এল বাড়ির একপ্রান্তে।

ওখান থেকে পঞ্চাশ মিটার দূরে আস্তাবল। নীরবে সেদিকে এগোল লিলি।

প্রিয় ঘোড়াটার কাছে এসে মেজাজ ভাল হয়ে গেল তার। ঘোড়ার নাম রেখেছে পাইলট। মুসার বেশ পছন্দ হলো নামটা।

গলায় হাত বোলাতে বোলাতে নিচু স্বরে ওটার সঙ্গে কথা বলল লিলি। চারটে

আপেল মাটিতে রেখে জিজ্ঞেস করল, 'ক-টা?'

চারবার পা ঠুকল ঘোড়াটা।

'লক্ষ্মী ছেলে,' বলে চারটে আপেলই পাইলটকে উপহার দিয়ে দিল লিলি।

আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। লিলি রইল ভেতরে, ঘোড়ার সেবাযত্ন শেষ হতে সময় লাগবে।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে শহরের দিকে চলল ছেলেরা, খিদে পেয়েছে।

রাস্তায় লোকের ভিড় আরও বেড়েছে। স্যাকসের দোকানের সামনে এসে লাইন দিতে হলো তাদের। সাধারণ হ্যামবার্গার জোগাড় করতেই লেগে গেল এক ঘণ্টার বেশি।

খাওয়া সেরে শহর দেখতে চলল। দোকানিদের দম ফেলার অবকাশ নেই। আগামী দিন গুহামুখ খুলে দেয়া হবে। পিঁপড়ের মত পিলপিল করে বাইরে থেকে আসছে লোক। তাদের সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে সব ক-জন দোকানি। তার ওপর রয়েছে দোকান সাজানোর কাজ। কয়েকটা দোকানের সামনের কাঁচে বড় করে আঁকা হয়েছে গুহামানবের ছবি, পরনে পশুর ছাল, হাতে মুগুর। একটা দোকানের ছবি তো আরেক কাটি বাড়া। চুল ধরে এক গুহামানবীকে টেনে নিয়ে চলেছে ভয়ানক চেহারার এক উন্মত্ত গুহামানব। প্রায় সমস্ত দোকানের সামনেটাই রঙিন কাগজের ত্রিকোণ পতাকা কেটে সাজানো হয়েছে।

গুহামুখ খোলার অনুষ্ঠান হবে ছোট পার্কটায়। তাই রঙিন বাল্ব দিয়ে সাজানো হচ্ছে গাছগুলোকে। স্ট্যাণ্ডগুলোর নতুন করে রঙ করা হচ্ছে। অটোমেটিক স্প্রিঙ্কলার সিসটেম আছে একটা, নির্দিষ্ট সময়ে ওটার ঝাঁঝরিগুলোর মুখ খুলে যায়, বৃষ্টির মত পানি ঝড়ে পড়ে পার্কের গাছপালার ওপর।

পুরানো রেলস্টেশনের কাছে আস্তানা গেড়েছে এক আইসক্রীম ফেরিওয়ালা। ছোট ট্রাকে করে আইসক্রীম এনেছে। ভাল বিক্রি।

কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ম্যাকম্বারের গোলাবাড়িতে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা।

সেখানেও উত্তেজনা।

লম্বা, রগ বের হওয়া একজন লোক তার ওঅর্কভ্যানের পাশে দাঁড়িয়ে কাজে ব্যস্ত,। যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে করতে বিড়বিড় করছে আপনমনে। 'ঠিক হচ্ছে না। মোটেই উচিত হচ্ছে না। পস্তাবে, দেখো, পস্তাবে বলে দিলাম।'

কাছে এগোল ছেলেরা। উঁকি দিয়ে দেখল, ভ্যানের দেয়াল ঘেঁষে একটা আলমারি বসানো। একটা গ্যাসের চুলা আর ছোট একটা রেফ্রিজারেটরও রয়েছে। আর আছে একটা বিছানা, নিখুঁতভাবে বিছানো। অবাক হয়ে ছেলেরা ভাবল, শুকনো ঢেঙা লোকটা ওই ভ্যানের মধ্যেই বাস করে নাকি?

ছেলেদের দেখে ভ্রূকুটি করল লোকটা। 'তোমরাও ভাল বলবে না।'

চেঁচাতে শুরু করল কে জানি।

ডাক্তার জর্জ হ্যারিসন। জানালাশূন্য নতুন বাড়িটার বাইরে দাঁড়িয়ে মুঠো পাকিয়ে শাসাচ্ছেন কাউকে। চেঁচিয়ে বললেন, 'তুমি...তুমি একটা জন্তু!'

ডাবলডোর খুলে গেল, দরজার দেখা দিল ম্যাকম্বার। হাতের শটগান নেড়ে

কড়া গলায় বলল, 'ভাগো! যাও এখান থেকে!'

পিছিয়ে এলেন হ্যারিসন। 'জন্মের পর পরই খাঁচায় ভরা উচিত ছিল তোমাকে, জন্তু কোথাকার! ভেবেছ, কি তুমি, অ্যাঁ? তোমার জায়গায় পাওয়া গেছে বলেই কি ওই হাড় তোমার সম্পত্তি? কেন, তোমার জায়গায় আলোও তো আছে, বাতাস আছে, রোদ আছে, ওগুলোও কি তোমার হয়ে গেল? ওই হোমিনিডটা আটকে রাখার কোন অধিকার নেই তোমার।'

'ভাল হবে না বলে দিচ্ছি,' পাল্টা জবাব দিল ম্যাকম্বার। 'বেআইনী ভাবে ঢুকেছ আমার জায়গায়, মাফ করে দিলাম। ভাগো এখন। দেখতে চাইলে কাল এসো। আর সবার মত পাঁচ ডলারের টিকেট কিনে। যাও।'

গলা টিপে ধরেছে যেন কেউ, এমনভাবে ফ্যাঁসফ্যাঁস করে উঠলেন হ্যারিসন। ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে গটমট করে হাঁটতে শুরু করলেন।

হেসে ছেলেদের বলল ম্যাকম্বার, 'খুব রেগেছে।'

'উচিত হচ্ছে না!' গোঁ গোঁ করে বলল ভ্যানের মালিক।

'তোমাকে কে জিজ্ঞেস করছে?' ধমক দিল ম্যাকম্বার। 'তোমার কাজ তুমি করো। এই যে, ছেলেরা, আসবে নাকি। দেখতে চাও, কেমন সাজিয়েছি?'

ঘুরে ভেতরে ঢুকে গেল আবার ম্যাকম্বার।

ছেলেরা গেল তার পেছনে। ভেতরে ঢুকেই হাঁ হয়ে গেল।

জাদুঘর সাজিয়েছে বটে ম্যাকম্বার। বড় বড় ছবি। হাড় আর কঙ্কালের ছবি আছে, এনলার্জ করা ফটোগ্রাফ আছে। আছে নানারকম রঙিন ছবি, আদিম পৃথিবীর প্রাকৃতিক দৃশ্য। জলাভূমি থেকে বাষ্প উঠছে, উঁচু পাহাড় থেকে ঝরে পড়ছে ঝর্না, রুক্ষ সৈকতে ভাঙছে সাগরের ঢেউ—মাথায় ফেনার মুকুট।

ঘরের মাঝখানে অনেকগুলো টেবিল। তার ওপর সাজানো কাঁচের বাক্সে নানারকম প্রতিকৃতি। কোথাও বরফযুগের দৃশ্য, বরফে ঢেকে রেখেছে আমেরিকার একাংশ, কোথাও গলতে শুরু করেছে বরফ। বেরিয়ে পড়েছে গভীর হ্রদ, উঁচু উপত্যকা। একটা বাক্সে দেখা গেল কয়েকজন উলঙ্গ রেডইনডিয়ান শীত থেকে বাঁচার জন্যে আগুনের কাছে জড়সড় হয়ে আছে। আরেকটা বাক্সে বিশাল এক রোমশ ম্যামথ হাতিকে আক্রমণ করেছে গুহামানবের দল।

'ক্লাসিক হয়েছে, না?' গর্বের হাসি ফুটল ম্যাকম্বারের মুখে। 'আসল জিনিস ওই ওদিকে।'

দরজার ঠিক উল্টো দিকে একটা মঞ্চ তৈরি হয়েছে, চারটে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। মঞ্চের পরে পাহাড়ের উলঙ্গ ঢাল, তাতে রয়েছে সেই গুহামুখটা। উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত প্রবেশপথ।

সিঁড়ি বেয়ে মঞ্চে উঠল তিন গোয়েন্দা। গুহামুখ দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল।

দম বন্ধ করে ফেলল কিশোর।

কেঁপে উঠল রবিন।

পুরো কঙ্কালটা নেই, আংশিক। খুলির বেশির ভাগই রয়েছে, কালের ক্ষয়ে বাদামী, কুৎসিত। বীভৎস ভঙ্গিতে যেন তাকিয়ে রয়েছে শূন্য অক্ষিকোটর। ওপরের

চোয়ালটা আছে, মাটিতে বিকট দাঁতের সারি। গুহার মেঝে থেকে ঠেলে বেরিয়ে আছে মাটিতে গাঁথা পাঁজরের কয়েকটা হাড়। তার নিচে শ্রোণীর হাড়ের খানিকটা, তারও নিচে পায়ের কয়েকটা হাড়। একটা হাতের হাড় লম্বা হয়ে পড়ে আছে, পাঁচ আঙুলের তিনটে উধাও, দুটো রয়েছে একেবারে গুহামুখের ধারে। যেন মৃত্যুর আগে হাত বাড়িয়ে কিছু ধরার চেষ্টা করছিল।

গুহার ছাতে আলো ঝোলানো হয়েছে। কঙ্কালের কাছে জ্বলছে একটা কৃত্রিম অগ্নিকুণ্ড। তারও পরে যেন নিতান্ত অবহেলায় ফেলে রাখা হয়েছে কয়েকটা ন্যাভাজো কম্বল আর ইনডিয়ান কায়দায় তৈরি বেতের ঝুড়ি।

ডাক্তার হ্যারিসনের রাগের কারণ বুঝতে অসুবিধে হলো না ছেলেদের। আদিম রূপ দিতে গিয়ে পুরো ব্যাপারটাকেই হাস্যকর করে তুলেছে ম্যাকস্বার, অনেক কিছু বেমানান। চোখে আরও লাগে কঙ্কালের চারপাশে আধুনিক বুটের অসংখ্য ছাপ। বোধহয় ইলেকট্রিশিয়ান আর টেকিনিশিয়ানদের জুতোর।

'কেমন বুঝছ?' হেসে জিজ্ঞেস করল ম্যাকস্বার। 'আচ্ছা, আরেক কাজ করলে কেমন হয়? একজোড়া মোকাসিন যদি রেখে দিই ওটার পায়ের কাছে? ভাবখানা, জুতো খুলে শুয়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছে?' প্রশ্নের জবাব নিজে নিজেই দিল আবার। 'না, ভাল হবে না। বেমানান লাগবে।'

অস্ফুট শব্দ বেরোল রবিনের মুখ থেকে।

আবার বলল ম্যাকস্বার। 'আমার মনে হয় না, এত আগে মোকাসিন পরত মানুষ। না?'

জবাব দিল না ছেলেরা।

ঘুরে মঞ্চ থেকে নেমে আরেকদিকে রওনা হলো। এক জায়গায় সাজিয়ে রাখা হয়েছে অনেকগুলো চকচকে রিঙ, তাতে খাটো শেকল দিয়ে আটকানো প্লাস্টিকের গুহামানবের প্রতিকৃতি। কিছু টি-শার্ট আছে, বুকে গুহামানবের ছবি ছাপা।

'ওগুলো বিক্রির জন্যে,' জানাল ম্যাকস্বার। 'আজ তো দিতে পারবে না, বিক্রি শুরু হয়নি। কাল এসো।...চলো, বেরোই।' সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দরজার দিকে এগোল সে। চলতে চলতেই বলল, 'দরজায় তালা লাগিয়ে রাখব। রাতে পাহারা দেবে জিপসিটা।'

'ভ্যানের কাছে যাকে দেখলাম?' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ। ওর নাম ফ্রেন্‌টিস, সংক্ষেপে ফ্রেনি।'

বাইরে বেরিয়ে দরজায় তালা লাগাল ম্যাকস্বার। আসলে জিপসি নয় ও। গাড়িতে বাস করে তো, জিপসিদের মত যাযাবর, তাই লোকে ওর নাম রেখেছে জিপসি ফ্রেনি।

নিজের বাড়ির দিকে চলে গেল ম্যাকস্বার।

ভ্যানের দরজা খুলে উঁকি দিল ফ্রেনি। 'আমাকে দারোয়ান রেখেছে বেতন দিয়ে, বেশ, পাহারা দেব। কিন্তু ভাল করছে না। মানুষটা এসব পছন্দ করবে না। আমার হাড় নিয়ে এসব করলে আমি কি সহ্য করতাম?'

'কিন্তু ও জানছে কিভাবে?' বলল মুসা। 'ও তো মরা, তাই না? ওকে নিয়ে

কে কি করল না করল তাতে ওর কিছুই যায় আসে না।'
'তাই নাকি?' রহস্যময় শোনাল জিপসির কণ্ঠ।

ছয়

ডিনারও সারতে হলো হ্যামবার্গার দিয়েই। ফেরিওয়ালার কাছ থেকে আইসক্রীম কিনে খেল তিনজনে। তারপর এসে উঠল গোলাঘরের মাচায়। খোলা জানালা দিয়ে দেখল সূর্যের অস্ত যাওয়া আর চাঁদের উদয়। বাতাস ঠাণ্ডা। তৃণভূমির ওপর হালকা ধোঁয়ার মত উড়ছে কুয়াশা।

স্লীপিং ব্যাগ টেনে নিল ছেলেরা। ঘুমিয়ে পড়ল।

অন্ধকারে দরজা খোলার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। কে যেন ঢুকেছে গোলাঘরে। ভীত জানোয়ারের মত গোঙাচ্ছে। উঠে বসে কান পাতল সে।

মুহূর্তের জন্যে থামল গোঙানি, তারপর আবার শুরু হলো।

নড়েচড়ে মুসাও উঠে বসল। ফিসফিসিয়ে বলল, 'কে?'

জবাব না দিয়ে মাচার ফোকরের কাছে গিয়ে নিচে উঁকি দিল কিশোর। অন্ধকার।

'এই ছেলেরা, শুনছ?' খসখসে ভাঙা কণ্ঠস্বর। 'আছ ওখানে?'

জিপসি ফ্রেনি। এগোতে গিয়ে কিসের সঙ্গে পা বেধে ধুড়ুস করে পড়ল।

ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

টর্চের জন্যে হাত বাড়াল মুসা। স্লীপিং ব্যাগের পাশেই তো ছিল। গেল কই? হাতড়ে হাতড়ে বের করে নিয়ে এসে মই বেয়ে নামল কয়েক ধাপ। নিচের দিকে মুখ করে জ্বালল।

একটা খালি বাক্সে পা লেগে পড়ে গেছে ফ্রেনি। উঠে তাকাল আলোর দিকে। 'তোমরাই তো?' কণ্ঠে আতঙ্ক। 'জবাব দিচ্ছ না কেন? তোমরা তো?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কিশোর।

মই বেয়ে নেমে এল তিনজনে।

ম্যাকস্বারের পিকআপে হেলান দিয়ে কাঁপছে জিপসি।

'কি হয়েছে,' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'মড়া···মড়াটা!' ভয়ে ভয়ে বলল ফ্রেনি। 'বলেছিলাম না, পছন্দ করবে না!'

'হয়েছেটা কি?' মুসা জানতে চাইল।

'ও উঠে চলে গেছে। কাল যখন গিয়ে দেখবে কঙ্কালটা নেই, আক্কেল হবে ম্যাকস্বারের। দোষ দেবে আমার। বলবে আমি সরিয়েছি। আসলে তো হেঁটে চলে গেছে। নিজের চোখে দেখলাম।'

গোলাঘরের দরজা খোলা। পাহাড়ের ঢালে নতুন বাড়িটা, মানে ম্যাকস্বারের মিউজিয়ামটার দিকে তাকাল ছেলেরা। চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে—দরজা লাগানো। তালা আছে কিনা বোঝা যায় না।

'স্বপ্ন দেখেননি তো?' মোলায়েম গলায় বলল রবিন।

'না,' মাথা নাড়ল লোকটা। 'গাড়ির মধ্যে শুয়ে ছিলাম। দরজা খোলার শব্দ শুনে উঁকি দিয়ে দেখি একটা গুহামানব। গায়ে পশুর ছাল জড়ানো। চোখ দুটোও দেখেছি। ভয়ঙ্কর। সোজা আমার দিকেই চেয়ে ছিল। জ্বলছিল কয়লার মত। লম্বা লম্বা চুল। গাড়ির পাশ দিয়ে চলে গেল মাঠের দিকে।'

চোখ বুজল জিপসি, যেন চোখ বুজলেই স্মৃতি থেকে দূর হয়ে যাবে ভয়ানক দৃশ্যটা।

'চলো তো দেখি,' কিশোর বলল সঙ্গীদের।

কাছাকাছি রইল ওরা। যেন ভয়, যে কোন মুহূর্তে জীবন্ত হয়ে উঠে এসে সামনে দাঁড়াবে প্রাগৈতিহাসিক মানুষটা।

দেখা গেল, মিউজিয়ামের দরজা বন্ধ।

কথাবার্তার আওয়াজ শুনে দরজা খুলে বেরোল ম্যাকম্বার। 'কি হয়েছে? এই, তোমরা এখানে কি করছ?'

'দেখছি,' জবাব দিল কিশোর। 'আপনার দারোয়ান মাঠের ওদিকে কাকে নাকি যেতে দেখেছে।'

মিসেস জেলডা ম্যাকম্বারও উঁকি দিল পেছনে।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এগিয়ে এল ম্যাকম্বার। 'কি হয়েছে?' ফ্রেনিকে জিজ্ঞেস করল। 'হ্যারিসন এসেছিল নাকি?'

'গুহামানব,' বলল জিপসি, 'চলে গেছে।'

'কি পাগলের মত বকছ?' ধমক লাগাল ম্যাকম্বার। 'জেলডা,' চেঁচিয়ে বলল, 'চাবি আনো তো।'

তালা খুলে মিউজিয়ামে ঢুকল ম্যাকম্বার। আলো জ্বালল। এগিয়ে গেল গুহামুখের দিকে। পেছনে চলল ছেলেরা।

কই, ঠিকই তো আছে। আগের মতই তাকিয়ে আছে শূন্য কোটর। বিকট নীরব হাসিতে ফেটে পড়ছে যেন একটিমাত্র চোয়াল। বুকের পাঁজর, হাত-পায়ের হাড়, সব ঠিক আছে।

জিপসির দিকে ফিরল ম্যাকম্বার। 'কি দেখেছ? এই তো, কঙ্কাল তো এখানেই।'

'হেঁটে গেছে!' বিড়বিড় করল ফ্রেনি। 'আমি দেখেছি। গায়ে পশুর ছাল। বড় বড় চুল। হেঁটে চলে গেল মাঠের ওপর দিয়ে।'

'তোমার মাথা। যত্তোসব।'

আলো নিভিয়ে সবাইকে নিয়ে মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে এল ম্যাকম্বার। 'যাও, ভালমত পাহারা দাও,' ধমক দিয়ে বলল ফ্রেনিকে। 'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখার জন্যে বেতন দিই না আমি তোমাকে।'

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল আবার জেলডা আর ম্যাকম্বার।

আপনমনে কি বলতে বলতে ভ্যান থেকে একটা ফোল্ডিং চেয়ার বের করল জিপসি। শটগান হাতে পাহারায় বসল।

গোলাঘরে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা।

নিশ্চয় স্বপ্ন দেখেছে,' মুসা মন্তব্য করল।
'বোকা মনে হয় লোকটাকে,' বলল রবিন।
'আমার মনে হয় না,' মাথা নাড়ল কিশোর।
'তাহলে সত্যি দেখেছে কিছু?'
'হতে পারে। হয়তো কেউ বেরিয়েছিল মিউজিয়াম থেকে।'
'কিভাবে?' মুসার প্রশ্ন। 'দরজায় তালা ছিল।'
'চাবি জোগাড় করে নিয়েছে,' স্লীপিং ব্যাগের ওপরে বসে খোলা জানালা দিয়ে চন্দ্রালোকিত মাঠের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। রাতের আকাশের পটভূমিকায় ওপাশের বনকে ঘন কালো দেখাচ্ছে। চাঁদের আলোয় সাদা লাগছে ঘাসের ওপরে জমা শিশিরকে, যেন সাদা চাদর। তাতে কালো কালো ছোপ এক সারিতে এগিয়ে গেছে বনের দিকে।

এর একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে, ভাবল কিশোর। হেঁটে গেছে কেউ। পায়ের চাপে ঘাস বসে গেছে, শিশির ঝরে গেছে ওখান থেকে। ফলে কালো দেখাচ্ছে।

নামতে গিয়েও থেমে গেল কিশোর। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে জিপসি ফ্রেনি। বগলে শটগান। মাঠের দিকে ফিরে কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করছে।

ভ্যানে গিয়ে ঢুকল ফ্রেনি। বেরিয়ে এল একটা কম্বল নিয়ে। ভাল করে গায়ে জড়িয়ে আরাম করে বসল চেয়ারে।

'ফ্রেনির বিশ্বাস, সে গুহামানব দেখেছে,' আনমনে বলল কিশোর।

বাইরে তাকাল মুসা। জ্যোৎস্নায় আলোকিত তৃণভূমির দিকে চেয়ে অস্বস্তি জাগল মনে। 'ওকে দোষ দেয়া যায় না। বেশি ভয় পেলে জেগে থেকেও দুঃস্বপ্ন দেখে মানুষ।'

সাত

পরদিন শনিবার।

আগে ঘুম ভাঙল কিশোরের, মাচা থেকে নেমে বেরিয়ে এল গোলাঘরের বাইরে। উজ্জ্বল রোদে এখন আর রাতের মত কালো দেখাচ্ছে না বন, রহস্যময় লাগছে না। তৃণভূমির ওপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল সে। মাটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কিন্তু একটা পায়ের ছাপও চোখে পড়ল না। কালো দাগগুলোও মুছে গেছে নতুন করে শিশির জমায়।

তিরিশ মিটারমত এগিয়ে দেখল এক জায়গায় ঘাস বেশ পাতলা। কালো মাটি দেখা যায়। হাঁটু গেড়ে বসে ভালমত দেখে কেঁপে উঠল উত্তেজনায়।

মুসা এসে যখন তার পাশে দাঁড়াল, তখনও একইভাবে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর।

'কী?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'কিছু পেলে?'

'পায়ের ছাপ। এখান দিয়ে হেঁটে গেছে কেউ, খালি পায়ে। বেশিক্ষণ হয়নি।

ঝুঁকে মুসাও দেখল ছাপ। সোজা হয়ে তাকাল বনের দিকে। চেহারা

ফ্যাকাসে।

'খালি পায়ে!···তারমানে জিপসি সত্যি দেখেছিল···

জবাব দিল না কিশোর। উঠে হাঁটতে শুরু করল বনের দিকে।'

কিছুই না বুঝে তার পিছু নিল মুসা।

মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটছে কিশোর। ধীরে ধীরে আবার ঘন হয়ে এসেছে ঘাস, আর একটা ছাপও চোখে পড়ল না তার। বনের কিনারে চলে এসেছে। গাছের নিচ দিয়ে চলে গেছে পায়ে চলা পথ। সেখানে ছাপ নেই। ঘন হয়ে বিছিয়ে রয়েছে পাইনের কাঁটা।

'এখানে দেখা যাবে না,' বলল কিশোর। 'আরও এগোলে···'

'এক মিনিট,' বাধা দিয়ে বলল মুসা। 'এখনি যাবে? হয়তো ঝোপের মধ্যে এখনও লুকিয়ে রয়েছে···আমি বলি কি চলো আগে কিছু খেয়ে আসি? বেলা হলে, ভিড় বেড়ে গেলে হয়তো পাওয়াই যাবে না কিছু। শেষে না খেয়ে মরব।'

'মুসা, এটা খুব জরুরী!' বলল কিশোর।

'কার জন্যে? চলো, আগে পেট ঠাণ্ডা করি। বনের ভেতর সারাদিনই খোঁজা যাবে, সময় তো আর চলে যাচ্ছে না।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফিরতে হলো গোয়েন্দাপ্রধানকে।

গোলাঘরের কাছে পৌঁছুল ওরা। রবিন বেরোল। "মরনিং, বয়েজ। দারুণ সকাল, তাই না? মনে হচ্ছে, মিউজিয়ামে আজ দিনটা কাটবে ভাল। ভ্যানের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে ডাকল, 'অ্যাই ফ্রেনি।'

দরজায় দেখা দিল জিপসি। হাতে খাবারের প্লেট।

'আর গুহামানব দেখেছ, রাতে?' হেসে জিজ্ঞেস করল ম্যাকম্বার।

'না। একটাই যথেষ্ট,' ভেতরে ঢুকে গেল ফ্রেনি।

রেগে উঠল ম্যাকম্বার। 'অ্যাই, আবার ঢুকলে যে? এখনও খাওয়াই শেষ করোনি, কাজ করবে কখন?'

ওদের কথা শোনার জন্যে আর দাঁড়াল না তিন গোয়েন্দা, চলল শহরের দিকে।

কাফের সামনে ভিড় হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।

অনেক কষ্টে গুঁতোগুঁতি করে ভেতরে ঢুকে তিনটে চেয়ার দখল করল ছেলেরা। খাবারের অর্ডার দিল। লোকের কোলাহল ছাপিয়ে কানে আসছে ব্যাণ্ডবাদকদের বাজনা, মহড়া দিচ্ছে। মেইন রোডে গাড়ির সারি। কয়েকটা টেলিভিশন স্টেশনের ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে পার্কের একধারে।

খাবার এল। চামচ দিয়ে সবে মুখে তুলেছে ছেলেরা, এই সময় ঢুকলেন ডাক্তার রুডলফ। সঙ্গে ডাক্তার রেডম্যান, ইমিউনোলজিস্ট। এদিক ওদিক তাকিয়ে কিশোরের ওপর চোখ পড়তেই হাসলেন রুডলফ।

'ওঁদের এখানে বসতে বললে কেমন হয়?' বন্ধুদের পরামর্শ চাইল কিশোর।

'ভাল,' মুসা বলল। 'জিজ্ঞেস করো আগে, বসবেন কিনা।'

উঠে গিয়ে আমন্ত্রণ জানাল কিশোর। সানন্দে রাজি হলেন দুই ডাক্তার। কোন

টেবিল খালি নেই, জায়গা পেয়ে খুশিই হলেন।

'থ্যাংক ইউ,' বসতে বসতে বললেন ডাক্তার রুডলফ। 'পাগল-খানা হয়ে গেছে শহরটা। কতদিন এরকম থাকবে কে জানে। আমার মনে হয় সারাটা গরমই এভাবে যাবে। শীত পড়লে, তারপর গিয়ে কমতে শুরু করবে লোক।' খানিকটা মাখন নিজের প্লেটে তুলে নিয়ে বললেন, 'এমনিতে সেন্টারেই নাস্তা সারি আমরা। কিন্তু আজকাল হ্যারিসনের যা মেজাজ-মরজি। তার সঙ্গে বসে খেয়ে আর আরাম নেই। ওর দুঃখটাও বুঝি। হাতের কাছে রয়েছে গবেষণার এমন লোভনীয় জিনিস, অথচ হাত লাগাতে পারছে না...'

'হ্যাঁচচো' করে উঠলেন রেডম্যান। নাকচোখ মুছে ছেলেদের দিকে চেয়ে হাসলেন, 'সর্দির জ্বালায় আর বাঁচি না।' রুডলফের দিকে ফিরে বললেন, 'যা-ই বলো, হ্যারিসন বাড়াবাড়িই করছে।'

'মাথা খারাপ হয়ে গেছে বেচারার,' নরম গলায় বললেন রুডলফ। 'প্রায় আস্ত একটা কঙ্কাল, অথচ ছুঁতো দেয়া হচ্ছে না ওকে, কল্পনা করো। ওর জায়গায় আমি হলে আমারও একই অবস্থা হত।'

'ডাক্তার হ্যারিসন কি করতে চাইছেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'কার্বন ফরটিন টেস্ট?'

'কারবন ফরটিন দিয়ে বোধহয় কাজ হবে না এটাতে।' বুঝিয়ে বললেন রুডলফ, 'কারবন ফরটিন রেডিওঅ্যাকটিভ এলিমেন্ট, প্রাণীর হাড়ে থাকে। জীব বা উদ্ভিদ মারা যাওয়ার সাতান্নশত বছর পরে হাড়ে এই এলিমেন্ট কমে অর্ধেক হয়ে যায়। আরও সাতান্নশো বছর পরে তার অর্ধেক। এভাবে কমতে কমতে চল্লিশ হাজার বছর পরে হাড়ে কার্বন আর থাকেই না। তখন পরীক্ষা করেও আর কিছু বোঝা যায় না।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল রবিনের। 'আপনার কি ধারণা ফসিলটার বয়েস চল্লিশ হাজারের বেশি?'

'হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বয়েস কত, সেটা বোঝার আরও উপায় আছে, কার্বন ফরটিন টেস্টও ছাড়াও। কিন্তু পরীক্ষার জন্যে ল্যাবরেটরিতে তো আনতে হবে...'

'ওই যে এসে গেছে আমাদের নাস্তা,' ওয়েইট্রেসকে দেখে বলে উঠলেন রেডম্যান। 'যাক বাবা, পাওয়া গেল।'

কিছুক্ষণ নীরবতা। চুপচাপ খাচ্ছে সবাই।

'আচ্ছা,' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'ডাক্তার ক্লডিয়াস কি নিয়ে গবেষণা করতেন?'

প্রয়াত বিজ্ঞানীর কথা উঠতেই গম্ভীর হয়ে গেলেন ডাক্তার রুডলফ। 'ব্রিলিয়্যান্ট লোক ছিল।...মস্ত ক্ষতি হয়ে গেল আমাদের।'

'হয়তো হয়েছে,' কথার পিঠে বললেন রেডম্যান। 'কিন্তু জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিঙের বিপদও আছে। এটম নিয়ে গবেষণা করে শেষে যেমন এটম বোমা বানিয়ে ফেলা হলো। জিন নিয়ে গবেষণা চালালে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন তৈরি হয়ে

যাওয়ার ভয় আছে।'

'ডাক্তার ক্রুডিয়াস নাকি মানুষের দৈহিক উন্নতির চেষ্টা করছিলেন?' কিশোর বলল। 'লিলি বলেছে আমাদের ঘোড়া আর শিম্পাঞ্জীকে নাকি ইতিমধ্যেই অনেক বুদ্ধিমান বানিয়ে ফেলা হয়েছে।'

'কিছুটা,' বললেন রুডলফ।

'এসব গবেষণায় শেষকালে ক্ষতিই হয় বেশি,' রেডম্যান বললেন। 'প্রকৃতি যাকে যেভাবে তৈরি করেছে, সেভাবেই থাকতে দেয়া উচিত। নইলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।'

'তা ঠিক। কিন্তু ক্রুডিয়াসের উন্নতির কথা একবার ভেবে দেখো। ক্ষতি না করে সত্যি সত্যি যদি প্রাণীদেহের উন্নতি করা যায়, কি সাংঘাতিক ব্যাপার হবে!' ছেলেদের দিকে ফিরে বললেন রুডলফ, 'বেঁচে থাকলে গ্যাসপার পুরস্কার পেয়ে যেত ক্রুডিয়াস। এক বছর পর পর দেয়া হয় এই পুরস্কার। দশ লাখ ডলার।'

'সেটা তো গেল,' মুসা মুখ খুলল এতক্ষণে। 'এরপর কে পাবেন?'

শ্রাগ করলেন রুডলফ। 'কি জানি। পাকস্থলীর আলসার কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়, সেটা নিয়ে গবেষণা করছে রেডম্যান। সফল হলে সে পাবে। কিংবা মানুষের অরিজিন আবিষ্কার করতে পারলে ডাক্তার হ্যারিসন পাবে···'

'বাঁচবে অনেকদিন,' বাধা দিয়ে বললেন রেডম্যান। 'ওই যে, আসছে।'

জানালার দিকে ঘুরে তাকাল অন্যেরা। সোজা কাফের দিকে আসছেন হ্যারিসন।

ভেতরে ঢুকতেই হাত নেড়ে তাঁকে ডাকলেন রুডলফ।

কিশোরের পাশে একটা খালি চেয়ার টেনে এনে বসলেন হ্যারিসন। হউফ করে মুখ দিয়ে বাতাস ছেড়ে বললেন, 'অনেক চেষ্টা করলাম। গভর্নরকে পাওয়া গেল বটে, কথা বলতে পারলেন না। ব্যস্ত। লাঞ্চের পর আবার রিঙ করতে বলেছেন।'

'গভর্নর এসে কি করবে? গুহা থেকে তোমাকে কঙ্কালটা বের করে এনে দেবে?' ঝাঁঝাল কণ্ঠে বললেন রুডলফ।

এই তো, যাচ্ছে লেগে! ঝগড়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি বললেন রেডম্যান, 'এই ইউজেন, কি মনে হয় তোমার? কাজ হবে?'

'কেন হবে না?' ভুরু নাচালেন রুডলফ। 'রাস্তা কিংবা স্কুল বানানোর দরকার হলে তখন তো লোকের জায়গা নিয়ে নেয় সরকার। ফসিলটাকে বাঁচানোর জন্যে কেন পারবে না? গভর্নরকে বলব, এলাকাটাকে রিজার্ভ এরিয়া বলে ঘোষণা করতে। আশেপাশে নিশ্চয় আরও ফসিল আছে। ওগুলো নষ্ট হতে দেয়া যায় না···।' পার্কে ব্যাণ্ড বেজে উঠতেই থেমে গেলেন বিজ্ঞানী।

ঘড়ি দেখলেন রেডম্যান। 'দশটা বাজতে পাঁচ। অনুষ্ঠানের সময় হয়ে এল। দেরি করে ফেলেছ, ইউজেন। ঠেকাতে পারবে না ওদের।'

আট

অনুষ্ঠান শুরু হতে কিছুটা দেরি হয়ে গেল।

তিন ডাক্তার আর তিন গোয়েন্দা পার্কে পৌঁছে দেখল, মঞ্চে উঠে বসেছে ম্যাকস্বার। পাশে তার স্ত্রী জেলডা। পরনে সাদা-কালো প্রিন্টের পোশাক, হাতে কনুই-ঢাকা সস্তা দস্তানা। তার পাশে বসেছে শুকনো এক লোক, গায়ে রঙচঙে জ্যাকেট। কড়া রোদের জন্যে কুঁচকে রেখেছে চোখ।

'ওয়েসলি থারগুড,' লোকটাকে দেখিয়ে নিচু কণ্ঠে তিন গোয়েন্দাকে বললেন রুডলফ। 'এখানকার মেয়র। ওষুধের দোকানটার মালিক। অনুষ্ঠানের সভাপতি। বক্তৃতা দেয়ার খুব শখ।'

কালো স্যুট আর পাদ্রীর আলখেল্লা পরা একজন এসে উঠলেন মঞ্চে, মেয়রের পাশে বসলেন। গির্জার পাদ্রী, বুঝতে অসুবিধে হলো না ছেলেদের।

একে একে শহরের আরও কয়েকজন গণ্যমান্য লোক এসে জায়গা নিল মঞ্চে। তাদের মাঝে রয়েছে মোটেলের মালিক, সুপারমার্কেটের ম্যানেজার, এসিসটেন্ট ম্যানেজার। মঞ্চে মহিলা উঠল আরেকজন, এখানকার একমাত্র গিফট শপের মালিক। খাবার বিক্রি করতে করতে দেরি করে ফেলল কাফের মালিক। ছুটে আসতে দেখা গেল তাকে। তারপর এল গ্যারেজের মালিক, সামনের সারিতে জায়গা না পেয়ে মন খারাপ হয়ে গেল। অগত্যা বসতে হলো পেছনের সারিতে।

'দোকানপাট সব বন্ধ করে দিয়ে এসেছে,' রুডলফ বললেন। 'সারা শহরের লোক এসে জমেছে এখানে। টাকা কামানোর ভাল মওকা পেয়েছে ম্যাকস্বার।'

পার্কের ভেতরে লোক গিজগিজ করছে। পা রাখার জায়গা নেই। এদিক ওদিক চেয়ে কিশোর দেখল, 'ক্যাম্পফায়ার গার্ল' আর 'বয়স্কাউটদের'। আরও রয়েছে জুনিয়র চেম্বার অভ কমার্সের তরুণেরা।

পরনে কালো স্যুট, আর হ্যাটে সাদা পালক গোঁজা কয়েকজন জড় হয়ে আছে এক জায়গায়। সেদিকে তাকিয়ে আছে কিশোর, এই সময় পাশে এসে দাঁড়াল মিসেস গ্যারেট। প্রশ্ন না করেই জেনে গেল কিশোর; লোকগুলো 'নাইটস অভ কলাম্বাস'-এর সদস্য।

পার্কের কিনারে ট্রাক এনে দাঁড় করিয়েছে আইসক্রীমওয়ালা। চুটিয়ে ব্যবসা করছে। তারপাশে দাঁড়িয়ে আছে বেলুনওয়ালা, হাতে একগুচ্ছ গ্যাস-ভর্তি বড় বেলুন। ঘিরে রেখেছে তাকে বাচ্চারা।

যখন বোঝা গেল, 'মাননীয়' আর কেউ আসার নেই, ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়াল মেয়র। গম্ভীর ভঙ্গিতে টোকা দিল মাইক্রোফোনে, হাত তুলে ইশারা করল জনতাকে নীরব হওয়ার জন্যে।

লিলিকে দেখতে পেল কিশোর। মেয়েটার চোখে উৎকণ্ঠা, অধিকাংশ সময়ই যেমন থাকে।

'মাননীয় জনতা!' শোনা গেল মেয়রের খড়খড়ে কণ্ঠ।

সম্বোধনের কি ছিরি!—ভাবল কিশোর।

'মাননীয় জনতা!' আবার বলল মেয়র। 'দয়া করে থামুন আপনারা, চুপ করুন। আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হতে যাচ্ছে। প্রথমেই অনুরোধ করব,' পাদ্রীর দিকে ফিরে একবার মাথা ঝোঁকাল মেয়র, 'মিস্টার ডেভিড ব্যালার্ডকে। আমাদের নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্যে যেন দোয়া করেন তিনি। তারপর ব্যাণ্ড বাজাবে সেন্টারডেল হাইস্কুলের ছেলেরা, তোমরা। অনুষ্ঠান শেষে মার্চ করে এগোবে, পেছনে দল বেঁধে যাব আমরা। মিউজিয়ম ওপেন করবে আমাদের মিস লোটি হাম্বারসন।' থেমে জনতার ওপর চোখ বোলাল মেয়র। 'লোটি, তুমি কোথায়?'

'এই যে, এখানে!' ভিড়ের মধ্যে থেকে বলে উঠল একটা পুরুষকণ্ঠ। 'লোটি, যাও।'

সরে জায়গা করে দিল লোকে। এগিয়ে এসে মঞ্চে উঠল পাতলা একটা মেয়ে, এত রোগা, মনে হয় ফুঁ দিলেই উড়ে যাবে। মাথায় সোনালি চুল। সে মঞ্চে উঠলে চেঁচিয়ে স্বাগত জানাল জনতা।

হঠাৎ চালু হয়ে গেল পার্কের অটোমেটিক স্প্রিঙ্কলার সিসটেম, বৃষ্টির মত জনতার ওপর ঝরে পড়তে লাগল পানি।

শুরু হলো চেঁচামেচি, হই-হট্টগোল। ঠেলাঠেলি, হুড়াহুড়ি।

কিশোরের মুখে এসে লাগল পানির ছিটা, মাথা ভিজল, কাপড় ভিজল। মুসার দিকে ফিরল। তাকে অবাক করে দিয়ে হাঁটু ভাজ হয়ে পড়ে যেতে শুরু করল মুসা।

কি ঘটে পুরোটা দেখার সময় পেল না কিশোর, তার দেহও টলে উঠল। বোঁ করে উঠল মাথার ভেতর। মনে হলো শূন্যে ভেসে চলেছে সে, অনন্ত শূন্য, অসীম অন্ধকার।

শীত শীত লাগল। নড়েচড়ে উঠল কিশোর। ভেজা মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে সে। নাকে সুড়সুড়ে অনুভূতি: চোখ মেলে দেখল, একটা ঘাসের ডগা ঢুকেছে নাকে। থেমে গেছে স্প্রিঙ্কলার, পানি ছিটানো বন্ধ।

'উঁহুঁ!' গুঙিয়ে উঠল একটা পরিচিত কণ্ঠ।

ফিরে চেয়ে দেখল কিশোর, চোখ মেলছে রবিন। মুসা পড়ে আছে, মাথা ডাক্তার হ্যারিসনের কোমরে ঠেকে আছে।

বিড়বিড় গোঙানী, ফোঁসফোঁস, চিৎকার, নানারকম বিচিত্র শব্দ। একে একে হুঁশ ফিরছে জনতার।

ঢং ঢং করে বেজে উঠল গির্জার ঘণ্টা, সময় জানাচ্ছে।

চট করে ঘড়ি দেখল কিশোর। আরি! চল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে! এগারোটা বাজে! কোন অদ্ভুত কারণে পুরো চল্লিশটি মিনিট বেহুঁশ হয়ে ছিল পার্কের লোক।

স্প্রিঙ্কলার সিসটেম! বিড়বিড় করল কিশোর। গোলমালটা ওটাতেই। কোন রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল পানিতে, বেহুঁশ করার জন্যে।

পার্কের কিনারে চেঁচিয়ে কাঁদছে কয়েকটা বাচ্চা। বেলুনওয়ালার হাতে একটা বেলুনও নেই। গুচ্ছসহ উড়ে গেছে, আকাশের অনেক ওপরে বিন্দু হয়ে গেছে এখন

ওগুলো।

মাথা ঝাড়া দিয়ে মাথার ভেতরের ঘোলাটে ভাবটা দূর করার চেষ্টা করল কিশোর। টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়াল। রবিনকে উঠতে সাহায্য করল।

এই সময় ছুটে আসতে দেখা গেল জিপসি ফ্রেনিকে। যেন দিন-দুপুরে ভূতে ধরেছে!

'মিস্টার ম্যাকস্বার!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'মিস্টার ম্যাকস্বার। সর্বনাশ হয়ে গেছে! গুহামানব!···নেই! চলে গেছে!··· নিয়ে গেছে!'

নয়

একনাগাড়ে কয়েক ঘন্টা ধরে চলল সীমাহীন ব্যস্ততা।

শেরিফের লোকেরা ছবি তুলছে, সূত্র খুঁজছে, পাউডার ছিটিয়ে আঙুলের ছাপ নিচ্ছে। মিস্টার আর মিসেস ম্যাকস্বারের বক্তব্য রেকর্ড করছে টেলিভিশনের লোকেরা। কথা বলবে কি? রাগে, ক্ষোভে পাগল হয়ে গেছে ম্যাকস্বার। মাথার চুল ছিঁড়ছে, হাত-পা ছুঁড়ছে থেকে থেকেই।

ডাক্তার হ্যারিসনের সাক্ষাৎকার নিল রিপোর্টাররা। ম্যাকস্বারের মত এতটা না হলেও তিনিও অস্থির।

মেয়রের সাক্ষাৎকার নিল। এমনকি জিপসি ফ্রেনিকেও ছেঁকে ধরল টেলিভিশন আর খবরের কাগজের রিপোর্টাররা।

'কি জানি এল!' জানাল জিপসি। 'পাহারা দিচ্ছিলাম, মিস্টার ম্যাকস্বারের কথামত। পেছনে আওয়াজ শুনে ফিরে চাইলাম···আরিব্বাবা, দেখি কি, সাংঘাতিক এক জীব! একচোখা! এত বড় চোখ!···আর, হাতির মত দাঁত! মানুষ না, বুঝেছেন, মানুষ হতেই পারে না। তারপর আর কিছু মনে নেই। চোখ মেলে দেখলাম, মাটিতে পড়ে আছি। মিউজিয়ামের দরজা খোলা। ভেতরে ঢুকে দেখি, মড়াটা নেই! গায়েব!'

'বেশি টেনে ফেলেছে,' ভিড়ের ভেতর থেকে বলল একজন।

কিন্তু মদ স্পর্শও করেনি ফ্রেনি। আর গুহামানবের কঙ্কাল গায়েব, এটাও সত্যি।

সাক্ষাৎকার নিয়ে তাড়াহুড়ো করে চলে গেল রিপোর্টাররা।

দু-জন লোককে পাহারায় রেখে শেরিফও চলে গেল।

ধীরে ধীরে কমে এল জনতার ভিড়। যাকে দেখতে এসেছিল, সে-ই নেই, থেকে আর কি করবে?

ডেপুটি শেরিফের সঙ্গে কথা বলছে ম্যাকস্বার।

কাছাকাছিই ছিল তিন গোয়েন্দা, ভিড় কমলে এগোল মিউজিয়ামের দিকে।

'সরি, বয়েজ,' ছেলেদের দেখে বলল ডেপুটি শেরিফ। 'ভেতরে ঢুকতে পারবে না।'

ডাবলডোরের ফাঁক হয়ে থাকা পাল্লার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর,

'চাবি ছিল লোকটার কাছে, না? যে কঙ্কাল চুরি করেছে?'

বিস্ময় ফুটল ডেপুটির চোখে। চট করে তাকাল একবার খোলা দরজার দিকে।

'দরজায় কোন দাগটাগ নেই তো, তাই বলছি,' বুঝিয়ে বলল কিশোর। 'তারমানে, তালা কিংবা কব্জা ভেঙে ঢোকেনি চোর। তাহলে দাগ থাকতই।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল ডেপুটি শেরিফ, বোধহয় ভাবল ছেলেটার নজর বড় কড়া, গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু চোখে পড়ে যেতে পারে। তাই হেসে সরে দাঁড়াল। 'অল রাইট, শারলক হোমস। ভেতরে গিয়ে দেখার খুব ইচ্ছে? যাও, দেখে বলো আমাকে যা যা বোঝো।'

মিউজিয়ামের ভেতরে গিয়ে ঢুকল তিন গোয়েন্দা।

ভেতরের জিনিসপত্র যেমন ছিল, তেমনই আছে, নাড়াচাড়া বিশেষ হয়নি। তবে সব কিছুর ওপরই কালি আর পাউডারের আস্তর। ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টদের কাজ। আঙুলের ছাপ খুঁজেছে।

সারা ঘরে একবার চোখ বুলিয়ে, আলোকিত গুহার ভেতরে এসে উঁকি দিল কিশোর। এখানেও সব কিছু আগের মতই আছে, শুধু কঙ্কালটা নেই। ওটা যেখানে ছিল সেখানকার মাটিতে গর্ত, দাগ, এলোমেলো আলগা মাটি ছড়িয়ে আছে। এখানেই এক জায়গায় একটিমাত্র পায়ের ছাপ চোখে পড়ল, বিশাল ছাপ।

'রাবারসোল জুতো পরেছিল,' আনমনে বলল কিশোর। 'ম্যাকম্বারের ছিল কাউবয় বুট, আর জিপসি ফ্রেনির পায়ে লেইসড-আপ জুতো, চামড়ার সোল। চোরের পায়ে ছিল স্নীকার জাতীয় কিছু, সোল আর গোড়ালিতে তারা তারা ছাপ।'

মাথা ঝাঁকাল ডেপুটি। 'ঠিকই বলেছ। জুতোর ছাপের ছবি তুলে নেয়া হয়েছে। কাজে লাগতে পারে ভেবে।'

পকেট থেকে ফিতে বের করে ছাপ মাপতে বসল কিশোর। বারো ইঞ্চি। 'লম্বা লোক,' মন্তব্য করল সে।

হাসি ফুটল ডেপুটির মুখে। 'বাহ্, ভালই তো, কাজ দেখাচ্ছ। গোয়েন্দা হওয়ার ইচ্ছে?'

'হয়েই আছি,' ব্যাখ্যা করার দরকার মনে করল না কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল। কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। এত কষ্ট করে এত সব কাণ্ড করতে গেল কেন চোর? স্প্রিঙ্কলার সিসটেমে কেমিক্যাল ঢেলে দিয়ে ঘুম পাড়াল পুরো শহরকে…'

'ঠিকই বলেছ,' কথার মাঝে বলল ডেপুটি, 'মনে হয় কেমিক্যালই ঢেলেছে। পানির স্যাম্পল নিয়ে ল্যাবরেটরি টেস্টের জন্যে পাঠানো হয়েছে। পানির ট্যাংকও পরীক্ষা করা হবে। ওখান থেকেই স্প্রিঙ্কলারে পানি যায়।'

'সাইন্স ফিকশন সিনেমার মত লাগছে,' বলল কিশোর। 'পুরো শহরকে ঘুম পাড়িয়ে বিকট জন্তুর রূপ ধরে গিয়ে চড়াও হয়েছে জিপসি ফ্রেনির ওপর। তাকেও ঘুম পাড়িয়েছে কোনভাবে। কিংবা হয়তো পার্কের রাসায়নিক বাষ্পই বাতাসে ভেসে গিয়ে লেগেছে তার নাকে। যে ভাবেই হোক, বেহুঁশ হয়েছে। চোর তারপর আরামসে মিউজিয়ামে ঢুকে কঙ্কালটা তুলে নিয়ে চলে গেছে।

'এখন প্রশ্ন হলো, কেন? সাধারণ লোকের কাছে ওই হাড়ের কোন মূল্য নেই। দর্শকদের কাছ থেকে পয়সা আদায় করা যায়, তবে যেখানে যে অবস্থায় পাওয়া গেছে, সেভাবে থাকলে। ওই হাড়ের ওপর দু-জনের আগ্রহ বেশি। একজন হ্যারিসন, অন্যজন ম্যাকম্বার। কিন্তু চুরিটা যখন হয়, তখন দু-জনেই পার্কে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল।'

'সোনা চুরি যায়, অলঙ্কার চুরি যায়,' মুখ বাঁকাল ডেপুটি, 'কিন্তু হাড্ডি চুরি যেতে দেখলাম এই প্রথম।'

'কিশোর,' রবিন বলল, 'কি মনে হয়? চোরকে ধরতে পারবে?'

চুপ করে রইল কিশোর। ভাবছে।

রবিনের প্রশ্নের জবাব দিল ডেপুটি, 'অনেক চুরিরই সমাধান হয় না। রহস্য রহস্যই থেকে যায়। এটাও তেমনই কিছু হবে। পুরানো কয়েকটা হাড়ের পেছনে সময় নষ্ট করবে কে?...চলো, বেরোই। আর কিছু দেখার নেই।'

ডেপুটির পিছু পিছু বেরিয়ে এল ছেলেরা।

গোলাঘরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাকম্বার। কাছেই রয়েছে জেলডা আর লিলি। লিলির হাতে চিঠিপত্রের বাণ্ডিল আর একটা ম্যাগাজিন। এইমাত্র ডাকে এসেছে।

ম্যাকম্বারের হাতে একটা চিঠি। চেহারা থমথমে।

ডেপুটি আর ছেলেরা কাছে যেতেই নড়ে উঠল ম্যাকম্বার। চিঠিটা ডেপুটির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'পড়ুন! পড়ে দেখুন!' রাগে খসখসে হয়ে গেছে কণ্ঠস্বর।

চিঠিটা হাতে নিল ডেপুটি।

দেখার জন্যে কাছে ঘেঁষে এল ছেলেরা।

কাগজটায় উজ্জ্বল রঙে বড় বড় অক্ষরে ইংরেজিতে লেখাঃ

আমার কাছে আছে গুহামানব।
ফেরত চাইলে ১০,০০০ ডলার লাগবে।
টাকা না দিলে এমন জায়গায় লুকাব,
কোনদিনই আর খুঁজে পাবে না।
পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় থাকো।

'চারটে শব্দের বানান ভুল,' বিড়বিড় করল কিশোর। 'তবে একটা ব্যাপার শিওর হওয়া গেল, টাকার জন্যে চুরি করেছে ওই হাড়।'

দশ

'দশ হাজার!' চেঁচিয়ে উঠল লিলি।

নাক দিয়ে বিচিত্র শব্দ করল ম্যাকম্বার। 'হারামজাদাকে ধরতে পারলে...' দাঁতে দাঁত চাপল সে।

ম্যাকম্বারের কাছ থেকে খামটা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল ডেপুটি। ডাকঘরের ছাপ দেখল। নোটটা পড়ল আরেকবার।

'ব্যাটা ইংরেজিতে কাঁচা,' বলল সে। 'বানান ভুল দেখছ না। তবে ভেবেচিন্তে কাজ করে। চিঠি পোস্ট করে দিয়েছে গতকালই, সেন্টারডেল থেকে।' চিঠিটা পকেটে রাখল। 'মিস্টার ম্যাকস্বার, মিউজিয়ামের চাবি কার কাছে?'

পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে দিল ম্যাকস্বার। আরেক গোছা আছে রান্নাঘরের বোর্ডে ঝোলানো। লিলি, দেখ তো গিয়ে আছে কিনা।

বাড়ির দিকে চলে গেল লিলি। খানিক পরেই উত্তেজিতভাবে ফিরে এসে জানাল, নেই। 'চাবির রিঙে ট্যাগ লাগানো থাকে তো। চোরের বুঝতে অসুবিধে হয়নি...'

'কোনটা কোন তালার চাবি,' লিলির বক্তব্য শেষ করে দিল ডেপুটি। 'দরজা খোলা রেখেছিলেন, তাই না মিস্টার ম্যাকস্বার?' বিড়বিড় করে নিজেকেই যেন বোঝাল, 'রাখবেনই তো। এ শহরের সবাই রাখে। ঘরে ঢুকে চাবি বের করে আনতে কোন অসুবিধে হয়নি চোরের।'

খুব হতাশ হয়ে ঘরে ফিরল ম্যাকস্বার দম্পতি।

গোলাঘরের মাচায় চড়ে জানালার ধারে বসল তিন গোয়েন্দা।

'ভাবছি,' কিশোর বলল, 'চাবি যে রান্নাঘরে থাকে, চোর সেটা কিভাবে জানল?'

'সে-ই জানে,' বলল মুসা। 'তাছাড়া জানার দরকারই বা কি? লোকে রান্নাঘরেই চাবি রাখে বেশি। আর দরজাও যখন খোলা রাখে এখানকার লোকে...'

'সহজেই যে-কেউ ঢুকে নিয়ে যেতে পারে, এই তো? আরও একটা ব্যাপার বেশ অবাক লাগছে। গুহার মধ্যে জুতোর ছাপ।'

ভুরু কোঁচকাল রবিন। 'তাতে অবাক হওয়ার কি আছে? টেনিশ শূ কিংবা রানিং পরেছিল চোর। তাতে কি?'

'গতরাতে গুহার ভেতরে কি কি ছিল মনে আছে?' কিশোর বলল। 'ম্যাকস্বার যখন দেখাচ্ছিল আমাদেরকে?'

মুসা আর রবিন দু-জনেই অবাক হলো।

'হাড়ের আশপাশের মাটি মাড়ানো ছিল।' চোখ বন্ধ করে দৃশ্যটা মনে করার চেষ্টা করছে যেন কিশোর। 'তারপর, রাতে দুঃস্বপ্ন দেখল জিপসি ফ্রেনি। বলল, গুহা থেকে বেরিয়ে গেছে গুহামানব। ম্যাকস্বার মিউজিয়ামের দরজা খুলল। গুহার ভেতরে কঙ্কালটাকে জায়গামতই দেখলাম। তখন কি পায়ের ছাপ ছিল?'

ভ্রূকুটি করল দুই সহকারী গোয়েন্দা।

মুসা বলে উঠল, 'না না, ছিল না, ঠিক বলেছ। তারমানে...তারমানে, মুছে সমান করে ফেলা হয়েছিল।'

'আসছি।' মাচা থেকে নেমে প্রায় দৌড়ে গিয়ে ম্যাকস্বারের ঘরের সামনে দাঁড়াল কিশোর। দরজায় ধাক্কা দিল। জেলডা খুলল। পেছনে উঁকি দিল তার স্বামী। তাদের সঙ্গে কি যেন কথা হলো কিশোরের। আবার মাচায় ফিরে এল সে।

'ম্যাকস্বার বলল, সে মোছেনি,' জানাল কিশোর। 'জিপসিকে দিয়েও মোছায়নি।'

'তাহলে রাতে অন্য কিছু ঢুকে মুছে এসেছে,' বলল মুসা। 'কিভাবে? দরজায় তালা ছিল। যদি···যদি না কঙ্কালটা···অসম্ভব!'

'তবে, তৃণভূমিতে একটা ছাপ রেখে গেছে, যে-ই হোক,' কিশোর বলল। 'শহরে যাচ্ছি আমি। গতকাল আসার সময় একটা হবি শপ দেখেছি। কিছু জিনিস কিনে আনব। তোমরা এখানেই থাকো, চোখ রাখো।'

আবার মই বেয়ে নেমে চলে গেল কিশোর।

ফিরে এল আধ ঘণ্টা পর। হাতে একটা প্যাকেট। 'প্লাস্টার অভ প্যারিস,' বলল সে। 'পায়ের ছাপের একটা ছাঁচ তৈরি করব।'

গোলাঘরের ওয়ার্কবেঞ্চে বসে কাজ শুরু করল সে। ঘরেই পাওয়া গেল রঙের একটা খালি টিন আর কয়েক টুকরো বিভিন্ন মাপের কাঠ।

টিনে প্লাস্টার অভ প্যারিস ঢেলে তাতে পানি মিশাল কিশোর। ছোট একটা কাঠের দণ্ড ঘুঁটে ঘন কাঁইমত করল।

'কি প্রমাণ করবে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'জানি না,' জবাব দিল কিশোর। 'হয়তো কিছুই না। খালি পায়ে একজন লোক যে হেঁটে গিয়েছিল, আপাতত সেই প্রমাণ রাখব। পরে আর ছাপটা না-ও থাকতে পারে। নষ্ট হয়ে যেতে পারে, মুছে যেতে পারে, কত কিছুই হতে পারে।'

ছাপের ছাঁচ তুলতে চলল ওরা।

ওটার পাশে বসে কাজ করে চলল কিশোর।

'এত কষ্ট করে কি হবে বুঝতে পারছি না,' দেখতে দেখতে বলল মুসা।

'হ্যাঁ, কেউ তো আমাদের করতে বলেনি,' বলল রবিন। 'মক্কেল নেই। কিশোর, তোমার কি মনে হয়? ম্যাকম্বার আমাদেরকে ভাড়া করবে?'

'ওর মত লোককে কি মক্কেল হিসেবে পেতে চায় তিন গোয়েন্দা?' পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর।

'না, তা অবশ্য চায় না,' মুসা হাত নাড়ল। 'পাজি লোক। ওর বউটাও। ওই দুটোকে সহ্য করে কিভাবে লিলি, বুঝি না।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'হবি শপের মালিক মহিলা। লিলির মাকে চিনত। মিসেস অ্যালজেডো নাকি খুব সুন্দরী ছিলেন। জেলডা তাঁকে দেখতে পারত না। সেই শোধই নাকি নিচ্ছে এখন লিলির ওপর। ম্যাকম্বারও নাকি খুব বাজে ব্যবহার করে লিলির সঙ্গে, মহিলাই বলল। থাকাখাওয়ার টাকা পর্যন্ত নেয়। নিচ্ছে লিলির মা-বাবা মরার পর থেকেই।'

বিস্মিত হলো রবিন। 'তা কি করে হয়? তখন তো বয়েস ছিল মাত্র আট। টাকা দিত কোত্থেকে, কিভাবে? ব্যাংকে টাকা রেখে গিয়েছিলেন লিলির বাবা-মা?'

'হলিউডে একটা বাড়ি আছে ওদের। ওটা ম্যাকম্বারই ভাড়া দেয়, টাকাও সে-ই নেয়।'

'ও। কিন্তু হবি শপের মহিলার মুখ খোলালে কি করে? এত কথা জানলে।'

'সহজ। জানতে চাইল, আমরা কোথায় উঠেছি। ম্যাকম্বারের মাচার কথা শুনেই গেল রেগে। আমাকে আর প্রশ্ন করতে হলো না। নিজে নিজেই অনেক কিছু

বলল। বলল, জিপসি ফ্রেনি লেখাপড়া জানে না। মহিলার সন্দেহ, কোন বেআইনী কাজ করে জিপসি। সেটা জানে ম্যাকস্বার। আর তাই সুযোগ পেয়ে বিনে পয়সায় খাটিয়ে নিচ্ছে লোকটাকে।'

'তবে চিঠিটা জিপসি লেখেনি, এটুকু শিওর হওয়া গেল। লিখতেই তো নাকি জানে না।'

'কাউকে দিয়ে লিখিয়ে তো নিতে পারে। তবে মনে হয় না তা করেছে। এত চালাক না সে। আজ সকালে যা করল, সেটাও অভিনয় মনে হয়নি। সত্যি ভয় পেয়েছিল। তাকে সন্দেহের খাতা থেকে বাদ দিচ্ছি।'

'তারমানে কেসটা নিচ্ছি আমরা?' মুসার প্রশ্ন, 'আমাদের মক্কেল কে? লিলি?'

'মক্কেল কি থাকতেই হবে?' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আমাদের কাজ হলো রহস্যের কিনারা করা। অনেক রহস্য আছে এখানে। ফসিল চুরি গেল। স্প্রিঙ্কলার সিসটেমে ওষুধ ঢেলে সারা শহরকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হলো। কোনো গোয়েন্দার আগ্রহ জাগাতে এ-ই কি যথেষ্ট নয়?'

রবিন হাসল। 'যথেষ্টর চেয়েও বেশি।' পকেট থেকে নোটবুক আর কলম বের করে লিখতে শুরু করল। মুখে বলল, 'গুহামানব চুরি। পানিতে রহস্যময় ওষুধ। মুক্তিপণের টাকা চেয়ে চিঠি, লেখায় বানান ভুল। তবে সেটা ইচ্ছে করেও করে থাকতে পারে, বিশেষ কারও ওপর সন্দেহ ফেলার জন্যে।' মুখ তুলল হঠাৎ। 'হ্যারিসন? কঙ্কালটা হয়তো তিনিই চুরি করেছেন। তারপর মুক্তিপণের টাকা চেয়ে নোট পাঠিয়েছেন চুরির উদ্দেশ্য অন্যরকম বোঝানোর জন্যে।'

'চুরিটা যখন হয়,' মুসা মনে করিয়ে দিল, 'তখন তিনি আমার পাশে বেহুঁশ হয়েছিলেন। আমার পরে ঘুম ভেঙেছে তাঁর। কাকে সন্দেহ করব? পুরো শহরই তো তখন পার্কে ঘুমিয়েছিল।'

'সবাই যে ছিল অনুষ্ঠানে, শিওর হচ্ছি কি করে?' প্রশ্ন রাখল কিশোর। 'এত লোকের মধ্যে থেকে কোন একজন সহজেই সরে পড়তে পারে।'

'চুপ,' সাবধান করল রবিন। 'লিলি আসছে।'

ফিরে দেখল কিশোর, মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে আসছে মেয়েটা। তাড়াতাড়ি জিনিসপত্রগুলোকে আড়াল করে বসল সে, ছাঁচটা যাতে লিলির চোখে না পড়ে। ও এলে হেসে বলল, 'এই যে, আপনিও এসেছেন।...আমরা চুরির ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম।'

মাথা ঝাঁকাল লিলি। এখানে আনাহূত কিনা বোঝার চেষ্টা করল। চোখে সেই চিরন্তন অস্বস্তি। বসল তিন গোয়েন্দার দিকে মুখ করে। 'আমি সেন্টারে যাচ্ছি। ভাবলাম, তোমরাও যদি আসো...দেখতে চাও...'

'গেলে তো ভালই হয়,' কিশোর বলল। 'কিন্তু...'

'ইচ্ছে না থাকলে এসো না,' বাধা দিয়ে বলল লিলি। 'ভাবলাম, হয়তো বসে বসে বিরক্ত হচ্ছ, কিছু করার নেই...' সামান্য উসখুস করে বলল, 'আসলে...দশ হাজার ডলার। অনেক টাকা। আংকেল ম্যাকস্বার কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করেছেন, কিভাবে জোগাড় করা যায়...'

'এত ভাবনার কিছু নেই তার,' রবিন বলল। 'জ্যান্ত মানুষ ধরে নিয়ে গিয়ে তো আর জিম্মি করেনি।'

'না, তা করেনি। তবে ভীষণ খেপে গেছে আংকেল। আমার ভয় করছে। তার অনেক টাকার ক্ষতি। সবার সঙ্গে দুর্ব্যবহার শুরু করেছে।'

'কিন্তু আপনার তো কোন দোষ নেই,' বলল কিশোর।

'দোষটা টাকার। অনেক টাকা আসত কঙ্কালটা দেখাতে পারলে। হার্ডওয়্যারের দোকান থেকে তার একআনাও আসে না।'

'দোকানে যান নাকি?'

'যাই, যখন সেন্টারে কাজ থাকে না। বেচাকেনায় সাহায্য করি। তবে বাধ্য হয়ে যেতে হয়, ভাল লাগে না একটুও। ভাল লাগে সেন্টারে কাজ করতে। সেখানে কেউ গালমন্দ করে না। ডাক্তার হ্যারিসন মাঝে মাঝে চেঁচায়,' হাসি ফুটল লিলির ঠোঁটে, 'তবে তাতে মনে করার কিছু নেই। ডাক্তারের স্বভাবই ওরকম। এমনিতে খুব ভাল মানুষ। আমাকে প্রায়ই বলে আমার কলেজে ভর্তি হওয়া উচিত, স্যান ডিয়েগোতে, অথবা অন্য কোথাও।'

'ঠিকই তো। হন না কেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'সেখানে যেতে গাড়ি লাগে। কোথাও পাব? জেলডা আন্টিকে একদিন বলেছিলাম, সোজা মানা করে দিয়েছে। মেয়েমানুষের বেশি পড়ে নাকি লাভ নেই, অযথা টাকা নষ্ট। তাছাড়া, আমার মায়ের পরিণতির কথাও নাকি আমার মনে রাখা উচিত।'

'মানে?' মুসার প্রশ্ন।

'মানে, কলেজে গেলেই নাকি নাক উঁচু স্বভাবের হয়ে যায় মেয়েরা। বেশি লেখাপড়া শিখে আমার মা-ও নাকি এমন হয়েছিল। এই শহরে আর মন টেকেনি। চলে গিয়েছিল বড় শহরে। আমার বাবাকে বিয়ে করেছিল। আর সেজন্যেই নাকি কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে ওরা।'

'গরু নাকি মহিলা!' ফস করে বলে ফেলল মুসা।

'আচ্ছা, তোমরাই বলো,' চোখ ছলছল করছে লিলির, 'এটা কোন কথা হলো? এ শহরে থাকলেই যে কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা যেত না, তার কোন গ্যারান্টি আছে? আর বলে কিনা, কলেজে গেলে উন্নাসিক হয়। আমি তো দেখেছি আমার মাকে, কত ভাল ছিল। সুন্দরী ছিল। আমার বাবাও ভাল ছিল। খুব সুন্দর শানাই বাজাত। শানাই খুব ভাল লাগে আমার। এখানে তো টিভি আর রেডিও ছাড়া কিছুই নেই। ভাল মিউজিক শোনার উপায় নেই।'

থেমে দম নিল লিলি। তারপর আবার বলল, 'আমি এখান থেকে পালাতে চাই। টাকা জমাচ্ছি। সেন্টারে চাকরি করে যা পাই, তা থেকে। একশো ডলার জমিয়েছি। হলিউডে যে বাড়িটা আছে, সেটার ভাড়া তো আংকেলই নিয়ে যায়, আমার থাকা-খাওয়ার খরচ বাবত।'

'কত ভাড়া আসে, জিজ্ঞেস করেছেন কখনও?' কিশোর বলল। 'সব টাকা লাগে আপনার খাওয়ায়? আপনি এখান থেকে চলে গেলে তো বাড়িভাড়ার

কানাকড়িও পাবে না আপনার আংকেল।'

অবাক মনে হলো লিলিকে। 'কিন্তু আমি তো সেটা করতে পারব না। ভীষণ রেগে যাবে ওরা। আমাকে আর জায়গা দেবে না।'

'কি হবে তাতে?' মুসা বলল 'বাড়ি ভাড়ার টাকা দিয়েই তো আপনি চলতে পারবেন।'

'বলছি বটে পালাব, কিন্তু কোথায়, সেটাও ভাবি। যাওয়ার কোন জায়গা নেই আমার।'

'কেন, হলিউডে চলে যাবেন,' পরামর্শ দিল রবিন। 'আপনার নিজের বাড়িতে।'

'তা কি করে হয়? ওটাতে লোক থাকে। তারা যাবে কোথায়?' উঠে দাঁড়াল লিলি। 'ওখানে যেতে পারব না। আগে টাকা জমাই, তারপর দেখি কোথায় যাওয়া যায়।...তা তোমরা আসবে নাকি? যাবে সেন্টারে?'

'আপনি যান,' বলল কিশোর। 'গোলঘরে যেতে হবে আমাদের। কয়েকটা জিনিস নিয়ে, তারপর আসছি।'

লিলিকে চলে যেতে দেখল ছেলেরা।

'পালানোর সাহস আছে ওর?' মুসা বলল।

'কি জানি,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'এখানে থাকতেও চায় না, আবার অচেনা জায়গায় যেতেও ভয়।'

ছাঁচ তোলার কাজটা শেষ করতে বসল সে।

তৈরি হয়ে গেল ডান পায়ের চমৎকার একটা প্রতিকৃতি।

'দারুণ হয়েছে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'হুমম্,' দেখতে দেখতে আপনমনে মাথা দোলাল কিশোর। 'গুহামানবের পায়ে গণ্ডগোল ছিল।...দেখো, এই যে বুড়ো আঙুল। তারপর অনেক ফাঁক। এর পরে বাকি তিনটে আঙুল। মাঝের দ্বিতীয় আঙুলটা গেল কই? বুড়ো আঙুল আর বাকি তিনটের চাপে পড়ে ওপরে উঠে গিয়েছে। ছাপ পড়েনি মাটিতে।'

'গুহামানবের ছাপ!' অবাক হয়েছে রবিন।

'ঠিক মানাচ্ছে না, না? জুতো ঠিকমত পায়ে না লাগলে এবং সেই জুতো অনেক দিন পরলেই কেবল আঙুলের এ রকম গোলমাল হয়।'

ফিতে বের করে ছাঁচটা মাপল কিশোর। 'নয় ইঞ্চি।'

'মিউজিয়ামে চোর যে ছাপ রেখে গেছে, সেটা অনেক বড়,' বলল সে। 'এটা ছোট।'

ঢোক গিলল মুসা। 'তারমানে বলতে চাইছ, এটা গুহামানবের?'

'গুহামানব মরা,' বলল কিশোর। 'অনেক বছর আগে মরেছে। আর মরা মানুষ কখনও উঠে হাঁটে না। এই ছাপটা আর যারই হোক, মরা মানুষের নয়।'

এগারো

আস্তাবলে পাওয়া গেল লিলিকে, ঘোড়ার যত্ন নিচ্ছে। বিল উইলিয়ামও আছে সেখানে, একটা স্টলে হেলান দিয়ে কাজ দেখছে।

'চুরির খবর শুনলাম,' তিন গোয়েন্দাকে দেখে বলল বিল। 'আমার কপাল খারাপ, এমন একটা অনুষ্ঠান মিস করেছি। সর্দিতে কাহিল হয়ে শুয়েছিলাম বাড়িতে।'

'তাই নাকি?' বলল কিশোর। 'এখন কেমন?'

'অনেকটা ভাল। এসব অসুখ বেশিক্ষণ থাকে না।'

'পার্কে যা-তা কাণ্ড হয়ে গেল,' মুসা বলল। 'পৌনে এক ঘন্টা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল সবাই।'

'ঘুম পেয়েছিল, কি আর করবে?' রসিকতার সুরে বলল বিল। লিলির দিকে চেয়ে বলল, 'বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলো। আমি যাই।' নীরবে চলে গেল সে, রবারসোল জুতোয় শব্দ হলো না।

'রানিং শু পরেছে,' নিচু গলায় বলল মুসা।

'অনেকেই পরে,' লিলি বলল।

ঘোড়ার গা ডলা শেষ করল সে। আস্তাবল থেকে বেরিয়ে ল্যাবরেটরির দিকে রওনা হলো।

সঙ্গে চলল তিন গোয়েন্দা।

ডাক্তার কুডিয়াসের ল্যাবরেটরিতে ঢুকল ওরা। লিলিকে দেখে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল শিম্পাঞ্জী দুটো, খাঁচার ভেতরে লাফালাফি শুরু করল।

'আরে থাম, থাম,' হাসতে হাসতে বলল লিলি। খুলে দিল খাঁচার দরজা। দুই লাফে বেরিয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল শিম্পাঞ্জী দুটো।

'হয় ওদের মানুষ হওয়া উচিত ছিল, কিংবা আপনি শিম্পাঞ্জী,' হেসে বলল মুসা।

'খুব ভাল ওরা, তাই না? কি মিষ্টি। আমাকে খুব ভালবাসে। ডাক্তার কুডিয়াসকেও আরও ভালবাসত।'

'না বাসলেই বরং অবাক হতাম,' রবিন বলল।

কিশোর কিছুই বলছে না। মরহুম বিজ্ঞানীর ডেস্কের কাছে দাঁড়িয়ে টেবিলের জিনিসপত্র দেখছে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকটা চোখে পড়ল তার। খুলে পাতা ওল্টাতে লাগল। এক জায়গায় এসে আটকে গেল দৃষ্টি।

একটা পাতায় ছাপা রয়েছে, এপ্রিল ২৮। পরের পৃষ্ঠাটায় মে ১৯। মাঝখানের এতগুলো পাতা গায়েব।

'বিশটা পৃষ্ঠা নেই,' বিড়বিড় করল কিশোর। 'ইনটারেসটিং। আচ্ছা, মে-র শুরুতে কি মারা গিয়েছিলেন ডাক্তার কুডিয়াস?'

আরেকদিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে লিলি। 'ইয়ে...মে-রই কোন একদিন,'

জোর নেই কণ্ঠে।

'পাতাগুলো ছিঁড়ল কেন?'

'আ-আমি জানি না,' একটা শিম্পাঞ্জীকে বাহুতে নিয়ে দোলাচ্ছে লিলি, মানুষের বাচ্চাকে যেভাবে দোলায় মা।

রবিন আর মুসা চেয়ে আছে তার দিকে, সতর্ক, কৌতূহলী দৃষ্টি।

'সেদিন রকি বীচে ডাক্তার কুডিয়াসের সঙ্গে কেন গিয়েছিলেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'তার সঙ্গে এই ছেঁড়া পাতার কোন সম্পর্ক আছে?'

'না।...আমার মনে হয় না।'

'শিম্পাঞ্জীর কোন ব্যাপার?'

'হতে পারে। তাঁর কাজকর্মের ব্যাপারে তেমন কিছু জানতাম না, শুধু জানোয়ারগুলোকে দেখাশোনা করতাম। সঙ্গে গিয়েছিলাম, কারণ...কারণ তিনি ভাল বোধ করছিলেন না।'

'হারবারভিউ লেনের কোথায় যেতে চাইছিলেন? কে থাকে ওখানে?'

লিলির চোখে অস্বস্তি বাড়ল। কেশে গলা পরিষ্কারের চেষ্টা করল অযথা। দু-গালে অশ্রুধারা।

'আজ আমার ভাল্লাগছে না,' অবশেষে বলল সে। 'কিছু মনে কোরো না। তোমরা আজ যাও।'

ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে এল ছেলেরা। ওয়ার্করুমে দেখা হলো মিসেস গ্যারেটের সঙ্গে। ছাপার পোশাকের ওপরে দোমড়ানো একটা অ্যাপ্রন পরেছে। মাথায় উইগ—কালো চুলের মাঝে সাদা একটা রেখা।

'সব ঠিক আছে তো?' হেসে জিজ্ঞেস করল মহিলা।

কিশোরের মনে হলো, বেশি কথা বলা এবং বেশি মিশুক যেহেতু, নিশ্চয় মূল্যবান তথ্য জানাতে পারবে মিসেস গ্যারেট। চেহারাটাকে বিষণ্ন করে তুলল চোখের পলকে। 'লিলির মন খারাপ করে দিয়ে এসেছি। ডাক্তার কুডিয়াসের কথা তুলেছিলাম। কাঁদতে আরম্ভ করল।'

আফসোসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মহিলা। 'ডাক্তারকে খুব ভালবাসত। আমরা সবাই বাসতাম। ভাল লোক ছিল।'

'লস অ্যাঞ্জেলেসে সেদিন কেন গিয়েছিল, জানেন? মারা গেল যেদিন। কোন আত্মীয় থাকে ওখানে?'

'জানি না। কথা খুব কম বলত তো, কিছু জানার উপায় ছিল না। আমার মনে হয়, জানোয়ারগুলোর ব্যাপারে কোন কিছু। যা কাণ্ড করত না ওগুলোকে নিয়ে। সন্তানের মত ভালবাসত। কোনটা মরে গেলে দিনের পর দিন শোক করত।'

'কটা মরেছে?'

'অনেকগুলো। লাশগুলো কেটে-চিরে দেখত ডাক্তার। জ্যান্ত জানোয়ারের অপারেশনও করত। ওগুলো যখন ঘুমিয়ে থাকত, প্রায়ই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত।' কি যেন ভাবল মিসেস গ্যারেট। 'ওগুলো তখন ঘুমাতোও কেন জানি খুব বেশি। এখন অনেক সজীব হয়েছে।'

ঝনঝন করে কি যেন ভাঙল হলরুমে।

'হায়, হায়, কি ভাঙল।' দরজার কাছে ছুটে গেল মহিলা। 'আরে বিলি। হাতে জোর নেই?'

বেরিয়ে এল বিল উইলিয়ামস। এক হাতে ঝাড়ু, আরেক হাতে ভাঙা সাদা একটা ডিশ জাতীয় পাত্র। 'তেমন কিছু নষ্ট করিনি। খালিই ছিল।'

'খালি ছিল বলে দাম নেই নাকি? আরও হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করবে।'

ছেলেদের দিকে আলতো মাথা নুইয়ে হাঁটতে শুরু করল বিল।

'মার্কেট থেকে ওগুলো কখন আনবে?' পেছন থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল মিসেস গ্যারেট।

'আমি এখন পারব না!' চেঁচিয়েই জবাব দিল বিল। 'এত ক্যাট ক্যাট করে!' চলে গেল দরজার বাইরে।

নাকমুখ কুঁচকে বিচিত্র শব্দ করল মহিলা।

বাইরে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

ড্রাইভওয়েতে পার্ক করা আছে একটা পুরানো দুই-দরজার সিডান গাড়ি। তাতে উঠছে বিল। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে অপেক্ষা করল। ছেলেরা কাছে এলে বলল, 'বুড়ি হলে মেয়েমানুষগুলো একেকটা শয়তান হয়ে যায়,' বাঁকা হাসল সে। ছেলেদেরকে লিফট দিতে চাইল।

'থ্যাংকস,' বলল কিশোর। 'ওদিকে যেতে চাই না।' দেখল, পেছনের সীটে গাদাগাদি হয়ে আছে ম্যাগাজিন, কাদামাখা বুটজুতো, দোমড়ানো একটা কাগজের বাক্স, একটা স্কুবা মাস্ক, আর একটা ওয়েট স্যুট।

মাথা ঝাঁকিয়ে, গাড়ি নিয়ে চলে গেল বিল।

'বড় বেশি আজেবাজে কথা বলে,' তিক্ত কণ্ঠে বলল মুসা। 'একজন মহিলাকে শ্রদ্ধা করতে জানে না। ওর মা বুড়ো হয়নি?'

'হুঁ!' মুসার কথা কিশোরের কানে গেছে বলে মনে হলো না। খানিক আগে মিসেস গ্যারেটের সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে, সেগুলো নিয়ে ভাবছে।'

'ডাক্তার কুডিয়াস এতটা চাপা স্বভাবের না হলে ভাল হত,' অবশেষে বলল সে। 'রকি বীচে কেন গিয়েছিলেন, মিসেস গ্যারেটকে একথা বললে, আমরা জানতে পারতাম। পেটে কথা থাকে না মহিলার। ওদিকে লিলি হয়েছে উল্টো। কথাই বের করা যায় না তার কাছ থেকে। আমি শিওর, লিলি অনেক মিথ্যে কথা বলেছে। কেন? কি গোপন করছে?'

'গুহামানব সম্পর্কে কিছু?' রবিন বলল।

'কে জানে?'

গোলাঘরের কাছে পৌঁছে জেলডাকে পেছনের বারান্দায় দেখল কিশোর।

গোলাঘরের দিকে চলল ওরা।

ওখানে পৌঁছে জেলডাকে দেখা গেল তার বাড়ির পেছনের বারান্দায়।

ছেলেদের দেখেই চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'লিলিকে দেখেছ?'

'দেখেছি,' জবাব দিল রবিন। 'সেন্টারে।'

'হুঁম। হতচ্ছাড়া জানোয়ারগুলোর কাছে। সুযোগ দিলে এই ঘরের মধ্যেই এনে তুলত ওগুলোকে। সাফ বলে দিয়েছি, ভাড়া দিতে না পারলে এখানে কারও জায়গা হবে না।'

'তা-তো নিশ্চয়ই,' মোলায়েম স্বরে বলল কিশোর। 'আচ্ছা, ম্যাডাম, স্প্রিঙ্কলার সিসটেমের পানি যে নিয়ে গেছে পরীক্ষা করতে, করেছে? কোন খবর এসেছে? কিছু পাওয়া গেছে?'

'পাওয়া যায়নি। ট্যাংকের পানিতেও না, স্প্রিঙ্কলারেও না! শেরিফ তো অবাক। বলল, সারা শহর নাকি পাইকারী সম্মোহনের শিকার হয়েছিল।'

বারো

জেলডা ম্যাকস্বার ভেতরে চলে যেতেই চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ছাড়ল কিশোর। 'পাইকারী সম্মোহনে আমার বিশ্বাস নেই। মরহুম বিজ্ঞানীও অস্থির করে তুলেছে আমাকে।'

'মরা মানুষেরা অস্থির করেই,' মুসা বলল। 'সেজন্যেই তো ওদের কাছে ঘেঁষতে নেই···'

'সে কথা বলছি না। আমি ভাবছি ছেঁড়া পাতাগুলোর কথা। নিশ্চয় মূল্যবান কিছু ছিল ওগুলোতে। ইস্, ডাক্তার ক্লুডিয়াসের অফিসের কাগজপত্র আর কয়েকটা ফাইল যদি পড়তে পারতাম।'

'পারবে না,' রবিন নিরাশ করল। 'মূল্যবান কাগজপত্র আলমারিতে তালা দিয়ে রাখাই স্বাভাবিক।'

'হুঁ,' বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। তারপর উজ্জ্বল হলো চোখের তারা। 'বিল কিন্তু আজ পার্কে যায়নি, সকালে। ওই সময়ে শহরের আর কে কে অনুপস্থিত ছিল?'

রবিনের কপালে ভাঁজ পড়ল। 'আমাদের চেনা সবাইই তো ছিল···শুধু, বিল আর জিপসি ফ্রেনি বাদে।'

'আচ্ছা, জিপসিকে বাদ দিচ্ছি কেন আমরা?' মুসা বলল। 'ওর কথা ভাবছি না কেন? হয়তো বোকা সেজে থাকা তার একটা ভান।'

'না,' মাথা নাড়ল রবিন। 'অনেক বছর ধরে আছে সে এখানে। ফন্দিবাজ হলে অনেক আগেই লোকের চোখে পড়ত।'

'আমারও তাই মনে হয়,' কিশোর একমত হলো। 'গতরাতে কাউকে সত্যি সত্যি দেখেছে সে। তার প্রমাণও পেয়েছি আমরা। পায়ের ছাপ। লোকটা কোথায় গেল, দেখা হলো না কিন্তু।'

মাঠের ওপারে বনের দিকে তাকাল মুসা। 'চলো না, গিয়ে দেখি এখন।'

ছাপটার কাছে এল ওরা প্রথমে। তারপর সোজা হাঁটতে লাগল। বনের মধ্যে এক জায়গায় খোলা মাটি পাওয়া গেল, নরম। পায়ের ছাপও মিলল সেখানে।

সাবধানে এগিয়ে চলেছে তিন গোয়েন্দা। ভয়, যেন গাছের আড়ালে ঘাপটি

মেরে আছে বিপদ।

অবশেষে পাতলা হয়ে এল বন। বনের কিনারে এসে দাঁড়াল ওরা। সামনে আবার তৃণভূমি আর বৈঁচিঝোপ। পুরানো একটা ভাঙা বিল্ডিং দেখা গেল। দেয়ালের লাল ইঁটের পাঁজর বেরিয়ে পড়েছে এখানে সেখানে, কোথাও কোথাও ধসে পড়েছে। লাল টালির ছাতের বেশির ভাগটাই ধসা। থামের মাথা বেরিয়ে আছে।

'গির্জা ছিল,' অনুমান করল রবিন।

জবাব দিল না কেউ।

বাড়িটার দিকে এগোল ওরা।

বিশাল কাঠের দরজার একটা পাল্লা কব্জা খুলে পড়ে গেছে, আরেকটা আছে জায়গামত। পড়ে থাকা পাল্লাটা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা।

'গুহামানব গতরাতে এখানেই ঢুকেছিল?' প্রশ্ন করল মুসা।

'কি করে বলি,' চিহ্ন খুঁজছে কিশোর। 'কোন চিহ্নটিহ্ন তো দেখছি না।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে গির্জার সামনের দিকে এগোল রবিন। একধারে খানিকটা উঁচু জায়গা, দুটো সিঁড়ি ডিঙিয়ে উঠতে হয়।

'মঞ্চ,' বলল রবিন। 'দেখো, ওই যে আরেকটা দরজা। ঘর আছে। ভেস্ট্রি হতে পারে, পাদ্রীরা তাদের আলখেল্লা বোধহয় ওখানেই রাখত।'

দাঁড়িয়ে আছে ছেলেরা। মাত্র দুটো সিঁড়ি ডিঙানোর সাহস নেই যেন। নীরবে চেয়ে আছে দরজাটার দিকে। কি আছে ওপাশে?'

একটা শব্দ শোনা গেল। হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হয়ে গেল ওদের।

দরজার ওপাশে কে জানি নড়ছে।

মড়মড়, খসখস আওয়াজ। ঝমঝম করে কি যেন পড়ল।

তারপর আবার নীরবতা।

এক পা পিছিয়ে গেল মুসা। বিপদ দেখলেই ঘুরে দেবে দৌড়।

সাহস দেখাল রবিন। পা বাড়াল সিঁড়িতে ওঠার জন্যে। খপ করে তার হাত চেপে ধরল মুসা। 'যেয়ো না!' ফিসফিস করে বলল। 'হয়তো ওটাই···'

কোন্‌টা, খুলে বলার দরকার হলো না, বুঝল রবিন। গুহামানবের কথা বলছে মুসা। তার ধারণা, গুহা থেকে জ্যান্ত হয়ে উঠে চলে এসেছে ওটা।

'অসম্ভব!' নিচু গলায় বলল কিশোর। এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। উঠল উঁচু জায়গাটায়। হাত রাখল দরজার নবে।

শিউরে উঠল হঠাৎ। সে ঘোরানোর আগেই ঘুরতে শুরু করেছে দরজার নব। গুঙিয়ে উঠল মরচে ধরা কব্জা, খুলতে শুরু করল পাল্লা!

তেরো

'আরে, তোমরা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন ডাক্তার রেডম্যান। 'খুব চমকে দিয়েছ যা হোক। এখানে কি করছ?'

কাঁপছে তখনও কিশোর। জোর করে হাসল। 'এই একটু ঘুরে দেখতে

এসেছি।'

ঠিকই আন্দাজ করেছে রবিন। ওটা ভেস্ট্রিরুমই। তারপরে গির্জার হল। সব শেষে আরেকটা ছোট ঘরের পরে বেরোনোর দরজা। খোলা। দেখা যাচ্ছে মঞ্চ থেকেই।

'আসা উচিত হয়নি,' বললেন ডাক্তার। 'এটা প্রাইভেট প্রোপার্টি। ওয়ারনারদের সম্পত্তি। পাহাড়ের ওদিকে বিরাট বাড়ি আছে ওদের। অনুমতি নিয়ে আমি এসেছি। বাইরের কারও আনাগোনা এখানে পছন্দ করে না ওরা।' সিঁড়ির ওপর বসলেন তিনি। 'তবে, তোমাদের দোষ দেয়া যায় না। এ-বয়েসে আমিও ওরকম ছোঁক ছোঁক করতাম। পুরানো বাড়ির কত ভাঁড়ার আর চিলেকোঠায় যে চুরি করে ঢুকেছি।'

জোরে হাঁচি দিলেন ডাক্তার। নাক টানলেন। পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক চোখ মুছে বললেন, 'ইস্, হতচ্ছাড়া এই সর্দি আর গেল না। অ্যালার্জি আছে আমার। আর এটাই আমাকে ইমিউনিটির ব্যাপারে আগ্রহী করেছে।' উঠে দাঁড়ালেন। 'যাওয়া দরকার। শরীরটা ভাল লাগছে না। শহরে যাবে, নাকি আরও ঘোরাঘুরি করবে? তবে করাটা উচিত হবে না। বুড়ো ওয়ারনার পছন্দ করে না এ সব। একটা শটগান আছে, দেখলেই ওটা নিয়ে তাড়া করে লোককে। বিশেষ করে তোমাদের বয়েসী ছেলেদের।'

'শটগান আরও একজনের আছে,' হেসে বলল কিশোর। 'জবাব কিংসলে ম্যাকস্বারের।'

'চলো, ফিরেই যাই,' মুসা বলল।

ডাক্তার রেডম্যানের সঙ্গে বেরিয়ে এল ওরা।

'অ্যালার্জির ব্যাপারে আগ্রহ?' বুনোপথ ধরে চলতে চলতে বলল কিশোর। 'কিন্তু আপনি তো ইমিউনোলজিস্ট। অ্যালার্জি বিশেষজ্ঞদের অ্যালির্জিস্ট বলে না? তাই তো জানি।'

'ঠিকই জানো। তবে একটার সঙ্গে আরেকটার যোগাযোগ আছে। ইমিউনিটিও একধরনের অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন।'

'তাই নাকি?' রবিন বলল।

মাথা ঝাঁকালেন ডাক্তার। 'আমাদের শরীর নিজেকে বাঁচানোর জন্যে নানারকম উপায় করে রেখেছে। প্রয়োজনে অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারে। ওই অ্যান্টিবডি ক্ষতিকারক ভাইরাস আর ব্যাকটেরিয়া নষ্ট করে দেয়। ধরো, তোমার হাম হলো। তখন তোমার শরীরের ভেতরে অ্যান্টিবডি তৈরি হবে, ওই রোগের জীবাণুর সঙ্গে লড়াই করার জন্যে। রোগ সেরে যাওয়ার পরেও ওই অ্যান্টিবডির খানিকটা তোমার শরীরে থেকেই যাবে। ফলে সহজে আর হাম হবে না।

'কিংবা ধরো, বিশেষ কোন কিছুতে তোমার অ্যালার্জি আছে। এই, কোনধরনের ফুলের রেণুতে। ওসবের সংস্পর্শে এলেই প্রতিক্রিয়া হবে তোমার শরীরে, অ্যান্টিবডি তৈরি শুরু হবে। যেহেতু কোন জীবাণু পাবে না নষ্ট করার মত, রিঅ্যাকশন করে বসবে তখন ওই অ্যান্টিবডি। একধরনের রাসায়নিক দ্রব্য বেরোতে

থাকবে, যাকে বলে হিসটামিন। হয়তো তখন নাক ফুলে যাবে তোমার, চোখ দিয়ে পানি পড়বে।

'শরীরের এই ইমিউন সিসটেমই অনেক রকম ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে রাখে আমাদের। তবে কখনও কখনও এই সিসটেম শারীরিক ক্ষমতার আওতার বাইরে চলে যায়। আর তখনই দেখা দেয় বিপদ। নানারকম মারাত্মক অসুখ দেখা দেয়।

'যেমন, গেঁটে বাত। সর্দি-কাশি। আজকাল বলা হয়ে থাকে, ক্যানসার নাকি ইমিউন রিঅ্যাকশনের জন্যেই হয়ে থাকে। তবে সেটার প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি।...এমনকি, ইমিউনিটিই মানুষের মাঝে অপরাধ প্রবণতা জাগিয়ে তোলার জন্যে দায়ী।'

'অপরাধ প্রবণতা?' প্রতিধ্বনি করল যেন মুসা।

'অনেক সময় ভয়ের প্রতিক্রিয়া থেকে জন্ম নেয় অপরাধ,' ব্যাখ্যা করলেন ডাক্তার। 'ধরো, কোন বিপজ্জনক জায়গায় বেড়ে উঠছে একজন মানুষ। সারাক্ষণ ভীতির মাঝে কাটাতে হয় তাকে। ফলে শরীরে গড়ে ওঠে ভয়কে রোধ করার বিশেষ ব্যবস্থা। স্বভাব বদলে যায় মানুষটার। অনেকটা বুনো জানোয়ারের মত হয়ে ওঠে। নিজেকে বাঁচানোর তাগিদে আক্রান্ত হওয়ার আগেই আক্রমণ করে বসে।' গম্ভীর হয়ে গেছেন রেডম্যান। 'শরীরের এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা আমাদের জন্যে খুবই দরকারী, আবার মস্ত বড় হুমকিও বটে। ল্যাবরেটরিতে ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা চালাচ্ছি আমি। ওগুলোর ইমিউন সিসটেম নষ্ট করে দিয়ে ভরে রেখেছি জীবাণু-নিরোধক কাঁচের বাক্সে। দেখেছি, ইমিউন সিসটেম নিয়ে অপ্রতিরোধ্য অবস্থায় যেগুলো থাকে, সিসটেম ছাড়াগুলো তার চেয়ে বেশি বাঁচে। ইমিউন থেকে জন্ম নেয় যেসব রোগ, তেমন রোগ স্পর্শ করে না ওগুলোকে।

'কল্পনা করো এখন, ইমিউন ছাড়া, কিংবা ভিন্ন ইমিউন সংযোজিত মানুষের কথা। কত মারাত্মক রোগ থেকে বেঁচে যাবে। যদি সফল হতে পারি!' মাথা নাড়লেন ডাক্তার। 'আর কি সব ছাইপাঁশ নিয়ে আছে অন্য ডাক্তাররা। কুডিয়াসের কথাই ধরো। কি করতে চেয়েছে? বুদ্ধিমত্তায় পরিবর্তন ঘটাবে, আহা! তাতে কি কচুটা হবে? হ্যারিসনটা আছে পুরানো হাড়গোড় নিয়ে। কখন কোনটার জন্ম হয়েছে জানলে কি পৃথিবীর রূপ বদলে যাবে? যত্তোসব, এনার্জি লস!'

বনের বাইরে বেরিয়ে এল ওরা।

ছেলেদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, বিদায় নিয়ে সেন্টারের দিকে রওনা হলেন রেডম্যান।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ নীরবতার পর মুসা বলল, 'আমি শিওর, এবারকার গ্যাসপার পুরস্কার ডাক্তার রেডম্যানই পাবেন।'

আনমনে মাথা ঝাঁকাল শুধু কিশোর। খাওয়ার জন্যে কাফেতে চলল ওরা।

শহরের ভিড় অনেক কমে গেছে। কাফে প্রায় খালি। আরাম করে বসে খেতে খেতে আলোচনা চালাল ছেলেরা।

'জটিল এক রহস্য,' মুখ বাঁকিয়ে বলল মুসা। 'কি কাণ্ড রে বাবা! সারা শহর একসাথে ঘুমিয়ে পড়া! ওদিকে গুহা থেকে গায়েব হয়ে গেল গুহামানব।'

'পায়ের ছাপের ছাঁচটা,' কিশোর বলল, 'ডাক্তার হ্যারিসনকে দেখালে কেমন হয়?'

'কি হবে তাতে?' প্রশ্ন রাখল রবিন। 'গুহামানব যে নয়, এটা তো আমরাই জানি।'

'তা জানি। তবে, কি থেকে কি বেরোয় কে জানে।'

'হ্যাঁ, চেষ্টা করতে দোষ নেই।'

খাওয়া শেষ করে গোলাঘরে ফিরে এল ছেলেরা। ছাঁচটা নিয়ে চলল গ্যাসপার সেন্টারে।

ওয়ার্করুমেই পাওয়া গেল ডাক্তার হ্যারিসনকে। কাগজ আর বইপত্র বোঝাই ডেস্কের সামনে বসে আছেন। ছেলেদের দেখে মুখ তুলে তাকালেন। ওদের ভয় ছিল, দেখেই ফেটে পড়বেন। সে-সব কিছু করলেন না। হাতের বইটা বন্ধ করে রেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার?'

'কিছু পরামর্শ চাই, স্যার,' খুব বিনীতভাবে বলল কিশোর, 'কিংবা বলতে পারেন, কিছু তথ্য। রাতে মিস্টার ম্যাকস্বারের গোলাঘরের মাচায় থাকি আমরা। গতরাতে একটা কাণ্ড ঘটেছে, সেখানে থাকায় শুনতে পেয়েছি।'

জিপসি যে গুহামানব দেখেছে, সেই গল্প বলল কিশোর। শেষে পায়ের প্রতিকৃতিটা বের করে দিল।

একনজর দেখেই ওটা টেবিলে রেখে হাসলেন ডাক্তার। 'প্রাগৈতিহাসিক মানুষের ছাপ পেয়েছ ভেবে খুশি হলে নিরাশ হতে হবে। বেশিদিন খালি পায়ে হাঁটলে পায়ের পাতা ছড়িয়ে যায়, তার এটাতে ছড়ানো তো দূরের কথা, একটা আঙুলই অস্পষ্ট। তারমানে খুব টাইট জুতো পায়ে দেয়।'

'কিন্তু জিপসি বলল একজন গুহামানবকে দেখেছে,' রবিন বলল। 'লম্বা লম্বা চুল। পরনে পশুর ছাল।'

শব্দ করে হাসলেন এবার হ্যারিসন। 'গুহামানবেরা যে পশুর ছাল পরতই, এটা কি শিওর? জানো? জিপসি কি দেখেছে কে জানে, তবে গুহামানব হতেই পারে না। পায়ের ছাপই সেটার প্রমাণ। এটা কোন হোমিনিডের পায়ের ছাপ নয়। অনেক বড়।'

'বড়?' অবাক হলো মুসা। 'কিন্তু মাত্র নয় ইঞ্চি।'

'তারমানে ওই পায়ের মালিকের উচ্চতা পাঁচ ফুট তিন-চার ইঞ্চি। গুহায় যে কঙ্কালটা ছিল, তার চেয়ে অনেক বড়।...দাঁড়াও, দেখাচ্ছি। আফ্রিকায় একটা কঙ্কাল পেয়েছি আমি। হোমিনিড। প্রায় বিশ লাখ বছর আগের। এখানে যেটা পাওয়া গেছে, তার চেয়ে কিছু ছোট। তবু ধারণা করতে পারবে।

একটা বড় কেবিনেটের দরজা খুললেন ডাক্তার।

ভেতরে তাকিয়েই স্থির হয়ে গেলেন। 'নেই!' ফিসফিসিয়ে বললেন কোনমতে। তারপর চেঁচিয়ে উঠলেন। 'নেই! নেই ওটা! চুরি করে নিয়ে গেছে!'

চোদ্দ

সেই বিকেলে ম্যাকম্বারকে একহাত নিল কিশোর।

ভাড়া চাইতে এলে বলল, ওরা চলে যাচ্ছে। লোকের ভিড় নেই। বাইরেই ক্যাম্প করে রাত কাটাবে।

একধাক্কায় মাচার ভাড়া অর্ধেক করে ফেলল ম্যাকম্বার। পাঁচ ডলার, রাতপিছু।

তাতেও রাজি হলো না কিশোর।

শেষে, তিন ডলারে রফা হলো। টাকা গুণে দিয়ে হাসতে হাসতে মাচায় এসে উঠল মুসা আর রবিনকে নিয়ে।

অন্ধকারে শুয়ে রইল ওরা কিছুক্ষণ, নীরবে। ভাবছে, দিনের ঘটনাগুলোর কথা।

নীরবতা ভাঙল মুসা, 'অবাক কাণ্ড! এই কঙ্কাল চোর এতদিন ছিল কোথায়?'

'আজ নিয়েছে, না আগেই নিয়েছে, কে জানে,' রবিন বলল। 'ডাক্তার তো বললেন, মাস তিনেক ধরে আর কেবিনেট খুলে দেখেননি। এর মাঝে যে কোন সময় চুরি হয়ে থাকতে পারে।'

'হ্যাঁ,' সায় জানাল কিশোর। 'ডাক্তার কুডিয়াসের মৃত্যুর সময়ও হতে পারে।'

গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'আবার কুডিয়াস। তাঁর সঙ্গে কঙ্কাল চুরির কোন যোগ থাকতে পারে না। তিনি শুধু সেন্টারে ওটার কাছাকাছি বাস করতেন, ব্যস।'

'লিলির ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার হচ্ছে না,' বলল কিশোর। 'সে জানে, সেদিন হারবারভিউ লেনে কেন যাচ্ছিল, কিন্তু বলছে না।'

'হ্যাঁ, জানে,' রবিন বলল। 'দেখলে না, কথা বলার সময় আরেকদিকে চেয়ে ছিল। তারমানে মিছে কথা বলছিল?'

'আর কেনই বা ডাক্তার কুডিয়াসের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক থেকে পাতাগুলো নিখোঁজ হলো? কি লেখা হয়েছিল ওগুলোতে? তিনিই ছিঁড়েছেন না, অন্য কেউ?'

'অ্যাই, শোনো,' উত্তেজনা ফুটল রবিনের কণ্ঠে। 'হারবারভিউ লেন আমি চিনি। কাল ওখানে গিয়ে খোঁজ নিলে কেমন হয়? আমি একাই নাহয় যাব। খুব ছোট লেন। হয়তো কোন তথ্য জানতে পারব। বের করে ফেলতে পারব, কার কাছে যাচ্ছিলেন কুডিয়াস।'

'ভালই হয়,' কিশোর বলল। 'আমি সেন্টারে গিয়ে চেষ্টা করব তার কাগজপত্র পড়ার।'

'তাহলে আমি যাব সেন্টারেডেলে,' উঠে বসল মুসা।

'ওখানে কি?' জানতে চাইল রবিন।

'জানি না। তবে সাইট্রাস গ্রোভের পাশের শহর ওটা। আর ওখান থেকেই এসেছে মুক্তিপণের চিঠি। খোঁজ নিলে আমিও হয়তো কোন তথ্য জানতে পারব।'

'খুব ভাল হয়,' বলল কিশোর।

গির্জার ঘড়িতে ঘণ্টা বাজল।

আর কোন কথা হলো না, ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

সবে যেন চোখ মুদেছে কিশোর, আর অমনি ঝাঁকাতে শুরু করল তাকে মুসা।
'কী?' চোখ না খুলে জিজ্ঞেস করল সে।

'আর কত ঘুমাবে? আটটা বাজে,' মুসা বলল। 'ওঠো, ওঠো।'

রবিন আগেই উঠেছে।

বাইরের কলে হাতমুখ ধুয়ে নিল ওরা। ভীষণ ঠাণ্ডা। গায়ে কাঁপুনি তুলে দেয়। কাফেতে এসে পেট ভরে নাস্তা খেল। তারপর তিনজন চলে গেল তিনদিকে।

স্টোরের দরজায় এসে দাঁড়াল কিশোর। পাল্লা খোলা। ভেতর থেকে মিসেস গ্যারেটের কণ্ঠ কানে আসছে

'কসম খেয়ে বলতে পারি,' জোরগলায় বলছে মহিলা, 'গতকাল ছিল না ওটা ওখানে। কত খোঁজা খুঁজেছি।'

ভেতরে উঁকি দিল কিশোর। মিসেস গ্যারেটকে দেখা গেল। ধূসর একটা উইগ পরেছে আজ, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল।

'বললামই তো, পাবে, খোঁজো ভালমত,' বলল আরেক মহিলা। একে আগে দেখেনি কিশোর। নীল ইউনিফর্ম পরেছে, তার ওপরে সাদা অ্যাপ্রন। হাতে পালকের ঝাড়ন।

'আমি বলছি, খুঁজেছি,' রেগে গেল মিসেস গ্যারেট। 'এখানে অন্তত দশবার খুঁজেছি। কাল ছিল না।'

আর তর্ক না করে কাঁধ ঝাঁকিয়ে মুখ বাঁকিয়ে ঝাড়ন হাতে চলে গেল দ্বিতীয় মহিলা।

ফিরে তাকিয়ে দরজায় কিশোরকে দেখল মিসেস গ্যারেট। 'লিলিকে খুঁজছি? নেই।'

'ডাক্তার হ্যারিসন আছেন?'

'আছে। মুখ হাউপ!' গাল ফুলিয়ে দেখাল মহিলা। 'তার ঘরে।'

মহিলাকে ধন্যবাদ দিয়ে সেখানে চলল কিশোর। ওয়ার্করুমের কাছাকাছি আসতেই কানে এল ডাক্তারের উত্তেজিত চিৎকার, ধমক। ধুড়ুম-ধাড়ুম করে কি যেন ফেলা হচ্ছে।

দরজায় দাঁড়িয়ে দ্বিধা করল কিশোর। টোকা দিল।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। 'কী?' চেঁচিয়ে উঠলেন হ্যারিসন। 'কি চাই?'

'ওকে ধমকাচ্ছ কেন?' ভেতর থেকে বলল একটা শান্ত কণ্ঠ, ডাক্তার রুডলফ। আর্মচেয়ারে বসে আছেন।

আবার চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলেও থেমে গেলেন হ্যারিসন, কিশোরকে অবাক করে দিয়ে হাসলেন। 'সরি। এসো, ভেতরে এসো।'

ঘরে ঢুকল কিশোর।

সারা ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বই, কাগজপত্র। টাইপরাইটার রাখার টেবিলটা কাত হয়ে পড়ে আছে। মেশিনটাও মেঝেতে।

কিশোরের দিকে চেয়ে হাসলেন ডাক্তার রুডলফ। 'দেখে হাঁটো। পা রাখার তো আর জায়গা রাখেনি।'

লজ্জিত হলেন হ্যারিসন। টেবিলটা সোজা করে তার ওপর তুলে রাখলেন মেশিনটা। খসে পড়ে গেল রোলারের ভাঙা একটা গোল মাথা। মেঝের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলে গেল।

'দূর!' সেদিকে চেয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠলেন হ্যারিসন।

'জিনিসপত্র নষ্ট করার ওস্তাদ ও,' সহকর্মীকে দেখিয়ে বললেন রুডলফ।

'করব না তো, কী?' প্রতিবাদ করলেন হ্যারিসন। 'কার মাথা ঠিক থাকে! এতসব গণ্ডগোল। তার ওপর ম্যাকস্বারের বাচ্চা দিয়েছে মেজাজ আরও খারাপ করে। বলে বেড়াচ্ছে, আমিই নাকি লোক দিয়ে তার কঙ্কাল চুরি করিয়েছি। যাতে লোকে অন্যরকম ভাবে, সেজন্যে নাকি মুক্তিপণের নোট পাঠিয়েছি। তারপর, আমার কঙ্কাল আমিই লুকিয়ে রেখে রটিয়েছি চুরি গেছে। শয়তান কোথাকার!' কিশোরের দিকে তাকালেন। 'অন্যকে যে বলছে, শুধু তাইই না। আমাকে ফোন করেও বলে এ কথা। ব্যাটাকে খুন করব আমি।'

'ও বলে বলুক না, তোমার কি?' বোঝানোর চেষ্টা করলেন রুডলফ। 'কে বিশ্বাস করছে ওর কথা?'

'এখান থেকেও যে কঙ্কাল চুরি গেল,' সাবধানে বলল কিশোর, 'অবাক লাগছে না আপনার?'

'অবাক! মাথাই খারাপ হয়ে গেছে আমার।'

'তারমানে, গুহামানবকে যে চুরি করেছে, এটাও সে-ই করেছে, এমনও তো হতে পারে।'

ঝট করে চোখ তুললেন হ্যারিসন। 'তাই তো। একথা তো ভাবিনি। কিন্তু কে? আমার কঙ্কালটার কথা তো সেন্টারের বাইরের কেউ জানে না। মিসেস গ্যারেট আর ডাক্তার রুডলফ, এই তো।'

'কেন, লিলি জানে তো।'

'ও জানলেও কিছু হবে না। ভীতুর ডিম। হোমিনিড চুরি করার সাহস ওর হবে না। আরে তাই তো···এখন মনে পড়ছে। আমার ওপর চোখ রাখত মেয়েটা। হাঁ করে তাকিয়ে থাকত। আলমারি কিংবা টেবিলের আড়াল থেকে···অদ্ভুত! ভাবিনি তো আগে।'

হেসে উঠলেন রুডলফ। ব্যঙ্গ করে বলল, 'ভেবেছে, সত্যিই পাগল হয়ে গেল কিনা লোকটা, দেখি তো। নাহলে আর কি কারণ?' পরক্ষণেই বদলে গেল কণ্ঠস্বর, 'দেখো, ওকে সন্দেহ করবে না বলে দিলাম। বাচ্চা মেয়ে। স্কুলের গন্ধও যায়নি গা থেকে। ও চুরি করবে না।'

'তাহলে কে করেছে?' এমনভাবে বললেন হ্যারিসন, যেন রুডলফ জানেন।

'তবে লিলির জানাশোনা আছে অনেকের সঙ্গে,' বলল কিশোর। 'সেন্টারের বাইরেও লোকের সঙ্গে পরিচয় আছে, তাদের সঙ্গে কথা বলে।'

চোখের পাতা সরু হয়ে এল হ্যারিসনের। 'তোমার এত আগ্রহ কেন?'

'আমি আর আমার দুই বন্ধু গোয়েন্দা,' সহজ গলায় বলল কিশোর।

'গোয়েন্দা?' হাসলেন হ্যারিসন।

'হ্যাঁ,' পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার নাম লেখা কার্ড বের করে দিল কিশোর।

'আই সী,' পড়ে বললেন ডাক্তার। 'ভালই হলো। এখন আমার সবচেয়ে দরকার গোয়েন্দার। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। লিলিকে সন্দেহ করছ তো? অহেতুক। চুরি করার সাহস ওর হবে না।'

'ডাক্তার কুডিয়াস পছন্দ করতেন ওকে,' মনে করিয়ে দিল কিশোর। 'কঙ্কাল চুরি আর ডাক্তার কুডিয়াসের রকি বীচে যাওয়ার পেছনে কারও যোগাযোগ থাকতে পারে।'

'তা কি করে হয়?' প্রতিবাদ করলেন ডাক্তার রুডলফ। 'সেটা তো তিনমাস আগের ঘটনা। গুহামানবের কঙ্কাল তখনও পাওয়াই যায়নি।'

'ডাক্তার কুডিয়াস রকি বীচে কেন গিয়েছিলেন, কিছু বলতে পারবেন?'

'না,' জবাব দিলেন হ্যারিসন। 'চাপা স্বভাবের ছিল। কাউকে কিছু বলত না।'

'আমার মনে হয় লিলি জানে। কিন্তু সে-ও কম চাপা নয়। বলে না। আরেকটা ব্যাপার, ডাক্তার কুডিয়াসের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকের মাঝখানের অনেকগুলো পাতা ছেঁড়া। এপ্রিলের শেষ আর মে-র শুরুর। ওগুলোতে নিশ্চয় কোন সূত্র ছিল।'

রুডলফের দিকে তাকালেন একবার হ্যারিসন, মাথা ঝাঁকালেন।

'কুডিয়াসের ঘরের কোন কাগজ সরানো হয়নি। যেমন ছিল, তেমনি আছে। অন্তত আমরা ধরিনি।'

দেখার জন্যে তিনজনেই চলল ডাক্তার কুডিয়াসের ল্যাবরেটরিতে।

কাগজপত্র আর নোটের অভাব নেই। অসংখ্য ফাইল। সুন্দর করে সাজানো গোছানো, ডাক্তার হ্যারিসনের কাগজপত্রের মত এলোমেলো নয়।

তিনটে ফাইলের ওপরের টাইটেলে দৃষ্টি আকর্ষণ করল কিশোরের—রিঅ্যাকশন টাইমস, ম্যানুয়্যাল ডেকস্টারিটি, আর কমুনিকেশন স্কিলস। কিছু নোটবুক আছে। ওগুলোর ওপরে লেখা রয়েছে কেমিকেল স্টিমুলেশন, এক্স-রে এক্সপোজার টাইমস, ইত্যাদি। কিছু কিছু লেখা পড়তে পারলেও মানে কিছুই বুঝল না কিশোর।

'বোঝাতে হলে আরেকজন জেনিটিসিস্ট লাগবে,' বললেন রুডলফ।

একমত হলো কিশোর। 'তবু, বোঝা যায় এমন কিছুও পাওয়া যেতে পারে। যার সঙ্গে যোগাযোগ আছে গুহামানব অন্তর্ধান রহস্যের।'

পাতার পর পাতা উল্টে চলল তিনজনে। খালি খসখস শব্দ।

কিছুক্ষণ পর মুখ তুলল কিশোর। 'এপ্রিলের দশ তারিখের পর আর কোন গবেষণার নোট নেই।'

হাতের খাতাটার শেষ পৃষ্ঠাটাও উল্টে দেখলেন হ্যারিসন। 'ঠিকই বলেছ। এটাতে শেষ লেখা রয়েছে পঁচিশে মার্চের নোট। ব্যস।'

আরও অনেক খাতা, ফাইল, নোটবুক ঘাঁটল ওরা। এপ্রিল ১০-এর পরে আর কিছু পাওয়া গেল না।

'কিন্তু এর পরেও তো কাজ করেছে,' বললেন হ্যারিসন। 'রোজই করেছে। ওসব দিনের নোটগুলো কই?'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকের কাগজের যা দশা হয়েছে, তা-ই হয়েছে,' মন্তব্য করল

কিশোর।

ওয়ার্কবেঞ্চের ওপর গাদা করে রাখা আছে অনেকগুলো ম্যাগাজিন। সবচেয়ে ওপরেরটা তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাল কিশোর। ভেতরে একটা স্লিপ পাওয়া গেল। 'প্রোপার্টি অভ দি ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট লাইব্রেরি' ছাপ মারা।

স্লিপটা যেখানে পাওয়া গেল সেই পৃষ্ঠা পড়ে বলল কিশোর, 'সোডিয়াম পেনটোথ্যাল মগজের ওপর কি ক্রিয়া করে তা-ই পড়ছিলেন ডাক্তার রুডিয়াস।'

'সোডিয়াম পেনটোথ্যাল একটা অ্যানাসথেটিক,' বললেন রুডলফ। 'অনুভূতি নষ্ট করে। বেহুঁশ করে দেয়।'

আরেকটা ম্যাগাজিন তুলে নিল কিশোর। জার্নাল অভ দি আমেরিকান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের একটা কপি। নাইট্রাস অক্সাইডের ওপর একটা লেখা ছেপেছে।

'আরেকটা অ্যানাসথেটিক,' বললেন হ্যারিসন। 'দাঁতের ডাক্তাররা হরদম ব্যবহার করে। ওরা বলে একে লাফিং গ্যাস।'

আরও ম্যাগাজিন আছে, তাতে আরও আরটিক্যাল। সব ক'টাতেই কোন না কোন অ্যানাসথেটিকের ওপর লেখা রয়েছে।

'ঠিকই আছে,' বললেন রুডলফ। 'শিম্পাঞ্জীর ওপর অপারেশন চালাত তো, অ্যানাসথেটিকের দরকার ছিল।'

'এবং গতকাল পুরো শহরকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হয়েছে,' কাউকে উদ্দেশ্য করে বলল না কিশোর কথাটা। মনের ভাবনাটাই মুখ ফুটে বেরিয়ে গেছে।

অনেক খোঁজাখুঁজি করা হলো। কিন্তু ল্যাবরেটরিতে অ্যানাসথেটিকের কোন নমুনা পাওয়া গেল না। ইথার, সোডিয়াম পেনটোথ্যাল, এমনকি নোভাকেনও নেই।

সেন্টার থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। লিলির কথা ভাবছে। নোটগুলো কি সেই গায়েব করেছে? যদি করে থাকে, কেন করেছে? পাতাগুলো কি নষ্ট করে ফেলেছে? আবার প্রশ্ন, কেন? কঙ্কাল চুরিতে তার কোন হাত আছে? আছে, এ কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না, এতটাই নিরীহ।

কিন্তু সত্যি কি এতটা নিরীহ?

পনেরো

দুপুর নাগাদ মুসার মনে হলো, অযথা সময় নষ্ট করছে। সাইট্রাস গ্রোভের চেয়ে বড় সেন্টারডেল শহর, অন্যরকম। দুটো সুপারমার্কেট আছে, চারটে পেট্রোল স্টেশন। ওষুধের দোকানের সামনে। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না মুসার। পড়ার কথাও নয়, কি খুঁজতে এসেছে তা-ই জানে না।

ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছে মুসা, এই সময় চোখে পড়ল ধূলিধূসরিত পুরানো গাড়িটা। শাঁ করে তার সামনে দিয়ে গিয়ে মোড় নিয়ে নামল আরেকটা শাখাপথে। ড্রাইভিং সীটে বিল উইলিয়ামস।

সরু পথের দু-ধারে গাছের সারি। তার ভেতর দিয়ে এগিয়ে একটা পুরানো

বাড়ির গাড়িবারান্দায় ঢুকল গাড়ি। দরজা খুলে নামল বিল, হাতে বাদামী কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট।

দাঁড়িয়ে আছে মুসা।

মিনিট দুয়েক পর বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল বিল।

গাড়িতে উঠে আবার এগিয়ে আসতে লাগল মুসা যেখানে আছে সেদিকে।

আরেকদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখল মুসা, যাতে বিল দেখতে না পায়।

দেখল না বিল। চলে গেল সাইট্রাস গ্রোভের দিকে।

বাড়িটার দিকে এগোল মুসা। গাড়িবারান্দায় এসে দাঁড়াল। এখন কি করবে?

আরেকটা গাড়ি এসে থামল গাড়িবারান্দায়। দরজা খুলে নামল একজন মোটা, বয়স্কা মহিলা।

'কিছু চাও?' জিজ্ঞেস করল।

'না, ম্যাম,' দ্বিধা করছে মুসা। সন্তোষজনক একটা জবাব খুঁজছে মনে মনে। 'বিল উইলিয়ামসকে খুঁজছিলাম। সাইট্রাস গ্রোভে ফিরে গেলে একটা লিফট নিতাম আরকি। ওকে এখানে ঢুকতেও দেখলাম। কিন্তু আমি আসতে আসতে চলে গেল।'

'ডাকলেই পারতে। আজ আর আসবে না।'

'ঠিক আছে। দেখি, বাসেই চলে যাব।'

'হ্যাঁ, তাই যাও।' গাড়ির ট্রাঙ্ক খুলে জিনিসপত্র নামাতে শুরু করল মহিলা। মুদি দোকানে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তাকে মাল নামাতে সাহায্য করল মুসা।

পাশে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'আপনি কি মিসেস উইলিয়ামস?'

'বিলির মা মনে করেছ? না, আমি তার বাড়িওয়ালী। আমার এখানে একটা রুম ভাড়া নিয়ে থাকে সে।'

হাতের প্যাকেটগুলো রান্নাঘরের টেবিলে নামিয়ে রাখল মুসা।

'সাইট্রাস গ্রোভে থাকো তুমি?' জিজ্ঞেস করল মহিলা। জবাবের অপেক্ষা না করেই বলল, 'গতকাল ওই কাণ্ডটা যখন ঘটল, পার্কে সবাই ঘুমাল, তখন কোথায় ছিলে। আমি শিওর, পানিতে কোন ঘাপলা ছিল। পানি পরীক্ষা করে দেখা উচিত ছিল।'

'করেছে তো। ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে। কিছু পায়নি।'

মাথা নাড়ল মহিলা। 'যে-ই করেছে, জঘন্য কাজ করেছে। কাল বিলির ওপর খুব রাগ লাগছিল। অসুখের আর সময় পেল না। সারাটা সকাল শুয়ে রইল বিছানায়। এমনিতে অসুখ খুব একটা হয় না তার। কাল সাইট্রাস গ্রোভে গিয়ে দেখে আসতে পারলে তার মুখ থেকেই সব শুনতে পারতাম। কঙ্কালটা দেখতে যাওয়ার ইচ্ছে আমারও ছিল, ভিড়ের কথা শুনেই যাইনি। গাড়ি পার্ক করারই নাকি জায়গা ছিল না।'

'না গিয়ে ভালই করেছেন। সাংঘাতিক ভিড় হয়েছিল। ঠিক আছে, যাই এখন,' দরজার দিকে পা বাড়াল মুসা।

'বিলি এলে কিছু বলব? কি নাম তোমার?'

'না, কিছু বলার দরকার নেই। আমার নাম মুসা।'
'আচ্ছা।'
বাস ধরে সাইট্রাস গ্রোভে ফিরে এল মুসা।
গোলাবাড়ির পেছনে বসে বসে তখন ভাবছে কিশোর। মুসার মুখে সব শুনে বলল, 'সত্যি তাহলে কাল অসুস্থ ছিল বিল। আমার তো সন্দেহ হচ্ছিল, চুরিতে সে-ও জড়িত। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে শক্ত অ্যালিবাই রয়েছে তার।'
ঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল মুসা।
একইভাবে বসে নিচের ঠোঁটে চিমটি কেটে চলল কিশোর।
বিকেল চারটেয় ফিরে এসে দু-জনকেই ওই অবস্থায় পেল রবিন।
'খবর ভাল?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।
'ডক্টর ফিল ডিকসনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন সেদিন ডক্টর কুডিয়াস,' জানাল রবিন। 'হারবারভিউ লেনে থাকেন ডক্টর ডিকসন। অ্যানাসথেটিস্ট। শান্তা মনিকার সেইন্ট ব্রেনড্যান হাসপাতালে চাকরি করেন। তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, ডক্টর কুডিয়াস কি কোন ব্রিফকেস ফেলে গেছেন?—মাথা নাড়লেন। বললেন, সেদিন সারা দিন অপেক্ষা করেছেন ডক্টর কুডিয়াসের জন্যে। পরে অবশ্য তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছেন।'
'অ্যানাসথেটিস্ট? ডক্টর কুডিয়াসের বন্ধু ছিলেন?'
'তাই তো বললেন। ডক্টর কুডিয়াস সেদিন কেন দেখা করতে চেয়েছিলেন, বলতে পারলেন না। কথায় কথায় তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এমন শক্তিশালী কোন অ্যানাসথেটিস্ট আছে কিনা, যেটা নিমেষে কয়েকশো লোককে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে?'
'কি বললেন?' আগ্রহে সামনে ঝুঁকল কিশোর।
'নেই। গতকালকের কথা তিনি শুনেছেন।'
'হুম।'
বাড়ির পেছনের দরজা খুলে বেরোল লিলি। ছেলেদের দিকে একবার মাথা নুইয়ে হনহন করে চলল গোলাঘরের দরজার দিকে।
পেছনে বেরোল ম্যাকম্বার। ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'লিলি, কোথায় যাচ্ছ?'
'আন্না ফিঙ্গার দাওয়াত দিয়েছে, তার সঙ্গে সাপার খেতে,' না ফিরে জবাব দিল লিলি।
'তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরো।'
পিকআপটা বের করে নিয়ে চলে গেল লিলি।
সেদিকে তাকিয়ে রইল ম্যাকম্বার।
উঠে এল কিশোর। কাশি দিয়ে ম্যাকম্বারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'চোরের আর কোন খবর আছে?'
চোখ পাকিয়ে জবাব দিল ম্যাকম্বার, 'থাকলেও তোমাকে বলতাম না।' দুপদাপ পা ফেলে চলে গেল বাড়ির ভেতরে।
বিকেলের একটা অংশ কাফেতে বসে খেয়ে আর অ্যানাসথেটিকের ব্যাপারে

আলোচনা করে কাটাল ছেলেরা। বাকি সময় কাটল শহরে ঘোরাঘুরি করে।

মাঝরাতের পর বাড়ি ফিরল লিলি। মাচায় শুয়ে ইঞ্জিনের শব্দ শুনল ছেলেরা। বাড়ির ভেতরে ম্যাকম্বারের কড়া গলা শোনা গেল—এতক্ষণে কোথায় কাটিয়ে এসেছে লিলি, জিজ্ঞেস করছে। দড়াম করে বন্ধ হলো দরজা-জানালা, তারপর মেয়েকণ্ঠের কান্না আর ফোঁপানী।

'লিলির সঙ্গে খুব দুর্ব্যবহার করে ওরা,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল মুসা।

'চলে যায় না কেন? বয়েস তো যথেষ্ট হয়েছে,' রবিন বলল, 'অত ভীতু কেন?'

এরপর আর তেমন কিছু ঘটল না। ঘুমিয়ে পড়ল ছেলেরা।

পরদিন, সোমবার, খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠল ওরা। ম্যাকম্বারের বাড়িতে কেউ ওঠেনি, কোন নড়াচড়া নেই কাফেতে নাস্তা সারল।

মেইন রোড ধরে হাঁটছে, এই সময় চোখে পড়ল পিকআপ নিয়ে পেট্রোল স্টেশনে ঢুকছে লিলি।

'গতরাতে বান্ধবীকে নিয়ে নিশ্চয় হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল ও,' রবিন অনুমান করল। 'গতকাল ট্যাংকি ভরেছে ম্যাকম্বার, দেখেছি। আজ সকালেই এত তেলের দরকার হলো···'

টুং টুং করে ঘন্টা বাজল দু'বার। পাম্প বন্ধ করে, ট্যাংক থেকে হোস বের করে, ট্যাংকের মুখে ক্যাপ লাগাল লিলি। টাকা গুণে দিল অ্যাটেনডেন্টের হাতে।

স্টার্ট নিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে গেল পিকআপ।

'দুই গ্যালনের কিছু বেশি,' চলমান গাড়িটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর। 'তারমানে অন্তত চল্লিশ মাইল। সেন্টারডেল পর্যন্ত যাওয়া যাবে, তাই না?'

'হয়তো ওখানে কোন বান্ধবী-টান্ধবী থাকে,' মুসা বলল। 'কিংবা হয়তো কাল রাতে বেশি ঘোরাঘুরি করে তেল খরচ করে ফেলেছিল। এখন চাচার ভয়ে আবার ভরে রেখেছে।'

'আচ্ছা, ওকে সন্দেহ করছি কেন?' নিজেকেই প্রশ্ন করল যেন কিশোর। 'আর করছিই যখন, সরাসরি জিজ্ঞেস করে ফেললেই পারি। দ্বিধা কিসের?'

'মিছে কথা বলবে,' রবিন বলল। 'আগেও বলেছে।'

'বড় বেশি নিঃসঙ্গ। কে জানে, তেমন করে যদি জিজ্ঞেস করতে পারি, মনের ভার লাঘব করার জন্যেও সব বলে দিতে পারে। জিজ্ঞেস করতে অসুবিধে কি?'

'কিছু না। তবে তুমি একা যেয়ো। আমি থাকছি না সামনে। কথায় কথায় ভ্যাক ভ্যাক করে কেঁদে ফেলে। এত কান্না আমার সয় না। খুব খারাপ লাগে।'

'আমারও,' মুসা বলল।

'ঠিক আছে, আমি একাই যাব,' বলল কিশোর।

ম্যাকম্বারের বাড়ি পৌঁছে দেখল ওরা, লিলি পিকআপ রেখে সেন্টারে চলে গেছে। দুই সহকারীকে রেখে কিশোরও চলল সেন্টারে। দরজায় পৌঁছেই দাঁড়িয়ে গেল। লিলির চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে।

'দেরি হয়েছে কে বলল?' চেঁচিয়ে উঠল লিলি। 'মোটেই দেরি হয়নি।'

দরজার কাছ থেকে সরে এসে লিভিংরুমের জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল

কিশোর।

কেউ নেই। শুধু দেয়ালে বসানো পশুর মাথাগুলো শূন্য নিষ্প্রাণ চোখে তাকিয়ে রয়েছে।

'কি করেছ সেটা শোনার আমার দরকার নেই,' আবার চেঁচাল লিলি। 'আরেকবার ফোন করো। বলো, এটা একটা রসিকতা।'

কিশোরের মনে পড়ল, ল্যাবরেটরির বাইরে, হলরুমে যাওয়ার পথে দেয়ালে ঝোলানো একটা টেলিফোন আছে। টেলিফোনে কথা বলছে লিলি।

'মিথ্যুক!' আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল লিলি। 'এরকম করা মোটেই উচিত হয়নি তোমার। আমার কি হবে ভেবেছ?'...খানিক নীরবতা। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'বেশ, দেখো, আমি কি করতে পারি।'

খটাস করে রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ হলো।

জানালার কাছ থেকে সরে গেল কিশোর।

মুহূর্ত পরেই ঝটকা দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল লিলি।

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসেছে। ডান-বাঁ কোনদিকে না তাকিয়ে ধুপধাপ করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে, প্রায় দৌড়ে গেল গেটের দিকে।

পিছু নিল কিশোর। ডাকল না।

মাঠ পেরিয়ে ম্যাকস্বারের গোলাঘরে ঢুকে পিকআপটা বের করল লিলি। ঝাঁকুনি খেতে খেতে গিয়ে পথে উঠল গাড়িটা। ছুটল শহরের দিকে।

গোলাঘরের দিকে এগোল কিশোর। দরজায় বেরিয়ে এল মুসা আর রবিন।

'গেল কই?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'জানি না,' কিশোর জবাব দিল, 'খুব রেগেছে। অবশেষে করতে চলেছে কিছু একটা।'

'শুধু ও-ই না,' রবিন বলল। 'মিনিট দশেক আগে ম্যাকস্বারও খুব রেগেমেগে বেরিয়েছে বাড়ি থেকে। ওর স্ত্রী পেছন থেকে ডাকছিল। গুহামানবের পেছনে আর টাকা নষ্ট না করতে বলল। শুনলই না যেন ম্যাকস্বার। শহরের দিকে চলে গেল।'

'মুক্তিপণ।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল কিশোর, 'মুক্তিপণের টাকা দিতে গেছে। ঘটনা ঘটতে আরম্ভ করেছে ভালমতই।'

ষোলো

'চলো, যাই। দেখি, কি করে সামলায় ম্যাকস্বার।' বলেই রওনা হলো কিশোর।

'কিভাবে করবে?' পেছন থেকে বলল মুসা। 'গাড়ি তো নিল না।'

'গেলেই দেখব।'

মেইন রোড ধরে হেঁটে কাফেটা প্রায় পেরিয়ে যাচ্ছিল ছেলেরা, এই সময় দরজায় বেরোল ম্যাকস্বার। তার সঙ্গে রয়েছে কাফের মালিক, মিস্টার মরিসন। পেছনে আরও দু-জন বেরোল। একজনকে চেনে কিশোর, এখানকার ওষুধের দোকানের মালিক।

দ্রুতপায়ে ব্যাংকের দিকে হাঁটতে লাগল চারজনে। মাঝপথে তাদের সঙ্গে মিলিত হলো, মোটেলের মালিক।

'যা আন্দাজ করেছিলাম,' নিচু কণ্ঠে বলল কিশোর। 'শহরের সব ব্যবসায়ী একজোট হয়ে গুহামানবের পেছনে টাকা ঢেলেছে। মুক্তিপণের টাকাও সবাই ভাগাভাগি করে দেবে।'

পার্কের একটা বেঞ্চে বসে ব্যাংকের ওপর চোখ রাখল কিশোর। জানালার ভেতর দিয়ে দেখা গেল, তাড়াহুড়ো করে ডেস্ক থেকে উঠে আসছে ব্যাংকের ম্যানেজার। পাঁচজনের সঙ্গেই হাত মেলাল। তারপর ওদেরকে নিয়ে গেল পেছন দিকের একটা কামরায়।

'এবার কি করব?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'অপেক্ষা,' জবাব দিল কিশোর। 'বেশিক্ষণ বসে থাকতে হবে না।'

পাঁচ মিনিট পর, গির্জার ঘড়িতে যখন দশটার ঘণ্টা বাজছে, ব্যাংক থেকে বেরিয়ে এল ম্যাকস্বার। হাতে ক্যানভাসের তৈরি একটা টাকা রাখার বটুয়া। সঙ্গে বেরোল কাফের মালিক।

দ্রুতপায়ে হেঁটে গেল দু-জনে কাফের পাশের পার্কিং লটে। একটা ফোক্সওয়াগেনে চড়ে চলে গেল।

'এবারও বেশিক্ষণ লাগবে না,' বলল কিশোর।

ব্যাংকের দরজায় দেখা দিল আরও দু-জন, ম্যাকস্বারের সঙ্গে যারা ঢুকেছিল। তাদের পেছনে বেরোল ম্যানেজার। সবাই উদ্বিগ্ন। আস্তে আস্তে হেঁটে গিয়ে কাফের কাউন্টারের উল্টোদিকের বুদে বসল।

বসেই আছে ছেলেরা।

গির্জার ঘড়িতে সোয়া দশটা বাজল, সাড়ে দশটা। ফিরে এসে পার্কিং লটে ঢুকল ফোক্সওয়াগেন। গাড়ি থেকে নামল ম্যাকস্বার আর তার সঙ্গী। ম্যাকস্বারের হাতে বটুয়াটা নেই। ক্লান্তপায়ে হেঁটে গিয়ে কাফেতে ঢুকল দু-জনে।

'যাব নাকি?' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল কিশোর। পার্ক থেকে বেরিয়ে পথ পেরোল। রবিন আর মুসা চলল তার পেছনে।

বুদের মানুষগুলো ছাড়া আর কেউ নেই কাফেতে, শুধু একজন ওয়েইট্রেস পাত্রে চিনি ঢালছে। ছেলেদের দিকে একবার চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল ম্যাকস্বার।

বড়দের কাছ থেকে খানিক দূরে বসল ছেলেরা।

ম্যাকস্বার আরেকবার এদিকে তাকাতেই আন্তরিকতার ভঙ্গিতে হাসল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'চোরের ফোন আসবে?'

ঝুলে পড়ল ম্যাকস্বারের নিচের চোয়াল, বন্ধ হলো আবার।

'টাকা দিয়ে দিয়েছেন, না?' আবার জিজ্ঞেস করল কিশোর।

লাফ দিয়ে টুল থেকে নেমে এসে কিশোরের শার্টের কলার চেপে ধরল ম্যাকস্বার। 'তুমি কি করে জানলে?...চোরের সঙ্গী নাকি? লক্ষ করেছি, সারাক্ষণ চোখ রাখো আমার ওপর। কেন?'

কলার ছাড়ানোর চেষ্টা করল না কিশোর। শান্তকণ্ঠে বলল, 'চোরের সাথে

আমার কোন সম্পর্ক নেই।'

'অ্যাই কিং, কি করছ?' বাধা দিল কাফের মালিক।

রাগে গোঁ গোঁ করে উঠল ম্যাকম্বার, কিন্তু কলার ছেড়ে দিল।

'অপরাধ নিয়ে কারবার আমার আর আমার বন্ধুদের হবি,' নাটকের সংলাপ বলছে যেন কিশোর। 'তবে আমরা নিজেরা অপরাধ করি না, অপরাধীকে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করি। রহস্যের সমাধান করি।'

কথার ধরন দেখে বড় বড় হয়ে গেল ম্যাকম্বারের চোখ। ফিরে গিয়ে টুলে বসল।

'আপনি কি মনে করেন কঙ্কালটা কোথায় রেখেছে জানাবে আপনাকে চোর?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

জবাব দিল না ম্যাকম্বার।

কিন্তু কাফের মালিক বলল, 'শিওর হওয়ার উপায় নেই। না-ও বলতে পারে।'

'অন্য কারও হাতে যদি পড়ে টাকাটা?' একসময় বলল ব্যাংক ম্যানেজার। 'পিকনিক করতে আসে অনেকেই। হয়তো কারও চোখে পড়ে গেল...'

'থামো তো!' হাত তুলল ম্যাকম্বার। কপালে ঘামের বিন্দু জমছে।

কনুয়ে ভর রেখে কাত হলো রবিন। লোকগুলোকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'সিনেমায় দেখি, বাস স্টেশনের লকারে জিনিস লুকিয়ে রাখে কিডন্যাপাররা। এখানে তো তেমন বাস স্টেশনও নেই। সবাই নামে ওষুধের দোকানের সামনে।'

ঝট করে সোজা হলো কিশোর। 'কিন্তু রেল স্টেশন আছে।'

পিনপতন নীরবতা নামল কাফের ভেতরে। পার্কের শেষ মাথা ছাড়িয়ে ওপাশে পুরানো রেল স্টেশনটা, মরিসন আর ম্যাকম্বারের মুখ ঘুরে গেল সেদিকে। সেই একই রকম রয়েছে ধুলায় ঢাকা পোড়ো বাড়িটা।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কাফের মালিক।

চোখের পলকে টুল ছাড়ল অন্যেরা। দরজায় আগে পৌছল ম্যাকম্বার। ছুটে বেরোল। তার পেছনে অন্যেরা।

কাফে থেকে বেরিয়ে ছেলেরাও দৌড় দিল স্টেশনের দিকে।

বাড়িটার বারান্দায় উঠে জানালার ময়লা কাচের মধ্যে দিয়ে ভেতরে তাকাল ম্যাকম্বার।

'হাত দেবেন না!' চেঁচিয় সাবধানে করল কিশোর। 'আঙুলের ছাপ লেগে যাবে।'

জানালার কাছ থেকে সরে ছুটে গিয়ে দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ম্যাকম্বার। কাঁধের ধাক্কায় ছুটে গেল পাল্লার মরচেধরা কব্জা। মড়মড় করে উঠল তক্তা।

দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল সেখানে। সুপারমার্কেট থেকে দৌড়াদৌড়ি করে এল লোক। মেয়েরা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সে-পথ দিয়েই গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন ডাক্তার হ্যারিসন, সঙ্গে ডাক্তার রুডলফ। হট্টগোল শুনে দু-জনেই নেমে এলেন। ওষুধের দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার রেডম্যান।

আবার দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ম্যাকম্বার।

বেশিক্ষণ সইতে পারল না পুরানো দরজা। ছিটকে খুলে গেল।
স্টেশনের বারান্দায় ওঠার জন্যে হুড়াহুড়ি লাগিয়েছে লোকে।
'সরো!' ধমকে উঠল ম্যাকম্বার। 'কোন কিছুতে হাত দেবে না।'
স্থির হয়ে গেল সবাই।
পুরানো, দোমড়ানো একটা ট্রাংক পাওয়া গেল ঘরের ভেতরে।
ধুলোতে দাগ দেখে বোঝা গেল, জানালা দিয়ে ঢুকিয়ে মেঝের ওপর দিয়ে টেনে আনা হয়েছে ওটা।
'কি ওটাতে?' জিজ্ঞেস করল কে যেন।
ট্রাংকের ডালা তুলেই সোজা হয়ে গেল মরিসন। অস্ফুট একটা শব্দ বেরোল মুখ থেকে।
ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন হ্যারিসন। দেখলেন ট্রাংকে কি আছে। কতগুলো হাড়, কোনটা কোন জায়গার সহজে বোঝার উপায় নেই। খুলির শূন্য কোটরদুটো চেয়ে আছে ছাতের দিকে।
হাঁ হয়ে গেলেন ডাক্তার। মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। পাঁই করে ঘুরলেন ম্যাকম্বারের দিকে। 'কি এ সব?'
কি ভেবে পিছিয়ে গেল ম্যাকম্বার।
হ্যারিসনের বাহুতে হাত রাখলেন রুডলফ। 'শান্ত হও। থামো।' ম্যাকম্বারের দিকে ফিরে বললেন, 'এগুলো এখানে এল কিভাবে?...আফ্রিকায় পাওয়া হোমিনিডের কঙ্কাল...'
'বাজে কথা!' চেঁচিয়ে উঠল ম্যাকম্বার। 'এটা আমার গুহামানব!'
কড়া কিছু বলতে গিয়েও সামলে নিলেন হ্যারিসন। 'তাই নাকি! দেখো তাহলে ভাল করে, লেবেল লাগানো আছে প্রত্যেকটা হাড়ে। নাম্বার, তারিখ, আর কোন জায়গায় কোনটা পাওয়া গেছে, লেখা আছে। পড়ে দেখো।'
'মিস্টার মরিসন!' বাইরে থেকে ডাকল কেউ। 'মিস্টার ম্যাকম্বার!'
সরে পথ করে দিল জনতা। ভেতরে ঢুকল কাফের কাউন্টারম্যান। 'ফোন এসেছে। বলল, স্টেশনঘরে ট্রাংকের মধ্যে আছে...' ট্রাংকের ভেতরে চেয়েই হাঁ হয়ে গেল। 'এই তো!'
'শুনলে তো?' হ্যারিসনের দিকে চেয়ে হাত নাড়ল ম্যাকম্বার। 'ওগুলো আমার হাড়। আমার গুহামানবের! চোরটা নইলে জানল কিভাবে?' ভুরু কুঁচকে গেল হঠাৎ। জ্বলে উঠল চোখ। 'শয়তান! ধাপ্পাবাজ! ধাপ্পা দিয়েছ আমাকে!' দু-হাত বাড়িয়ে ডাক্তারের গলা টিপে ধরতে এল সে। তাকে ধরে ফেলল মরিসন।
ছাড়া পাওয়ার জন্যে ধস্তাধস্তি করতে লাগল ম্যাকম্বার, চেঁচিয়ে বলল, 'তুমি ব্যাটাই গুহায় গিয়ে কঙ্কালটা গেড়ে রেখে এসেছিলে। তারপর এমন ভাব দেখিয়েছ, যেন পেয়েছ ওখানে। লোকের নজর পড়ুক, বড় ধরনের আলোড়ন হোক, এটা চেয়েছ। আর সেজন্যে ব্যবহার করেছ আমাকে।'
'ব্যাটা বলে কি? মিথ্যুক কোথাকার,' ঘুসি পাকিয়ে এগোতে গেলেন হ্যারিসন, আটকালেন রুডলফ।

ঘরে ঢুকল ডেপুটি শেরিফ। এগিয়ে এল। একটা ব্যাপার লক্ষ করল এই সময় কিশোর, ভিড়ের কিনারে দাঁড়িয়ে এদিকে চেয়ে আছেন রেডম্যান। হাসছেন মিটিমিটি। হ্যারিসনের দুরবস্থা দেখেই বোধহয় তাঁর কালো চোখে খুশির ঝিলিক।

সতেরো

'হ্যারিসন সম্মানী লোক,' বললেন রুডলফ। 'সে এ রকম কাজ করতে পারে না।'

'নিশ্চয় করেছে!' চেঁচিয়ে উঠল ম্যাকম্বার। 'চোরটা নাহলে জানল কিভাবে হাড়গুলো এখানে আছে?'

আগে বাড়ল কিশোর। শান্তকণ্ঠে বলল, 'চোরই রেখেছে এগুলো এখানে।'

'শুনলে তো, হাঁদারাম…' ম্যাকম্বারের দিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন হ্যারিসন।

'এক মিনিট, স্যার,' হাত তুলল কিশোর। 'শুনুন। দুই সেট ফসিল ছিল না?'

'হ্যাঁ,' বললেন হ্যারিসন।

'পরশু রাতে মিউজিয়ামের সামনে পাহারা দিচ্ছিল জিপসি ফ্রেনি। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল, জেগে উঠল একটা শব্দে। গোলাঘরের মাচায় শুয়েছিলাম আমরা, তার ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল। নেমে এসে শুনলাম একটা গুহামানবকে নাকি মাঠের দিকে চলে যেতে দেখেছে সে। লম্বা লম্বা চুল, গায়ে ছাল জড়ানো।

'কি দেখেছে ফ্রেনি? গুহামানব তো হতেই পারে না। হয়তো গুহামানবের রূপ ধরে এসে তাকে ধোঁকা দিয়েছিল কেউ। মিস্টার ম্যাকম্বারের রান্নাঘর থেকে চাবি নিয়ে এনেছিল, মিউজিয়ামে ঢুকে গুহার কঙ্কালটা তুলে তার জায়গায় রেখে দিয়েছিল আফ্রিকান কঙ্কালটা। দ্বিতীয় কঙ্কালটা নিয়ে বেরিয়ে এসে, দরজায় তালা লাগিয়ে চলে গিয়েছিল মাঠের ওপর দিয়ে।'

'পাগল!' বলে উঠল ম্যাকম্বার। 'ওই পাগলামি কে করতে যাবে?'

'ডাক্তার হ্যারিসনের ওপর যে দোষ চাপাতে চায়, তাঁকে খেলো করতে চায়। সে জানে, আগে হোক, পরে হোক, গুহার কঙ্কাল বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করতে আসবেই। লেবেল দেখলেই বুঝবেন, ওটা আফ্রিকান, ডাক্তার হ্যারিসন আফ্রিকায় যেটা পেয়েছেন।'

মাথা নাড়লেন রুডলফ। 'তাতে কিছু হত না। গুহামানবের ছবি নিয়েছে হ্যারিসন, ফটোগ্রাফ। আফ্রিকান হোমিনিডের সঙ্গে আমেরিকানটার পার্থক্য আছে।'

'ছবি দেখে কি সত্যি বোঝা যায়?' প্রশ্ন তুলল কিশোর। 'তাছাড়া কঙ্কালের বেশির ভাগই ছিল মাটির তলায়। আফ্রিকান হোমিনিডই ওখানে রেখে যে ফটো তোলেননি ডাক্তার হ্যারিসন, তার কি প্রমাণ? বোঝার উপায় আছে?'

'তাই তো সে করেছে,' চেঁচিয়ে উঠল ম্যাকম্বার। 'সে ওটা রেখেছে। তারপর কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে। মাঝখান থেকে আমাদের দশ হাজার ডলার গচ্চা।' হ্যারিসনের দিকে ফিরল। 'সহজে ছাড়ব তোমাকে ভেবেছ? কেস করব আমি তোমার নামে। জেলের ভাত না খাইয়েছি তো…' রাগে কথা আটকে গেল তার। গটগট করে বেরিয়ে গেল।

জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকালেন হ্যারিসন। তারপর ঝুঁকলেন ট্রাংক থেকে হাড়গুলো বের করার জন্যে।

'সরি, ডাক্তার হ্যারিসন,' বাধা দিল ডেপুটি। 'এগুলো এখন ছুঁতে পারবেন না। আমাদের কাছে থাকবে। আদালতে হাজির করার দরকার হতে পারে।'

মুখ বিকৃত করে ফেললেন হ্যারিসন। তারপর ম্যাকম্বারের মত বেরিয়ে গেলেন তিনিও।

উত্তেজনা শেষ। পাতলা হতে লাগল ভিড়।

তিন গোয়েন্দা রাস্তায় বেরিয়ে এল, উজ্জ্বল রোদে।

হেসে বলল মুসা, 'হয়ে গেল কেসের সমাধান।'

'না, হয়নি,' বলল কিশোর। 'এখনও জানি না আমরা, কে ওই গুহামানব। জানি না, কে ঘুম পাড়াল পার্কভর্তি লোককে। আমেরিকান ফসিলটার কি হলো, তা-ও জানি না।'

ম্যাকম্বারের বাড়ির দিকে চলল তিনজনে। অর্ধেক পথ পেরিয়েছে, ওই সময় তাদেরকে ডাকল বিল উইলিয়ামস। পথের মোড়ে গাড়ি রেখে তাতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'কি হয়েছে ওখানে?' স্টেশনের দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল সে। 'এত লোক?'

'চোরাই কঙ্কালটা পাওয়া গেছে, একটা ট্রাংকের ভেতরে,' জবাব দিল রবিন।

'তাই নাকি? চোর ধরা পড়েছে? মুক্তিপণের টাকা দিয়েছে ম্যাকম্বার?'

'দিয়েছে,' কিশোর বলল। 'সকালে।'

'ভাল করেছে। ঝামেলা গেল। আবার ট্যুরিস্ট জমাতে পারবে।'

'ঝামেলা আছে।' হঠাৎ কি মনে হলো কিশোরের, অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। 'লিলিকে দেখেছেন?'

মাথা নাড়ল বিল। 'না। কেন?'

'না, কয়েকটা কথা ছিল। মনে হয় সেন্টারডেলে গেছে। আপনিও ওখানে যাচ্ছেন নাকি?'

'হ্যাঁ। যাবে?'

দরজা খুলে ড্রাইভিং সীটে বসল বিল। বাঁকা হয়ে ঘুরে খুলে দিল পেছনের দরজা।

ডুবুরীর যন্ত্রপাতি সীটের একধারে ঠেলে দিয়ে উঠে বসল মুসা, তার পাশে রবিন। কিশোর বসল সামনে, বিলের পাশে।

চলতে শুরু করল গাড়ি। দোকানপাট আর স্টেশন ছাড়িয়ে এল। সুইমিং পুলের পাশ দিয়ে চলল। ড্রাইভিং বোর্ডে উঠে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা।

'দারুণ মজা, না?' ওদের দেখিয়ে বলল বিল। 'আমারও খুব ইচ্ছে করে। ইস, যদি সাঁতার জানতাম।'

শহর থেকে বেরিয়ে আঁকাবাঁকা পথ ধরে সেন্টারডেলের দিকে ছুটেছে গাড়ি।

পেছনে তাকাল কিশোর। মুসার হাতে স্কুবা মাস্কটা। চোখাচোখি হলো দু-জনের। কথা হয়ে গেল ইঙ্গিতে। মাস্কটা আবার সীটে নামিয়ে রেখে পেছনে হেলান দিল মুসা।

আড়চোখে বিলের মুখের দিকে তাকাল কিশোর।

হাসি ফুটেছে বিলের ঠোঁটে। ফাঁক হয়ে আছে সামান্য, শিস দেয়ার ভঙ্গিতে।

দু-জনের মাঝখানে সীটের ওপর পড়ে রয়েছে কয়েকটা চিউইং গামের মোড়ক, একটা প্লাস্টিকের বাক্স—ঢাকনাটা নেই, খালি একটা কোকাকোলার টিন, একটা সবুজ বলপেন, খালি একটা খাম—উজ্জ্বল সবুজ রঙে উল্টোপিঠে লেখা রয়েছে কিছু, বোঝা যায়।

উল্টে নিয়ে পড়ল কিশোর। একটা লিস্ট। ওপরে পেট্রোল পাম্প আর একটা অটো সার্ভিস সেন্টারের নাম লেখা রয়েছে। লিস্টের সব চেয়ে নিচের নামটা দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার:

সাইনস সারভিস, ওঅ্যাডলি রোড।

খামটা রেখে দিল কিশোর। বলল, 'আপনি সাঁতার জানেন না, না?'

'না।'

'তাহলে ওই ডুবুরীর যন্ত্রপাতিগুলো কার?'

'আমার এক বন্ধুর।'

'তাই?' কিশোরের কণ্ঠে এমন কিছু ছিল, তার দিকে না তাকিয়ে পারল না বিল।

শহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে এসেছে গাড়ি। পথের দুই ধারে গাছপালা। ব্রেকে পা রেখে কান পেতে কি শোনার চেষ্টা করছে বিল। 'কিসের শব্দ?'

'কই?'

'ইঞ্জিনে গোলমাল···শুনছ না?'

পথের পাশে গাড়ি রাখল বিল। দরজা খুলে বেরোতে শুরু করল।

পেছনের সীটে ভুরু কোঁচকাল মুসা। 'কই, আমি তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না?'

'কান ভাল না আরকি তোমাদের,' গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে নিচু হয়ে জানালা দিয়ে ছেলেদের দিকে তাকাচ্ছে বিল। মুখে রহস্যময় হাসি।

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'ডুবুরীর যন্ত্রপাতির মানে এখন পরিষ্কার হয়েছে। ক্রুডিয়াসের ল্যাবরেটরি থেকে এমন কোন অ্যানাসথেটিক চুরি করা হয়েছে, যেটা ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে পার্কভর্তি লোককে। তারপর হারিয়ে যায়, কোন চিহ্ন থাকে না। কিন্তু আপনি ওই গ্যাসের মধ্যে শ্বাস নিতে চাননি, এমনকি আপনার চামড়ায় লাগুক তা-ও চাননি। সে জন্যেই মুখে লাগিয়েছিলেন মাস্ক, পরেছিলেন ওয়েট স্যুট। আর আপনাকে ওই পোশাকে দেখে জিপসি ভাবল একচোখা, দাঁতাল কোন দানব। পলকের জন্যে দেখেছিল তো, ঠিক বুঝতে পারেনি।'

চেয়ে আছে বিল। চেহারায় কোন পরিবর্তন নেই।

'লিলি আজ সকালে আপনার সঙ্গেই দেখা করতে গিয়েছিল। কোথায় ও?'

স্প্রে করার ছোট প্লাসস্টিকের বোতলটা অনেক দেরিতে দেখল কিশোর।

ড্রাইভিং সীটের পাশেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছিল, বের করে হাতে নিয়েছে বিল। ওটার মুখ সই করল কিশোরের দিকে।

চেঁচিয়ে উঠে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল মুসা।

স্প্রে করল বিল।

হালকা ভেজা ভেজা কিছু এসে লাগল ছেলেদের নাকেমুখে।

পরক্ষণেই পিছিয়ে গিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল বিল। আরও সরে গেল পেছনে।

অসাড় হয়ে এল কিশোরের হাত-পা। শরীরে এক বিন্দু শক্তি নেই। মাথাটা গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে সীটের একপাশে। ঘন হয়ে নামছে অন্ধকারের চাদর, ঢেকে দিচ্ছে সবকিছু। জ্ঞান হারাল সে।

আঠারো

কিশোরের হুঁশ ফিরল। নাকে লাগছে ভ্যাপসা গন্ধ। কাছেই জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে কারা যেন, নড়ে উঠল কেউ।

ঘন অন্ধকার।

উঠে বসল কিশোর। হাতে লাগল মাটি। অন্ধকারে গুঙিয়ে উঠল কেউ।

'কে?' হাত বাড়াল কিশোর।

গায়ে হাত লাগতেই চেঁচিয়ে উঠল একটা নারীকণ্ঠ।

'লিলি?' বলল কিশোর। 'লিলি অ্যালজেডো?'

'ছাড়ো!' চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা। 'আমাকে ছেড়ে দাও।'

কাছেই গুঙিয়ে উঠল মুসা। বিড়বিড় করে কি বলল রবিন।

'আমি, কিশোর,' শান্তকণ্ঠে বলল সে। 'মুসা, তুমি ভাল আছ? রবিন?'

'আ-আমি…ভাল,' জবাব দিল মুসা। 'আল্লাহ্‌রে, কোথায় এলাম?'

'রবিন?' আবার ডাকল কিশোর।

'ভাল।'

'লিলি,' জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কোথায় রয়েছি জানেন?'

'পুরানো একটা গির্জার মাটির তলার ঘরে। লাশ রাখত আগে এখানে।' ফুঁপিয়ে উঠে নাকি গলায় কাঁদতে শুরু করল লিলি। 'আর কোনদিন বেরোতে পারব না গো! কেউ আমাদের বাঁচাতে আসবে না! হায় হায় গো এবার মরব!'

'মারছে রে!' গুঙিয়ে উঠল আবার মুসা। 'শুরু হলো! থামুন না, প্লীজ!'

'লিলি, প্লীজ, মাথা ঠাণ্ডা করুন,' অনুরোধ করল কিশোর। 'বেরোনোর নিশ্চয় পথ আছে। কোনদিক দিয়ে এনেছে আমাদেরকে?'

'সিঁড়ির মাথায় ঢাকনা আছে একটা, ট্র্যাপডোর। ওই পথে। খানিক আগে উঁকি দিয়েছিল বিল, আমি জেগে গেছি দেখে আরেক দফা স্প্রে করে গেছে নাকের ওপর।' জোরে জোরে শ্বাস টানল লিলি। কান্না থেমেছে। 'সকালে কথা কাটাকাটি হয়েছে ওর সঙ্গে। ওকে বলেছি, কঙ্কালটা ফিরিয়ে না দিলে শেরিফকে সব বলে

দেব।'

'সেজন্যেই এনে ভরে রেখেছে?' জানতে চাইল মুসা।

'হ্যাঁ।' কেঁপে উঠল লিলির কণ্ঠ। 'প্রথমবার হুঁশ ফিরলে অন্ধকার দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। জোরে চেঁচাতেও সাহস হয়নি। যদি কোন ফাঁকফোকর থেকে সাপ কিংবা অন্য কিছু বেরিয়ে আসে। চিৎকার শুনে ঢাকনা তুলল বিল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম। ফোকরের কাছাকাছি যেতেই আবার আমার নাকে ওষুধ ছিটাল সে। আবার বেহুঁশ হয়ে গেলাম।'

'ওষুধটা নিশ্চয় ডাক্তার ক্লডিয়াসের আবিষ্কার, তাই না?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ। ওটার নাম রেখেছিলেন এফ-টোয়েনটি থ্রী। এপ্রিলের তেইশ তারিখে আবিষ্কার করেছেন তো, সেজন্যে। নানারকম পরীক্ষা চালানোর ফলে শিম্পাঞ্জীগুলো খুব দ্রুত বেড়ে উঠছিল, তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে মরে যাচ্ছিল। সেটা ঠেকানোর জন্যে ওষুধ আবিষ্কারের চেষ্টা করছিলেন তিনি। বানিয়ে বসলেন বেহুঁশ করার ওষুধ।'

'এ-ব্যাপারে আলোচনা করার জন্যেই হারবারভিউতে যাচ্ছিলেন, তাই না?' বলল কিশোর, 'অ্যানাসথেটিস্টের কাছে। কিন্তু কাজ শেষ করে যেতে পারলেন না। আচ্ছা, ফরমুলাটার কথা আপনিই বিলকে জানিয়েছেন তাই না? পার্কের লোককে ঘুম পাড়িয়ে গুহামানব চুরি করার ফন্দিটা কার?'

আবার কান্না আশা করেছিল কিশোর, কিন্তু কাঁদল না লিলি। বলল, 'ফন্দিটা বিলের। ফরমুলাটার কথা আমি বলেছি। টাকার দরকার ছিল। কয়েকশো ডলার। তাহলে এখান থেকে চলে যেতে পারতাম। কিন্তু বেঈমানী করল সে।'

'এসব কথা তো পরেও জানা যাবে, নাকি?' বলে উঠল মুসা। 'এখন বেরোনোর চেষ্টা করা দরকার।'

কারও কিছু বলার অপেক্ষা না করেই হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়িটা বের করল সে। সাবধানে উঠতে শুরু করল। পিছু নিল রবিন। ওপরে উঠে মাথা ঠেকে গেল ট্র্যাপডোরে। দুই হাতে ঠেলে দেখল মুসা, উঠল না ঢাকনাটা।

'আর কোন পথ নেই?' জানতে চাইল রবিন।

'না,' নিচ থেকে জবাব দিল লিলি। কাঁদতে শুরু করল। 'আমরা···আমরা ফেঁসেছি ভালমত···বিল এসে খুলে না দিলে···হায় হায়, কেন একাজ করতে গেলাম গো···'

'আহ, কি শুরু করলেন?' বলল কিশোর। 'এখান থেকে ঠিকই বেরিয়ে যাব আমরা। থামুন তো।'

'এই মুসা,' বলল রবিন। 'গালে বাতাস লাগছে। এই যে, এই দেয়ালটায় ফাঁকটাক কিছু আছে।' সিঁড়ির পাশের দেয়ালের কথা বলল সে।

দেয়ালে হাত বুলিয়ে দেখল দু-জনে। পুরানো ইঁট, ভেজা ভেজা। নখ দিয়ে খোঁচা দিলেই নরম মাটির মত নখের ভেতর ঢুকে যায়। বেরিয়ে থাকা একটা ইঁটের মাথা ধরে হ্যাঁচকা টান মারল মুসা। তাকে অবাক করে দিয়ে খুলে বেরিয়ে এল

ওটা। ফোকরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে দেখল সে, ওপাশে আরেক সারি ইঁট। দুই সারি ইঁট দিয়ে তৈরি হয়েছে দেয়াল।

কাজে লেগে গেল দু-জনে।। সহজেই খুলে আসছে একের পর এক ইঁট। জোরে ঠেলা দিলে কোন কোনটা খুলে পড়ে যাচ্ছে অন্যপাশে। ছোট একটা ফোকর হয়ে গেল দেখতে দেখতে। আলো আর বাতাস এখন দুইই আসছে ওপথে।

মানুষ বেরোনোর মত একটা ফোকর করে ফেলল ওরা। দু-জনের আঙুলের মাথাই রক্তাক্ত, ব্যথা নিশ্চয় করেছে, কিন্তু টের পেল না উত্তেজনায়।

উঠে এসে কিশোরও হাত লাগাল।

ফোকরের ভেতর দিয়ে মাথা গলিয়ে দিল মুসা। মাত্র দু-তিন ফুট নিচে মাটি। দেয়ালের বাকি অংশটা মাটির তলায়। সেটা বরং ভালই হলো ওদের জন্যে।

খুব সহজেই বেরিয়ে চলে এল ওরা।

সারা গায়ে ধুলো-ময়লা আর শ্যাওলা, ভূত সেজেছে যেন একেকজন। হাতে পায়ে আঁচড়ের দাগ, কোন কোনটা থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। লিলির চোখ লাল, কেঁদে কেঁদে ফুলিয়ে ফেলেছে চোখমুখ।

'চলো, শয়তানটাকে ধরি গিয়ে,' বলল লিলি। 'পালানোর আগেই। নইলে লোকের সর্বনাশ করবে সে। এফ-টোয়েন্টি থ্রীর ফরমুলা এখন তার হাতে।'

'আরও ওষুধ বানিয়ে মানুষকে ঘুম পাড়াবে ভাবছেন?' বলল মুসা।

'তাই তো করবে। ঘুম পাড়াতে পারলে কত কিছুই করা সম্ভব। পকেটের টাকা লুট করা থেকে শুরু করে অনেক কিছু···চলো, জলদি চলো।'

বনের ভেতর দিয়ে দৌড়ে চলল ওরা। বনের শেষে মাঠ পেরিয়ে গোলাবাড়িতে পৌঁছে দেখল, ম্যাকস্বারের গাড়িটা আছে। ইগনিশন কী লাগানোই আছে। পেছনের সীটে এক গাদা প্যাকেট, টিন। এইমাত্র বোধহয় মুদির দোকান থেকে এসেছে ম্যাকস্বার।

এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল লিলি। মোচড় দিল চাবিতে।

'আরে দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমাদেরকেও নিয়ে যান,' বলতে বলতেই একটানে পেছনের দরজা খুলে ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে দিল মুসা। রবিনও উঠল। কিশোর উঠে বসেছে লিলির পাশে।

দরজায় দেখা দিল জেলডা ম্যাকস্বার। চেঁচিয়ে উঠল।

কিন্তু কানই দিল না লিলি। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে ফেলেছে। গীয়ার বদলে টান দিল গাড়ি। একটানে উঠে চলে এল পথের ওপর। ছুটে চলল শহরের দিকে।

'যাচ্ছি কোথায়?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরল লিলির। গতি কমিয়ে মুখ ফেরাল কিশোরের দিকে, 'ভা-ভাবছি সেন্টারডেলে···'

'ওখানে গেছে বিল, কি করে জানলেন?'

'আর কোথায় যাবে···' থেমে গেল লিলি। দ্বিধায় পড়েছে।

'সামনে কোথাও গাড়ি রেখে আগে শেরিফকে ফোন করুন,' পরামর্শ দিল

কিশোর। চোখ বন্ধ করে বার দুই চিমটি কাটল নিচের ঠোঁটে। বিলের গাড়িতে যে খামটা দেখেছিল, সবুজ কালিতে তাতে লেখা ঠিকানাগুলো মনে করার চেষ্টা করল। চোখ মেলল হঠাৎ। 'ওঅ্যাডলি! ওঅ্যাডলি রোডটা কোথায় জানেন?'

'সেন্টারডেলে। ইনডাস্ট্রিয়াল এরিয়ায়।'

'তাহলে সেখানেই!' চেঁচিয়ে উঠে দু-আঙুলে চুটকি বাজাল কিশোর। 'খামে আরেকটা নাম দেখেছি···হ্যাঁ, সাইনস সারভিস। নিশ্চয় কোন কেমিকেল কোম্পানির নাম। এফ-টোয়েন্টি থ্রি বানাতে কেমিকেল দরকার। যেহেতু নাড়া একটা পড়েছে, আমরা জেনে গেছি, অনেক বেশি ওষুধ বানিয়ে এখন হাতে রাখতে চাইবে সে, পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্যে।···সে বানাতে জানে তো?'

'জানে,' জবাব দিল লিলি। 'কলেজে কেমিস্ট্রি ছিল।'

'তাহলে আর কোন সন্দেহ নেই। সেন্টারডেলেই গেছে সে। তাড়াতাড়ি ফোন করে আসুন।

টেলিফোন বুদের সামনে গাড়ি রেখে পকেট হাতড়ালো লিলি। 'ইস্‌সি, একটাও নেই।'

'এই যে, নিন,' পকেট থেকে কয়েন বের করে দিল রবিন।

কয়েন ফেলে ডায়াল করার পরে প্রায় ত্রিশ সেকেণ্ড অপেক্ষা করতে হলো লিলিকে। তারপর রিসিভার তুলল কেউ ওপাশে। 'হ্যালো, আমি লিলি অ্যালজেডো। কিংসলে ম্যাকম্বারের···হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিই। শুনুন, একটা খবর আছে। গুহামানবের কঙ্কাল বিল চুরি করেছে। হ্যাঁ, সেন্টারে কাজ করে যে সে-ই। তাকে ধরতে এখন সেন্টারডেলে যাচ্ছি। ওঅ্যাডলি রোডে, সাইনস সারভিস কোম্পানিতে আছে। আমরা যাই, আপনারা আসুন।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে গাড়িতে এসে উঠল লিলি। 'আমাদেরকে যেতে মানা করছিল। লাইন কেটে দিয়েছি।'

সেন্টারডেলের দিকে গাড়ি ছুটল।

শহর থেকে বেরোতেই গ্যাস প্যাডালে জোরে চেপে বসল লিলির পা। এক লাফে গাড়ির গতি বেড়ে গেল অনেক। তীব্র গতিতে ছুটল। শাঁই শাঁই করে পাশ দিয়ে সরে যাচ্ছে গাছপালা। ফ্লোরবোর্ডে পা চেপে ধরেছে ছেলেরা। কোন মোড়টোড় এলে চাপ আরও বাড়ায়। শরীর সোজা রাখতেই হিমশিম খাচ্ছে। তারপরেও গতি বাড়িয়েই চলেছে লিলি। শান্তশিষ্ট ভীতু মেয়েটা অকস্মাৎ খেপে গিয়েছে।

সবাই নীরব।

পথের পাশের সাইনবোর্ডে জানিয়ে দিল, সেন্টারডেলে প্রবেশ করেছে গাড়ি। ব্রেক চেপে ধরল লিলি। কর্কশ আর্তনাদ তুলল টায়ার। গাড়ির গতি স্বাভাবিক গতিবেগে নামিয়ে আনল সে, নইলে পুলিশের ঝামেলায় পড়তে হবে। এখন কোন বাধা আসুক, এটা চায় না।

দুটো সুপারমার্কেটের পাশ কাটিয়ে এসে ডানে মোড় নিল লিলি। পথের দুই ধারে ছোট ছোট দোকানপাট, তার পরে বাড়িঘর। মাঝে মাঝে গজিয়ে উঠেছে

বিরাট বিরাট বিল্ডিং।

'এটাই ওঅ্যাডলি রোড,' জানাল লিলি। সাইনস সারভিস খুঁজে বের করতে সময় লাগল না। পার্কিং লটে বিলির পুরানো গাড়িটা নেই।

'আসেনি নাকি?' চিন্তিত কণ্ঠে বলল লিলি।

'এক কাজ করুন,' নিচের ঠোঁটে বারবার চিমটি কাটছে কিশোর। 'শেরিফের অফিসে চলুন। হয়তো এসে ধরে নিয়ে গেছে ওকে।'

সামনে এগিয়ে মোড় নিতেই দেখা গেল দুটো গাড়ি। সাইনস সারভিসের সীমানার মধ্যে, একটা গুদামের সামনে। শেরিফের গাড়ির পাশেই বিলের পুরানো গাড়িটা। বিল দাঁড়িয়ে আছে শেরিফের গাড়ির জানালার ধারে, হাতে স্প্রে-বটল। স্টীয়ারিং হুইলে মাথা রেখে পড়ে আছে একজন লোক, বোধহয় বেহুঁশ।

ইঞ্জিনের শব্দে মুখ ফিরিয়ে চেয়েই প্রায় দৌড়ে গিয়ে নিজের গাড়িতে উঠল বিল। স্টার্ট দিল। বিকৃত করে ফেলেছে মুখচোখ। গোঁ গোঁ করে উঠেই বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন। আবার চাবি ঘোরাল সে। স্টার্ট নিতে চাইছে না ইঞ্জিন, থেমে থেমে যাচ্ছে। অবশেষে স্টার্ট নিল। নড়ে উঠল গাড়ি।

গ্যাস পেডালে পা চেপে ধরল লিলি। সোজা এগিয়ে যাচ্ছে বিলের গাড়ি সই করে। প্রচণ্ড জোরে গুঁতো লাগাল পুরানো গাড়িটার পেটে। ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙল, ধাতুর সঙ্গে ধাতুর-সংঘর্ষে শব্দ হলো বিকট।

ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল তিন গোয়েন্দা।

যখন চোখ মেলল, দেখল, ম্যাকম্বারের গাড়ির বাম্পারে আটকে গেছে বিলের গাড়ির পেছনের চাকা। দুটো গাড়ির কোনটাই নড়তে পারছে না।

মুখ খারাপ করে গাল দিয়ে উঠল বিল। দরজা খুলে স্প্রে-বটল হাতে দৌড়ে এল লিলির দিকে।

পেছনের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল মুসা। বিলকে সই করে ছুঁড়ে মারল হাতের জিনিসটা।

বিলের ঠিক কপালে লাগল ওটা। টলে উঠল সে। হাত থেকে খসে পড়ল বোতল। সে নিজেও হুমড়ি খেয়ে পড়ল পথের ওপর।

সাইরেনের শব্দ শোনা গেল।

ঘ্যাঁচ করে এসে থামল শেরিফের দ্বিতীয় আরেকটা গাড়ি, বিলের কয়েক ফুট দূরে। পিস্তল হাতে লাফিয়ে নামল অফিসার। ভুরু কুঁচকে তাকাল পড়ে থাকা দেহটার দিকে, তারপর ছেলেদের দিকে ফিরল।

'টমেটোর টিন, স্যার,' হাসিতে বত্রিশ দাঁত বেরিয়ে পড়েছে মুসার। 'গাড়ির পেছনের সীটে রাখা ছিল। তুলে মেরে দিয়েছি।'

উনিশ

পরদিন, বুধবার, সকাল।

গ্যাসপার রিসার্চ সেন্টারের চত্বরে বসে রৌদ্রোজ্জ্বল সুইমিং পুলের দিকে

তাকিয়ে আছে ডেপুটি শেরিফ। খুব সাঁতার কাটতে ইচ্ছে করছে। ডিউটি না থাকলে এতক্ষণে গিয়ে নেমে পড়ত পানিতে।

'বিলের বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ জোগাড় করেছি,' বলল সে। 'ট্রাংকের গায়ে তার আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। ওটা চুরি করে এনেছে তার বাড়িওয়ালীর স্টোররুম থেকে।'

বসে থাকা সকলের ওপর চোখ বোলাল ডেপুটি। জেলডা আর কিংসলে ম্যাকস্বার পাশাপাশি বসেছে। সকালে ফোন করেছিল তাদেরকে রুডলফ, এখানে আসার জন্যে, অবশ্যই ডেপুটির অনুরোধে। আগের রাতটা মিসেস গ্যারেটের বাড়িতে কাটিয়েছে লিলি, দু-জনেই এসেছে এখন। মুষড়ে পড়েছে লিলি, তার বাহুতে হাত রেখে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছে মহিলা।

আগের দিন সারাটা বিকেল সেন্টারডেলে শেরিফের লোকের সঙ্গে কাটিয়েছে তিন গোয়েন্দা, এখানে ওখানে গেছে। তারপর সাইট্রাস গ্রোভে ফিরে এসেছে লিলির সঙ্গে।

ওয়ার্করুম থেকে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার রুডলফ আর ডাক্তার হ্যারিসন। সুইমিং পুল থেকে গা মুছতে মুছতে এসে তোয়ালে গায়ে জড়িয়েই চেয়ারে বসলেন ডাক্তার রেডম্যান।

'আমার গুহামানবের কি হলো তাই বলুন,' জিজ্ঞেস করল ম্যাকস্বার। 'কখন পাব?'

'ট্রাংকের হাড় তোমার না!' চেঁচিয়ে উঠলেন হ্যারিসন। 'ওগুলো আমার। আফ্রিকান হোমিনিড।'

'দুটো কঙ্কাল ছিল,' দুই আঙুল তুললেন ডাক্তার রুডলফ। 'আরেকটা কোথায়?'

'এই চোরনীটাকে জিজ্ঞেস করছেন না কেন?' বুড়ো আঙুল দিয়ে লিলিকে দেখাল জেলডা। 'চোরের দোসর। কোথায় লুকিয়েছে, বলুক।'

ঝট করে মাথা তুলল লিলি। রাগে চোখ জ্বলছে। 'জানি না!'

'আরি, আবার তেজ দেখায়। এটা এখানে কেন? হাজতে ভরা হয়নি কেন? ধরে আচ্ছামত কয়েক ঘা লাগালেই পেট থেকে সুড়সুড় করে বেরিয়ে আসবে কথা। জানে না, হুঁহ্!'

'জামিনে মুক্তি দেয়া হয়েছে,' বলল ডেপুটি।

'জামিন!' খেঁকিয়ে উঠল ম্যাকস্বার। 'ওর জামিন হতে গেল কে?'

'আমি,' শান্তকণ্ঠে বললেন হ্যারিসন।

'তুমি? তুমি হওয়ার কে?'

'ওর বস্। আসলে জামিন হওয়ার তো কথা ছিল তোমার। গেলে তো না।'

'যাইনি বলে কি মহা অন্যায় করে ফেলেছি নাকি?'

ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল জেলডা। 'আর যাবই বা কেন? চোরের শাস্তি হওয়া উচিত।'

'হ্যাঁ, তা তো হওয়াই উচিত,' মুখ ছুটে গেল লিলির। 'আমার চেয়ে বড় বড়

চোরেরা আছে এখানেই। তাদের জন্যেই আজ আমার এ দশা। নইলে লস অ্যাঞ্জেলেস কিংবা স্যান ডিয়েগোতে কলেজে পড়ার কথা এখন আমার।'

'এঁহ, আবার কলেজে পড়ার শখ। টাকা পাবে কোথায়? চুরি করে?'

'চুরি তো তোমরা করেছ!' মুখের ওপর বলল লিলি। 'আমার বাবার ইনসুরেন্সের টাকাগুলো গেল কোথায়?'

জোঁকের মুখে নুন পড়ল যেন, কুঁচকে গেল জেলডা।

থামল না লিলি, বলল, 'আর আমার বাড়িভাড়া? হলিউডের বাড়িভাড়া কত আসে জানি না আমি, না? কত টাকা লাগে আমার খেতে, থাকতে?'

কেশে গলা পরিষ্কার করল ম্যাকস্বার। 'আহ্হা, অযথা রাগ করছিস তুই, লিলি।' একেবারে বদলে গেছে ম্যাকস্বারের কণ্ঠস্বর, গলায় যেন মধু ঝরছে। 'যেতে চাইলে যাবি, কলেজে ভর্তি হতে চাইলে হবি, সে তো ভাল কথা। আমরাই সব ব্যবস্থা করে দেব। স্যান ডিয়েগো, কিংবা ওশনসাইড, যেখানে খুশি গিয়ে লেখাপড়া কর। বাড়ি ভাড়া করে দেব, খরচ দেব। আর কি চাস?'

'আমার বাবা মারা যাওয়ার পর কত টাকা বাড়িভাড়া এসেছে, তার হিসেব চাই। ইনসুরেন্সের টাকা কত পাওয়া গেছে, কতটা আমার পেছনে খরচ হয়েছে, তার হিসেব চাই। সেটা বাদ দিয়ে যা থাকবে সব চাই আমার।'

'কত আর থাকবে,' হাত ওল্টাল জেলডা। 'কয়েকশো। বড় জোর হাজারখানেক।'

'বেশ। তাহলে উকিলের কাছেই যাব আমি। এসে হিসেব নিকেশ করুক। যদি একহাজার বাকি থাকে, সেটা আর নেব না, দান করে দেব তোমাদেরকে।'

'নাহয় পাঁচ হাজারই হবে,' তাড়াতাড়ি বলল জেলডা।

মুচকি হাসল ডেপুটি। হাত তুলল, 'থামুন, থামুন। লিলি বড় হয়েছে। ও যদি উকিলের কাছে যেতে চায় যাক না। আপনাদের অসুবিধে কি?'

'না না…' আমতা আমতা করল ম্যাকস্বার। 'আমাদের আর অসুবিধে কি? গেলে যাক না…'

'হ্যাঁ, এখন তো বড় হয়েছে,' মুখ কালো হয়ে গেছে জেলডার। 'পেলেপুষে বড় করেছি। এখন পাখা গজিয়েছে। আট বছরের যখন ছিল…'

'আহারে, কি আমার মায়ারে!' মুখ বাঁকালো লিলি। 'এনেছ তো টাকার লোভে। দয়া কিংবা মায়া দেখিয়ে নয়।'

'আচ্ছা, ওসব কথা পরে হবে,' বাধা দিলেন ডাক্তার রুডলফ। 'আসল কথায় আসা যাক। কঙ্কালটা…'

'আমার কঙ্কাল আমাকে দিয়ে দেয়া হোক,' বলে উঠল ম্যাকস্বার, 'ব্যস, আর কিছু চাই না।'

'সরি,' বলল ডেপুটি, 'এই কেসের মীমাংসা হওয়ার আগে দেয়া যাবে না।'

'অন্য কঙ্কালটাও লাগবে? মানে, এই কেসের জন্যে। যদি দরকার হয়, বলুন।' একসঙ্গে সবগুলো মুখ ঘুরে গেল কিশোরের দিকে।

'বনের মধ্যে পুরানো একটা গির্জায় পাওয়া যাবে ওটা,' আবার বলল কিশোর।

'তাই না, ডাক্তার রেডম্যান?'

পাথর হয়ে গেলেন যেন রেডম্যান।

'ডাক্তার হ্যারিসনকে খেলো করতে চেয়েছিলেন। ডাক্তার ক্লডিয়াস মৃত, তাঁর পরে যাঁর গ্যাসপার পুরস্কার পাওয়ার কথা, তাঁর দুর্নাম করে দেয়া গেলে পুরস্কারের তালিকায় সহজেই নাম উঠে যাবে আপনার। দশ লক্ষ ডলার, সোজা কথা তো নয়। মিউজিয়ামে সে-রাতে আপনিই ঢুকেছিলেন। মিস্টার ম্যাকস্বারের রান্নাঘর থেকে চাবি চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তার হ্যারিসনের আফ্রিকান হোমিনিডের কঙ্কালটা আগেই চুরি করেছেন, সেটা মিউজিয়ামে রেখে অন্যটা তুলে নিয়ে চলে গেছেন। আফ্রিকান কঙ্কালটা আমেরিকানটার জায়গায় রেখে এমনভাবে আশপাশের মাটি সমান করে দিয়েছেন, যাতে কিছু বোঝা না যায়।

'মিউজিয়াম থেকে বেরোনোর সময় শব্দ করে ফেলেছিলেন। তাতে জেগে যায় জিপসি ফ্রেনি। তবে সে রকম কিছু ঘটতে পারে ভেবে তৈরিই হয়ে গিয়েছিলেন আপনি। গায়ে পশুর ছাল জড়িয়ে নিয়েছিলেন, সেন্টারে আছে ওরকম ছাল, কয়েক ঘন্টার জন্যে একটা তুলে নিয়ে যেতে অসুবিধে হয়নি আপনার। মাথায় পরেছিলেন উইগ, মিসেস গ্যারেটের। সে কারণেই উইগটা অনেক খুঁজেও পাননি মিসেস গ্যারেট, পরদিন আবার যথাস্থানেই পেলেন। তারমানে কাজ শেষ করে এনে আবার জায়গামত রেখে দিয়েছিলেন আপনি। আর আপনার ওই বিকট সাজসজ্জা দেখে জিপসি ভাবল, বুঝি গুহামানবটাই জ্যান্ত হয়ে উঠে চলে যাচ্ছে।'

'যতসব আবলতাবল কথা!' বললেন বটে রেডম্যান, কিন্তু গলায় জোর নেই।

'আপনাকে প্রথমে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ রেখেছিলাম,' বলে গেল কিশোর। 'স্টেশনের ঘরে ট্রাংকে কঙ্কালটা পাওয়ার পর আর পারলাম না। ডাক্তার হ্যারিসনের দুর্দশা দেখে কেমন খুশি হয়েছিলেন, মনে আছে? হাসি ফেটে পড়ছিল আপনার চোখেমুখে। ঢাকতে পারেননি। দেখে ফেলেছিলাম। তারপর থেকে নতুন করে ভাবতে বসলাম। পশুর ছাল আর উইগ নির্দেশ করল সেন্টারের দিকে। আমি, মুসা আর রবিন যখন সেদিন গির্জায় গিয়েছিলাম, আপনিও ছিলেন ওখানে। আমাদের দেখে ভয় পেয়ে যান, যদি কঙ্কালটা দেখে ফেলি? তাই ওখানে থাকতেই দেননি। নানারকম কথা বলে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন আমাদের।'

'তোমার বকর বকর থামাবে?' জোর করে হাসলেন রেডম্যান।

'বকর বকর নয়, স্যার, প্রমাণ দিতে পারি। বেশি ভেবেচিন্তে কাজ করেন আপনি, আর তা করতে গিয়েই ভুল করে সূত্র রেখে গেছেন। গুহামানবের পায়ে জুতো থাকার কথা নয়, সেটা বোঝানোর জন্যেই আপনিও পরেননি। সে রাতে আমেরিকান কঙ্কালটা নিয়ে গির্জায় যাওয়ার সময় মাঠের ধারে নরম মাটিতে আপনার পায়ের ছাপ রেখে গেছেন। সেটার ছাঁচ তুলে এনেছি আমি। আপনার ডান পায়ের একটা আঙুলে দোষ আছে, বুড়ো আঙুলের পরেরটা...'

সবগুলো চোখ ঘুরে গেল রেডম্যানের খালি পায়ের দিকে। তাড়াতাড়ি পা চেয়ারের নিচে লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করলেন ডাক্তার, এবং আরেকটা ভুল করলেন। সবাই দেখল, যা দেখার। আর প্রতিবাদ করে লাভ হবে না বুঝেই উঠে

দাঁড়ালেন তিনি। 'যাই, কাপড় পরে ফেলি। আমার উকিলকেও খবর দিতে হবে।'

'এনথনি, এমন একটা কাজ তুমি করতে পারলে!' বিষণ্ণ শোনাল ডাক্তার রুডলফের কণ্ঠ।

তাঁর দিকে তাকালেন না রেডম্যান। ধীরপায়ে হাঁটতে শুরু করলেন ঘরের দিকে। পিছু নিল ডেপুটি।

'আমার উকিলকেও খবর দেয়া দরকার,' বাঁকা চোখে ম্যাকস্বারের দিকে চেয়ে বললেন হ্যারিসন 'একটা ইনজাংকশন জারি করাতে হবে। দ্বিতীয়বার আর আমেরিকান হোমিনিড নিয়ে খেলা জমাতে দেব না তোমাকে, ম্যাকস্বার।'

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। গুনগুন করে উঠলেন মনের সুখে।

'পারবে না!' চেঁচিয়ে উঠল ম্যাকস্বার। 'ওগুলো আমার হাড়!'

'কে বলল?' রসিকতা করলেন রুডলফ। 'তোমার হাড় তো তোমার গায়েই রয়েছে। বলতে পারো, তোমার কোন নিকট আত্মীয়ের হাড়। তবে সেটা প্রমাণ করতে হবে আদালতে। তার আগে আর গুহামানবের হাড় নিয়ে গুহায় ঢোকাতে পারছ না।'

বিশ

দিন সাতেক পর।

হলিউডের বিখ্যাত চিত্রপরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে, তাঁর বিশাল ডেস্কের সামনে বসে আছে তিন গোয়েন্দা।

ডেস্কের অন্য পাশে বসে গভীর মনোযোগে একটা ফাইল পড়ছেন পরিচালক। গুহামানবের কেস ফাইল। যত্ন করে টাইপ করে এনেছে রবিন।

'টেরিফিক!' অবশেষে মুখ তুলে বললেন পরিচালক। ফাইল বন্ধ করতে করতে বললেন, 'আরেকটু হলেই ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছিল বিল উইলিয়ামস।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'বেশি হেলাফেলা করে ফেলেছিল, সাবধান থাকলে তাকে ধরা কঠিন হত। ডাক্তার ক্লডিয়াসের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকের পাতাগুলো সে-ই নষ্ট করেছিল। যাতে কেউ না জানতে পারে, হারবারভিউ লেনে একজন অ্যানাসথেটিস্টের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন ক্লডিয়াস। সেটা জানত শুধু লিলি। তার মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থাও করে ফেলেছিল বিল।

'বোকা মেয়ে,' বললেন পরিচালক।

'গাফিলতির জন্যেই ধরা পড়ল বিল,' আবার বলল কিশোর। 'গাড়ির পেছনের সীটে ডুবুরীর যন্ত্রপাতি ফেলে রাখল। এমন কি সবুজ বলপেনটাও ফেলে দেয়নি, যেটা দিয়ে মুক্তিপণের টাকা চেয়ে চিঠি লিখেছিল। ইচ্ছে করেই বানান ভুল করেছিল, যাতে সবাই ভাবে, অল্প শিক্ষিত লোকের কাজ।

'মুক্তিপণের টাকা সে নিয়েছিল সাইট্রাস গ্রোভ আর সেন্টারডেলের মাঝের একটা রেস্ট এরিয়া থেকে, ওখানেই টাকা রেখে আসার নির্দেশ দিয়েছিল ম্যাকস্বারকে। টাকার বটুয়া তার গাড়ির বুটেই পাওয়া গেছে। জুতোজোড়াও,

যেগুলো পরে গুহামানবের কঙ্কাল চুরি করতে গিয়েছিল।'

'তাকে সন্দেহ করলে কিভাবে?'

'সাইট্রাস গ্রোভে যত ঘটনাই ঘটেছে, কোনটা ঘটার সময়ই সামনে ছিল না সে। সেটা চোখে পড়ার মত। পার্কে সারা শহরের লোক যখন বেহুঁশ, তখনও সে সেখানে ছিল না। স্টেশনে ট্রাংকটা যখন পাওয়া গেল, তখনও সে সেখানে এল না। অথচ কাছাকাছি যারা ছিল, সবাই এসেছে, কেউ না এসে পারেনি। স্বাভাবিক কৌতূহল।

'যেদিক থেকেই ভাবা হোক, সন্দেহ পড়ে তার ওপর। সেন্টারে তার অবাধ যাতায়ত। লিলির সঙ্গে ভাব। ম্যাকস্বারের রান্নাঘর থেকে চাবি চুরি করা তার জন্যে সহজ। ডাক্তার ক্রুডিয়াসের আবিষ্কৃত ফরমুলাটা লিলির কাছ থেকে জেনে নিতে পারে সে অনায়াসে।

'কঙ্কাল চুরির সময় সে-যে তার বাসায় ঘুমাচ্ছিল, এই অ্যালিবাইও ততটা জোরাল ছিল না, যতটা মনে হয়েছে। বাড়িওয়ালীকে বলেছে, সে তার ঘরে ঘুমাবে। বাড়িওয়ালী দেখতে যায়নি, সত্যি সে ঘুমাচ্ছিল কিনা। সে আছে কিনা, এই খোঁজ নেয়ারও দরকার মনে করেনি। পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে এসেছিল বিল। বাড়িওয়ালী এসে তার ঘরে উঁকি দিতে পারে, এই আশঙ্কা করেনি, কারণ, যতদিন সে থেকেছে ওবাড়িতে, কোনদিন, কোন কারণে একবারের জন্যেও তার ঘরে উঁকি দিতে আসেনি মহিলা।

'গাড়ি নিয়ে সোজা সাইট্রাস গ্রোভে চলে গেল বিল, পানির ট্যাংকের কাছে। শহরের লোক তখন সবাই পার্কে, উত্তেজিত, কেউ লক্ষ করল না তাকে। অটোমেটিক স্প্রিঙ্কলারের টাইমার সেট করল সে, পানিতে ওষুধ মেশার ব্যবস্থা করে বেরিয়ে এল ট্যাংক হাউস থেকে। ঠিক দশটা বিশ মিনিটে আপনাআপনি চালু হয়ে গেল স্প্রিঙ্কলার সিসটেম।

'সিসটেম চালু হতেই সে সোজা চলে গেল মিউজিয়ামে। পরনে স্কুবা স্যুট, মুখে মুখোশ। স্প্রে-বটল থেকে ওষুধ ছিটিয়ে বেহুঁশ করল জিপসি ফ্রেনিকে। কঙ্কালটা চুরি করে নিয়ে পালাল। হাড়গুলো একটা বস্তায় ভরে নিয়ে এল স্টেশনের ঘরে, ওখানে আগেই রেখে গেছে ট্রাংকটা। হাড়গুলো ট্রাংকে ভরে বেরিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। ডুপ্লিকেট একটা চাবি আগেই বানিয়ে নিয়েছিল। চুরির কাজটা খুব সহজেই সারল সে, কারণ তখন শহরের সব লোক ঘুমাচ্ছে পার্কে। পুলিশের কাছে নিজেই বলেছে এসব বিল,' দম নেয়ার জন্যে থামল কিশোর। তারপর বলল, 'লিলির সাহায্যেই ল্যাবরেটরি থেকে অ্যানাসথেটিক চুরি করেছে সে। লিলিকে বলেছিল, কঙ্কালটা চুরি করে নিয়ে গিয়ে কোন মিউজিয়ামে বিক্রি করে দেবে। তাতে হাজারখানেক ডলার আসতে পারে। অর্ধেক দেবে লিলিকে।

'কিন্তু যখন ম্যাকস্বারের কাছে দশ হাজার ডলার দাবি করে বসল বিল, লিলি আঁতকে উঠল। তাকে বোঝানোর চেষ্টা করল। কাজ হলো না। এমন কি লিলির পাঁচশো ডলার দিতেও রাজি হলো না সে। সব টাকাই নিজে মেরে দিতে চাইল। তাতেই আরও বেশি রেগেছে লিলি।'

'বোকা মেয়ে,' আবার বললেন পরিচালক।

'তবে, পরে উকিল আর শেরিফের সামনে সব বলে দিয়েছে লিলি। সে-ই এখন সরকার পক্ষের প্রধান সাক্ষী। নিজের কুকর্মের জন্যে লজ্জিত। সব দিক বিবেচনা করে বিচারক তাকে জেলে না ঢুকিয়ে একটা ফাইন করে ছেড়ে দেবেন বলে মনে হয়।'

'কিন্তু কঙ্কাল চুরির আইডিয়াটা প্রথমে কার মাথায় এসেছিল?'

'বলা যায়, দু-জনেরই। কথায় কথায় একদিন ফরমুলাটার কথা বিলকে বলল লিলি। ক্লডিয়াসের মৃত্যুর পর ফরমুলাটা গোপন করে ফেলার পরামর্শ দিল লিলিকে বিল। তার মনে হয়েছিল, এই ফরমুলা দিয়ে অনেক কিছু করা সম্ভব। তখনও আর কেউ জানে না ওই ফরমুলার কথা, একমাত্র লিলি আর সে ছাড়া। তাই,অন্য কিছু জানার আগেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক থেকে পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলল, ফরমুলাটা চুরি করল।'

'হুঁ,' মাথা দোলালেন পরিচালক, 'অনেক কিছুই করা সম্ভব ওই অ্যানাসথেটিক দিয়ে। ব্যাংকের সমস্ত লোককে ঘুম পাড়িয়ে ব্যাংক লুট করা যায়, জুয়েলারীর দোকান সাফ করে দেয়া যায়, হাজারটা অপরাধ করা যাবে ওই একটিমাত্র অ্যানাসথেটিকের সাহায্যে। কিন্তু একটা ব্যাপার, পানিতে মিশিয়ে দিল অথচ ল্যাবরেটরি টেস্টে কিছু পাওয়া গেল না কেন?'

'সেটা ওই অ্যানাসথেটিকের আরেকটা বিশেষত্ব। ছড়ানোর কয়েক সেকেণ্ড পরই সমস্ত লক্ষণ মুছে যায়। একেবারে উবে যায়। কোন টেস্টেই আর ধরা পড়ে না।'

'খুব বিপজ্জনক। আচ্ছা, রেডম্যানের কি হলো?'

'সম্মানিত লোক, আর অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকেও জেলে ঢোকাননি বিচারক। তবে ফাইন করা হয়েছে। গ্যাসপার সেন্টার থেকে চাকরি গেছে তাঁর। যা বদনাম হয়েছে, আর কেউ তাকে নেবে কিনা, সে-ব্যাপারেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। জেল খাটার চেয়ে বড় শাস্তি হয়েছে তার।'

'সবচেয়ে বড় মার তার জন্যে,' রবিন বলল, 'বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, এবারকার গ্যাসপার পুরস্কারটা তাকেই দেয়া হবে। কারণ, জনহিতকর অনেক বড় গবেষণা করছিল রেডম্যান। বেশি লোভ করতে গিয়ে সব দিক হারাল লোকটা।'

'হুঁ। ইউনিভারস্যাল ফেইলিং অভ ক্রিমিনালাস,' গম্ভীর হয়ে বললেন পরিচালক। 'সব অপরাধীই ভাবে, সে ধরা পড়বে না।...হাড়গুলোর কি হলো?'

'দুই সেটই রয়েছে শেরিফের অফিসে, কেবিনেটে তালাবন্ধ,' বলল কিশোর। 'বিলের কেস পুরোপুরি শেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকবে ওখানেই। ইতিমধ্যে গভর্নরের সঙ্গে দেখা করেছেন ডাক্তার হ্যারিসন। গভর্নরকে বুঝিয়েছেন, পুরো জায়গাটাকে রিজার্ভ এরিয়া ঘোষণা করার পরামর্শ দিয়েছেন। ওখানে আরও হাড় পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। মূল্যবান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হবে সেগুলো। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছেন গভর্নর।'

'ম্যাকম্যারের কি অবস্থা?'

'প্রায় পাগল। মাথায় চুল ছেঁড়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই। তাকেও কোর্টে হাজির করিয়ে ছাড়তে পারত লিলি, কিন্তু ছোটবেলায় তাকে একটা আশ্রয় তো অন্তত দিয়েছে তারা, এই ভেবে আর উকিলের কাছে যায়নি। ইনসুরেন্সের টাকার কথা আর তোলেনি। তবে হলিউডের বাড়িটার দখল নিয়ে নিয়েছে সে। ভাড়াটেদের নোটিশ দিয়ে দিয়েছে। ওরা বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে বাড়িটাকে গার্লস বোর্ডিং বানাবে লিলি। তার মতই যারা অনাথ, তাদেরকে জায়গা দেবে ওখানে, খুব সহজ শর্ত আর কম ভাড়ায়। নিজেও ওখানেই থেকে কলেজে পড়বে।'

'খুব ভাল আইডিয়া,' মাথা নাড়লেন পরিচালক। 'খুব ভাল। আর একটা প্রশ্ন। ফরমুলাটার কি হলো?'

'বিলের পকেটে ছিল। ধরা পড়ার পর চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছে। তার কথা, সে যখন পেল না, আর কারও হাতে পড়তে দেবে না।'

'আহ্‌হা, গেল একটা মহামূল্যবান আবিষ্কার। তবে এক হিসেবে বোধহয় ভালই হলো। মানুষের উপকারে যেমন আসত, অপকারেও লাগানো যেত ওই ওষুধ। অনেকক্ষণ পর চেয়ারে হেলান দিলেন পরিচালক। মুসার দিকে চেয়ে বললেন, 'তারপর মুসা আমান, তুমি তো একেবারে চুপ। কি ব্যাপার? খিদে পেয়েছে?'

'না স্যার,' নড়েচড়ে বসল মুসা। 'এমনি। ওরাই তো সব বলছে। আমি আর কি বলব...'

'তোমার টিন ছোঁড়াটা কিন্তু সময়মত হয়েছিল,' মৃদু হাসলেন পরিচালক। 'নাহলে বিলকে ধরা হয়তো কঠিন হয়ে যেত। যাই হোক, চমৎকার এই কেসের সমাধান উপলক্ষে ফ্রুটকেক আর আইসক্রীম হয়ে যেতে পারে, কি বলো?'

'না, স্যার, কি দরকার...' মাথা চুলকে বলতে গিয়েও থেমে গেল মুসা। দরজা খুলে ঘরে ঢুকেছে বেয়ারা। দুই হাতে উঁচু হয়ে আছে অনেকগুলো বাক্স। বুঝল, আগেই অর্ডার দিয়ে রেখেছেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। হাসিতে ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে গেল সহকারী গোয়েন্দার। বলল, 'থ্যাংকিউ, স্যার, থ্যাংকিউ।'

হাসিটা সংক্রামিত হলো সবার মাঝে।

****